শালঘেরির সীমানায়

সমরেশ বসু

SHALGHERIR SIMANAI

by

Samaresh Basu

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর : ভোলানাথ পাল : তনুশ্রী প্রিণ্টার্স : ৪/১ই, বিডন রো, কলিকাতা-

এই উপন্যাস, বাংলা তেরোশো সাতষট্টি সালে, শারদীয় বেতার জগতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আধুনিক পাঠকদের আর অগোচর নেই, শারদীয় সংখ্যায়, লেখক ও সম্পাদক, উভয় পক্ষেরই সাধ যতো, সাধ্যে ততো কুলোয় না। একজনের সময়, আর একজনের স্থান, দুয়েরই তখন এমন নাভিঃশ্বাস ওঠে, উপন্যাসের পরিপূর্ণ রূপ কোনোক্রমেই সম্ভব হয়ে ওঠে না।

যে-ভাবে একদা 'শালঘেরির সীমানায়' কল্পনা করেছিলাম, চেষ্টা করেছি, মোটামুটি সম্পূর্ণ রূপ দেবার। কিন্তু তাতে কী যায় আসে। রায় দান পাঠকের হাতে।

এ উপন্যাসের উপপাদ্য বিষয় পাঠক নিজেই আবিষ্কার করবেন। তবু বলা দরকার, প্রাগৈতিহাসিক একটি ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কার কথা নিতান্তই কল্পিত তৎসঙ্গে, শালঘেরি গ্রাম ও তার পাত্র পাত্রীও তাই। এ উপন্যাসে দাবা খেলার বিষয় বুঝতে আমাকে সাহায্য করেছেন কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্য। লেখার সময়ে শ্রোতা ছিলেন নবীন সাহিত্যিক সোমনাথ ভট্টাচার্য এবং অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত।

সমরেশ বসু

ফাল্গুন, ১৩৭০
নৈহাটি
চব্বিশ পরগণা

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই:

ছিন্নবাধা
উত্তরঙ্গ
অয়নান্ত
ধূসর আয়না
শেষ দরবার
স্বর্ণপিঞ্জর

শালঘেরির সীমানায়

ফিরে এলাম।

নানা অনুভূতি নানান সুরে বুকের মধ্যে নাকি বাজে। এতদিন মনে করেছি, সে-সব শুধু কথার কথা। আজ ফিরে আসার পথে, সারাটিক্ষণ আমার বুকের মধ্যে কী এক বিচিত্র রাগিণী যেন বেজেছে। এখনও বাজছে। তারে তারে ঝংকারের মত সেই সুর। শুধু যে আমার বুকে, আমার মনে সে রাগিণী বন্ধ হয়ে আছে, তা নয়। সে যেন বাতাসে নাচছে তাল দিয়ে দিয়ে। ছড়িয়ে গেছে আকাশ ভরে।

আমার দেহের, ইন্দ্রিয়ের রক্তবাহী শিরা-উপশিরাগুলি বুঝি আজ বীণার তার হয়ে গেছে। কে তাকে বাঁধলে কষে। টংকার দিয়েছে। রাগিণীর ঝংকারে প্রসন্নতা ও আনন্দ। তাতে আমি যত ব্যাকুল হয়েছি, উদ্বেল হয়ে উঠেছি, ততই আমার বুকের মধ্যে কেন যেন টনটনিয়ে উঠেছে। যাকে আমি দু'হাত দিয়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছি হৃদ্‌কোটরে, সে আমার চোখের দরিয়ায় আকুল হয়ে উঠেছে। সে আমার শাসন মানেনি।

যদি বল, এ রাগিণীর নাম কী? আমি বলতে পারব না। হাসতে গিয়ে যখন দু'চোখ জলে ভেসে যায়, মনে তখন কী রং ফোটে, আমি তার নাম জানিনে। সে যে বাজছে, আমি শুধু সেইটুকুই জানি। আরো শুনি, এই মিশ্র সুরের মধ্যে কে যেন থেকে থেকে বিরতি টানছিল। আর সেই বিরতিটুকু ভরে উঠছিল গম্ভীর শঙ্খের মত একটি গুরুগুরু ধ্বনিতে। সে ধ্বনি যেন মহাকালের বিষাণ। সে ধ্বনি যেন আমার সুখ দুঃখের মাঝখানের সেতু। মহাকালের সেই স্বর আমাকে আহ্বান করছে সাহস দিয়ে। তবু পুরোপুরি নিঃসংশয়ের ভরসা নেই তার ধ্বনির গভীরে। সাহস সংশয় ভয়, সব মিলিয়ে জীবন-মৃত্যুর মত সে নির্বিকার ও গম্ভীর।

বিরতিতে সেই ধ্বনি শুনতে পাই, কারণ সে নিরন্তর আছে। জীবন-বাসরে য রাগিণী প্রতিদিন বাজে, সুর বদলায়, তাল ফেরতা দেয়, সে আমাদের প্রত্যহের জীবনধারণের রাগ-বিচিত্রা। তার রূপান্তর আছে, বিরতি আছে। মহাকালের অবিরত ধ্বনিকে যে আগোচরে রেখে দেয়।

সারাদিনের কাজে ও অকাজে, ফিরে না তাকালে, ভুলে থাকলেও আকাশ থাকে আমার ওপরে। মহাকালের ধ্বনি বাজে তেমনি। সারাদিনের আকাশ-চারী বিহঙ্গটাকে যেমন দিনের শেষে সন্ধ্যার মুখোমুখি হতে হয়, মহাকালের শঙ্খ তেমনি জীবনের অমোঘ নিয়মে কখনো কখনো কানে আসে।

শিশু যেদিন প্রথম হাঁটতে শিখল, সে কি মহাকালের আহ্বান শুনতে পেয়েছে। যে মেয়েটি প্রথম পিত্রালয় ছেড়ে স্বামীর অপরিচিত সংসারে প্রবেশ করে, মহাকালের ডাক তার বুকে ভয়ের দুরু দুরু শব্দে বাজে। জীবন-

লীলার জন্য মহাকালের নিরন্তর আহ্বান।

সেই আহ্বানের যুগপৎ সাহস ও সংশয়, ভয় ও নির্ভয়ের দোলায় আমি যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সে মুহূর্তের বিরতি মাত্র। যে রাগিণী আমাকে হাসির উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়ে ব্যাকুল করছিল, সে কেন আমার ভুবন জুড়ে বাজছিল, তা আমি জানি।

আমি ফিরে এলাম তাই। তাই সে আমার মনের রাগরঙ্গে বাজছে। আমি চল্লিশ মাস পরে ফিরে এলাম আমার জন্মভূমি গ্রামে। প্রায় সাড়ে তিন বছর বাদে। বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়ে এলাম।

গিয়েছিলাম বিয়াল্লিশ সালে। ফিরে এলাম পঁয়তাল্লিশ সাল শেষ করে। কেন গিয়েছিলাম, আজও তার কোনো কৈফিয়ৎ নেই আমার কাছে। শৈশবের উন্মেষ থেকে যৌবনের এই বিকাশে, এর কোনো কারণ কিংবা যুক্তি দেখিনে।

কিন্তু প্লাবনে কেন ভেসে যায় গ্রাম জনপদ? অনেক শক্তি দিয়ে বাঁধা বাঁধ কেন ধ্বসে যায় বন্যায়? তেমনি সহসা বন্যায় আমার বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। প্লাবনে আমি ভেসে গিয়েছিলাম। আমি যেন রাশি রাশি ফণা তুলে ফুঁসে উঠেছিলাম। সে বিক্ষোভ ও ঘৃণা আমার প্রাণের অন্তঃপুরে ছিল, সে আমাকে বিস্মিত ক'রে, সদরে এসে ফেটে পড়েছিল।

বিস্ময়, কারণ দেশোদ্ধারের সদর আঙিনায় এসে দাঁড়াব, একথা কোনোদিন চিন্তা করিনি। সেইজন্যে জেলে যাওয়াটা আমার কাছে জীবনের একটি মুহূর্তের আকস্মিকতা। তাই কারাবাসের গৌরবের চেয়ে বন্দী-জীবন আমার কাছে নিয়ত নিষ্ঠুর মনে হয়েছে। আমি প্রতি পলে পলে মুক্তি কামনা করেছি। জেলকে আমি কোনোদিন, কোনো মুহূর্তে সাময়িক বাসা মনে করতে পারিনি।

তাই ছেচল্লিশ সালের শুরুতে এই শীতের অপরাহ্নে গ্রামের স্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে, যত আনন্দের উচ্ছ্বাস আমার বুকের মধ্যে, তত আমার চোখের দরিয়াতেও উচ্ছ্বাস। সমগ্র দেশকে কোনোদিন মা বলে ডেকেছি কিনা মনে করতে পারিনে। কিন্তু আমার এই আজন্ম চেনা গ্রামখানিকে আমি মা বলে ডেকেছি। অদর্শনের অভ্যাসে আমি যখন পাথরের দেয়ালে এ রূপময়ীকে খুঁজে পাইনি, তখন আমি জেলের অন্ধ কুঠুরিতে মাথা কুটে মরেছি। এ রূপময়ীর যে ছলনা ছিল, তা আমি ভাবতে পারিনে। তবু মনে হত, আমাকে যেন সে ছলনা করত। ছলনা করে কষ্ট দিত। মেঘচাপা সূর্যের মত।

তারপর সে আমার নিরন্তর পাথর-চাপা স্মৃতির মেঘ কাটিয়ে, উদ্ভাসিত হয়ে উঠত দু'-চোখের দিগন্ত জুড়ে। মেয়েটির অভিমানাহত ছায়া মুখে চকিত দুষ্টু হাসির মত। তখন বুঝেছি, সে শুধু আমার মা নয়। আমার খেলার জুটিও বটে। আমার চিরখেলার সঙ্গিনী। আমাকে শুধু স্নেহ করে আর তার মন ভরে না। তার গভীর অন্তর্স্রোতের নানান কৌতুকে ও বিচি

ঙ্গে চঞ্চল করে। অপাঙ্গে তাকিয়ে আমাকে রহস্য করে। আমার মন ভার করে তোলে বিষন্ন চোখে তাকিয়ে। লজ্জানম্র নত মুখে সে আমার গৌরবকে তোলে জাগিয়ে।

আজ আমি আমার সেই গ্রামে ফিরে এলাম। তোমরা যা বল, তাই বল, এর ধুলোয় আমার জুড়ে বসতে ইচ্ছে করছে। দু' হাত দিয়ে তার বুকের ধুলি নিয়ে মুঠি মুঠি ছড়াতে ইচ্ছে করছে মাথায়, গায়ে। কিন্তু তা আমি পারিনে। লোকের সঙ্গে চলি আমি। লোকে আমাকে পাগল বলবে। তাই ধুলি-মুঠির এ ধুলোট উৎসব আমি লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে করব।

আর নয়, এই পাথর-পাতা প্ল্যাটফরমে ও যেন পুরোপুরি মাটির সঙ্গে যোগাযোগ নয়। তার চেয়ে মাটিতে যাই নেমে।

স্টেশন আমাদের ছোট। চিরদিন ধরেই ছোট। আনাগোনা আছে গাড়ি ও মানুষের। কিন্তু ঘড়ি ঘড়ি গাড়ি নেই। আনাগোনা নেই কর্মব্যস্ত ভীড়ের। সারাদিন দুটি গাড়ি যেতে থামে। দুটি গাড়ি আসতে থামে। বাকীরা শুধু চলে যায়, থামে না।

এ স্টেশন তাই আমাদের সঙ্গে চিরদিন ধরে একাত্ম। মানুষ হিসেবে আমাদের যদি বা বয়স বাড়ে, দিগন্ত ব্যাপ্ত হয়, আমাদের ছেলেবেলাটা ওর কোনোদিন ঘোচেনি। ও যেন আজও সেই পতনোন্মুখ ইজের চেপে ধরা, অবাক চোখো পাড়াগাঁয়ের ছেলেটি। যে গাড়ি থামে, তাকে ও তাকিয়ে দেখে না। যে থামে না, তার দিকে চিরদিন ধরে তাকিয়ে আছে।

এই তো সংসারের নিয়ম। যার হদিস পাই, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করিনে। যার হদিস পাইনে, তার পথ চেয়ে থাকি।

আমাদের এই স্টেশনে যিনি কৃষ্ণ, তিনিই শিব। যিনি স্টেশনমাস্টার, তিনিই টিকেট কলেক্টর। কিন্তু যাঁর মুখ দেখব আশা করেছিলাম, তিনি নেই। পরিবর্তে দাঁড়িয়ে আছেন আর একজন। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। পাশেই বাইরে যাবার দরজা। উদ্দেশ্য, এগিয়ে গেলে টিকেটখানি চেয়ে নেবেন।

কিন্তু যাত্রী কই? যাত্রী নেই আর। যে দু'-চারজন ছিল, তারা চলে গেছে। সবাই তারা হাটুরে-বাটুরে লোক। দু'-একজন আদিবাসী মেয়ে পুরুষ বুঝি ছিল। তাকিয়ে দেখিনি ভাল করে। তাদের টিকেট নেওয়া হয়ে গেছে। উনি এখন দাঁড়িয়ে আছেন আমার জন্য। মাস্টারমশাই তাকিয়ে আছেন আমার দিকেই। মুখ দেখে বোঝা যায়, বয়স কম ভদ্রলোকের। কিন্তু এর মধ্যেই মাথার চুল ঝরতির দিকে। অল্প বয়সে যাদের চুল ঝরে, তারা চিরদিনই চুলের দেবতা কিংবা দেবী কে জানে, তার দুজ্ঞেয় মতি ও মনের দিকে তাকিয়ে থাকে ভ্রূ কুঁচকে। অন্যথায়, চুলওয়ালা মাথার দিকে। তাই বোধ হয়, আমার চেহারা নয়, রাক্ষুসে অবিন্যস্ত অস্নাত রুক্ষ মাথার দিকে তাকিয়েছিলেন নয়া মাস্টারমশাই। চেহারাটা আমার যেমনই হোক, চুল দিয়েই বুঝি

আমার চেহারার বিচার হল। কিংবা আমিই অবিচার করলাম আমাদের নবীন স্টেশনমাস্টারের প্রতি, একথা ভেবে। ভদ্রলোকের গায়ে গলা-বন্ধ সাদা রেলের কোট। মুখে বসন্তের দাগ।

কিন্তু আমি যেতে চাইলেই যাওয়া হয় না। সঙ্গে আমার ট্রাঙ্ক, বিছানা। তুলে স্টেশনের বাইরে যেতে পারি। তার বেশি নয়।

ভদ্রলোক এবার পায়ে পায়ে কাছে এলেন। আমাকে আর আমার লটবহর দেখে বললেন, কুলি খুঁজছেন?

নেই তা জানি। কিন্তু আমাদের সেই শিবের যিনি নন্দীভৃঙ্গি তুল্য ছিলেন কিংবা কৃষ্ণের বলরাম, সেই বচন মাহাতো কোথায়? তাকে আমরা ছোটবাবু বলে ডাকতাম। সে খুশি ছিল তাতে। আসলে বাতি জ্বালানো, হুকুম মত সিগন্যাল দেখানো, ঘণ্টা বাজানো আর ফাইফরমায়েস খাটা ছিল তার কাজ। কিন্তু বচনের একটা ন্যায্য দাবী ছিল। সে একজন এ. এস. এম.-এর চেয়ে কম কিসে? সে তো এখানে মাস্টারমশাইয়ের নীচেই।

বটেই তো। অতএব আমরা তাকে ছোটবাবু বলে ডাকতাম। সে খুব খুশি ছিল। আসলে বচন বোকা ছিল না। আমাদের বিদ্রূপটাকেই সে বুঝি তার স্নেহের মূল্যে কিনেছিল।

বললাম, কুলি তো নেই জানি। বচন কোথায় বলতে পারেন?

ভদ্রলোক একটু অবাক হলেন। বললেন, আপনি আমাদের স্টেশনের বচনের কথা বলছেন?

—আমি বচন মাহাতোর কথা বলছি।

ভদ্রলোক আর একবার আমার আপাদমস্তক দেখে বললেন, আছে। কিন্তু এখন কোথায় আছে, তা বলতে পারিনে। হয় তো কোথাও—।

কথা শেষ করলেন না। বোধ হয় ভাবলেন, কোথা থেকে আসছি আমি, কী পরিচয়, জানা নেই। হঠাৎ কথাটা বলা ঠিক হবে কি না।

আমিই হেসে বললাম, ছোটবাবুর নেশাভাং বুঝি আজকাল আর একটু বেড়েছে?

নতুন মাস্টারমশাই একটু যেন আশ্বস্ত হলেন। বললেন, চেনেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—আপনার বাড়ি কি—?

—এখানেই।

—এখানে মানে তো এই মাইলখানেক বিজানীর মাঠ পার হয়ে তবে গ্রাম নাকি পশ্চিমের ওই গ্রাম গড়াইয়ে আপনার বাড়ি?

বললাম, না, পুবেই। শালঘেরি। যে নামে এই স্টেশন।

নতুন মাস্টারমশাই একটু অবাক হলেন। বললেন, স্টেশন শালঘেরি এটাই বটে। কিন্তু গ্রাম শালঘেরি যেতে হলে তো আপনার আগের স্টেশনে নেমে যাওয়া উচিত ছিল। কিছুটা রাস্তা কম হত।

মিথ্যে নয় কথাটা। আর আমার কৈফিয়ৎটা পাগলের মত শোনাবে। তবু বললাম, তবু এটাই যে আমাদের গাঁয়ের স্টেশন।

ভদ্রলোক আমার চোখের দিকে দেখে কী ভাবলেন জানিনে। বললেন, তা বটে। সেইজন্যেই শুধু এতখানি কষ্ট স্বীকার করলেন? তাহলে আগে খবর দিয়ে রাখেননি কেন বাড়িতে। অন্তত গরুর গাড়ি আসত আপনাকে নিয়ে যেতে। এখন কী করে যাবেন? আজকাল অবশ্য দু' তিনখানা সাইকেল রিকশা হয়েছে এখানে। কিন্তু তারাও নিয়মিত আসে না। রিকশায় চাপবার প্যাসেঞ্জার কোথায়?

খবরটা আমার কাছে নতুন। বললাম, সাইকেল রিকশা হয়েছে এখানে? কই, দেখে যাইনি তো। শালঘেরি গাঁয়েও কি রিকশা যায়?

—যায়। রাস্তা তো নতুন তৈরি হয়েছে। মোটর যাবার রাস্তা। এই গড়াইয়ে মিলিটারিদের একটা ঘাঁটিও হয়েছিল। মাস-দুয়েক হল উঠেছে।

পশ্চিমে গড়াইয়ের দিকে ফিরে তাকালাম। চিরদিনের দেখার মধ্যে কোনো বদল পেলাম না। সেই ইতস্তত ছড়ানো শালগাছ। মাঝে মাঝে তালগাছের জটলা। পশ্চিম সীমানায় ধাপে ধাপে উঠতি জমির বুকে বুকে গাছেরাও উঁচু হয়েছে। আর অনিরুদ্ধদের পাড়ার দেবদারু কৃষ্ণচূড়া আছে তেমনি। আজও তাদের দূরে থেকে দেখলে চিনতে পারি। যদিও এই শীতের মরসুমে গাছেরা সব নিষ্পত্র হয়েছে। কিন্তু সাজের সমারোহের আগে, তাদের এ ধড়াচূড়া ছাড়া ন্যাড়া রূপও আমার চেনা। কেবল স্টেশন থেকে যে রাস্তাটি গ্রামের দিকে গিয়েছে, দক্ষিণ থেকে পশ্চিমের বাঁকে হারিয়ে গিয়েছে গাছগাছালির আড়ালে, সেই রাস্তাটি ছিল লাল। এখানকার মাটির স্বাভাবিক রং রক্তাভ। রাস্তাটা এখন হয়েছে মরা সাপের গায়ের মত কালো।

তাকাতে গিয়ে সহসা চোখ ফেরাতে পারলাম না। মিলিটারি ঘাটি হয়েছিল বলে মন খারাপ লাগছে কিনা, বুঝতে পারছিনে। কিন্তু গড়াইয়ে আর কোনো-দিন যাব না বুঝি। কারণ অনিরুদ্ধ নেই।

যে কারণে চল্লিশ মাস ধরে কারাবাস করেছি, তার প্রথম সূত্রপাত করেছিল অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধই সেদিন ডাক দিয়েছিল ঝাঁপ দিতে। যেমন তেমন বন্ধু তো নয়। সারা মহকুমার লোকে জানত আমাদের তিনজনকে। আমি, ভবেন, অনিরুদ্ধ। আমি আর ভবেন শালঘেরির। অনিরুদ্ধ ছিটকে এসেছিল গড়াইয়ে। শালঘেরিতে উচ্চ বিদ্যালয়। সেইখানে আলাপ।

শালঘেরি গাঁয়ে কত ছেলে ছিল। ভবেনকে কেন ছাড়তে পারিনি, তা কি জানি? শালঘেরির হাইস্কুলে কত বাইরের ছেলে পড়তে আসত। শালঘেরির স্কুল ডিস্ট্রিক্ট হাইস্কুল ছিল না বটে, নামডাক ছিল সারা জেলায়। আশেপাশে আর ভাল হাইস্কুল ছিল না বলে, শালঘেরিতেই আসত সবাই। বোর্ডিং-এ থাকত। তাদের মধ্যে অনিরুদ্ধকেই কেন ভালবেসেছিলাম, তাও কি জানি? জানিনে। মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন?

শুধু এইটুকু মনে আছে, ক্লাশ টেন-এ পড়ার সময়, অনিরুদ্ধ একদিন সবাইকে ক্লাশের বাইরে আসার ডাক দিলে। আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম। অংকের মাস্টারমশাই গিরিজাবাবু একটি ছেলেকে ঘুষি মেরেছিলেন। তাতে তার চোয়াল বেঁকে গিয়েছিল। আমাদের শ্যালঘেরি স্কুলে অনেক মার দেখেছি। কোনো কোনো মার তার মধ্যে ঐতিহাসিক আখ্যা পেয়েছিল। কিন্তু তার জন্যে কেউ কখনো কর্তৃপক্ষের কাছে বিচারপ্রার্থী হবার সাহস করেনি। শুধু আমাদের কৈশোরের নীতি ভীত রক্তে দুঃখের ও বিক্ষোভের দাপাদাপি শুনেছি কান পেতে।

সেই চাপা দাপাদাপিকে আমরা প্রথম প্রকাশ হতে দেখেছিলাম সেইদিন। তাতে আমরা নিজেরাও কম অবাক হইনি। আমাদের আতংক ভয় এক ডাকে ভেঙ্গে গেল কেমন করে? মনে হয়েছিল, মাস্টারমশাইদের সঙ্গে বাবার ঝগড়া হলে, বাবা এসেও যদি ডাকতেন ক্লাশের বাইরে যাবার জন্যে তাহলেও বোধহয় পারতাম না।

কিন্তু রোগা, লম্বা, ঝক্‌ঝকে দুটি চোখওয়ালা ওই গড়াই-এর ছেলেটার ডাক যে আমাদের রক্তে লেগেছিল। ওই ঝাঁপ দিতে ডাক দেবার অধিকারটা যেন ও নিয়ে জন্মেছিল। বিচার হয়েছিল গিরিজাবাবুর। লিখিতভাবে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু গিরিজাবাবুর সেই ঘুষিটাই অনেকদিন নানান ছদ্মবেশে অনিরুদ্ধর চোয়াল লক্ষ্য ক'রে, ঘাপ্‌টি মেরে বেড়িয়েছে। যদিও কখনো সার্থক হতে পারেনি।

তারপর একই সঙ্গে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে, অনিরুদ্ধ আর পড়েনি। জীবনে ওর একটি বড় রকমের ফাঁক ছিল, যেটা বোধহয় কেউ দিতে পারে না। সেটা হল বাবা মায়ের স্নেহ। মা ওর মারা গিয়েছিলেন শৈশবেই। তারপরেও ওর বাবা আরো দু-বার বিয়ে করেছেন।

আমি আর ভবেন যখন কলকাতায় পড়ি, তখন ও রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কলকাতার পড়া সাঙ্গ করে, গাঁয়ে এসে যখন জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা চিন্তিত, সেই সময়ে ভবেন আর আমি সপ্তাহে প্রায় দু'দিন করে এসেছি এই গড়াইয়ে।

আমার আর ভবেনের সাহিত্য ইতিহাস পুরাণ-প্রত্ন আর পুরাতত্ত্বের ঝোঁক ছিল। অনিরুদ্ধর সঙ্গে আলোচনায় আমাদের লোকসান ছিল না। বরং, আজ বুঝতে পারি, অনিরুদ্ধ ছিল বলেই সেদিন তথ্য ছাড়িয়ে তত্ত্বের প্রতি সচেতন হতে পেরেছিলাম। যে-কারণে তখন আমাদের পুরাণ-প্রত্ন-পুরা পেয়ে বসেছিলাম, সেই কারণেই অনিরুদ্ধ অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল নৃতত্ত্বের দিকে। ওর সব কিছুতে একটা শব্দ ছিল, 'কেন?' আর তাই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সব ইচ্ছে এবং ঝোঁকের মূলে গিয়ে পৌঁছুতো।

সেই অনিরুদ্ধ আমাদের ডাক দিয়েছিল বিয়াল্লিশে। আমাদের ডাক দিয়ে সে মারা গিয়েছিল পুলিশের গুলিতে।

নতুন মাস্টারমশাই একটু অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার। মহাদেব-বাবুর কথা ভাবছেন নাকি গড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে? মানে আপনাদের পুরনো স্টেশনমাস্টারের কথা বলছি।

কী কথায় কী কথা। অনিরুদ্ধের কথা মনে করে সব ভুলে গেছি। আমাদের শালঘেরির সেই পুরনো মাস্টারমশায়ের নাম মহাদেবই ছিল বটে। মহাদেব চক্রবর্তী। কিন্তু গড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর কথা ভাবব কেন?

জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি গড়াই-এ আছেন নাকি?

—হ্যাঁ, রিটায়ারের পর তো আর কোথাও যাননি। শালঘেরিতেই চাকরি শেষ হয়েছে। আলাপ হয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে। এখন গড়াইতেই আছেন।

আশ্চর্য। মহাদেববাবুর কোথায় বাড়ি, পরিবার পরিজন আছে কিনা, কোনোদিনই আমাদের কিছু বলেননি। কথার টান শুনে এটুকু বুঝেছিলাম, বীরভূমের মানুষ হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের চেয়ে বয়সে ছিলেন অনেক বড়। স্ত্রী-পুত্রের কথা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ভায়া, আমার বয়সের মানুষদের স্ত্রী-পুত্র সকলেরই থাকে। সেইটে তার আসল পরিচয় নয়। আমার আর কি আছে, বরং সেইটেই খোঁজ কর।

বলতাম, তাহলে সেইটিই বলুন।

বড় বিচিত্র জবাব দিতেন মহাদেববাবু। বলতেন, সারাদিনে অনেকগুলো গাড়িকে নিশান দেখাই। বেশির ভাগই দাঁড়ায় না। চারটে থামে যেতে আসতে। শুধু এই কারণে বেঁচে আছি ভাবলে কেমন লাগে বল দিকি?

আমরা সহসা জবাব দিতে পারতাম না। তখন তিনি হেসে বলতেন, একটা চিন্তা নিয়ে আছি ভায়া। সংসারে জোর করে এই বেঁচে থাকার এত চেষ্টা কেন?

নতুন পাশ করা বিদ্যেয়, তর্কের ঢেউ তখন আমাদের জিভে ফেনিলোচ্ছল। একটু বিক্ষুব্ধ হয়েই বলতাম, জোর করে বেঁচে থাকার মানে?

মহাদেববাবু মহাদেবের মতই হাসতেন তাঁর ঢুলুঢুলু চোখে। বলতেন, খুবই রাগ হচ্ছে তো আমার কথা শুনে? হবেই। কিন্তু ওটা ভায়া আসলে সত্যি কথার জ্বালা। তোমরা নিজেরাও হয়তো জান না। এই ধর, আমি তুমি, আমরা না থাকলে কী আসবে যাবে? কত লোক মরছে প্রতিদিন, কত লোক জন্মাচ্ছে। কী আসছে যাচ্ছে তাতে? এ যেন একটা যন্ত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সে ঘুরছে তো ঘুরছেই। জন্মাচ্ছে মরছে, মরছে জন্মাচ্ছে। একবার মরে গিয়ে দেখ না, সংসারের কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে? কিছুমাত্র না। দেখবে, পৃথিবীর সবাই যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। এমন কি তোমার আত্মীয়স্বজনেরা দু'দিন একটু মুখ কালো করে থেকে, আবার হেসে খেলে বেড়াবে। তারা মরলেও তুমি তাই করবে। আমাদের বেঁচে থাকায় কিছুই যায় আসে না। আমরা কতগুলো মনগড়া কারণ তৈরি করে নিয়েছি, যেন আমার না বাঁচলেই নয়। আসলে, আমরা অনাহূত, অযাচিত।

কেউ আমাদের সাধ করে, ভেবে চিন্তে ডেকে আনেনি।

পাগলের প্রলাপ ভেবে শান্তি পাওয়া যেতে পারত। কিন্তু যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসত আমাদের তিনজনেরই। ভবেন তো রীতিমত শিউরে উঠত মহাদেববাবুর কথা শুনলে। আমার রাগ এবং ভয়, দুই-ই হত। একেবারে খেপে যেত অনিরুদ্ধ।

কেবল বচন মাহাতো মহাদেববাবুর মুখের ওপরেই বলত, অই, এইজন্য বলি বড়বাবু গো, যাদের কেউ নাই, তাদের টুকুস্ নিশা ভাং করতে নাগে। নইলে অই আকথা কুকথাগুলান মাথায় এইসে তানানা লাগাবে।

মহাদেববাবু ধমক দিতেন বচনকে। বচন চুপ করত। কিন্তু জীবনের এই অদ্ভুত তত্ত্ব বিশ্লেষণ ছাড়া, অন্যান্য কথায় গল্পে তাঁর সঙ্গ উপভোগ্য ছিল খুব।

কিন্তু তিনি কেন গড়াইয়ে? জিজ্ঞেস করলাম, কি করেন ওখানে?

—শুনি, আখড়া করেন।

—আখড়া? কিসের আখড়া?

—বোধহয় বৈষ্ণবের আখড়া। যাইনি কোনোদিন। বচনের কাছেই সব শুনি।

এতক্ষণে নতুন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কতদিন এসেছেন?

কেমন যেন ক্লান্ত গলায় বললেন, মহাদেববাবুর পরের পরে। মাঝে আর একজন মাস কয়েকের জন্য এসেছিলেন। তিনি বদলী হয়ে গেছেন শালঘেরিতে আমি বছর দেড়েক আছি।

ভদ্রলোকের কথা শুনে মনে হল, চাকরি নয়, যেন নির্বাসনে আছেন শালঘেরির এই নির্জনে। স্বাভাবিক। হয়তো কোনো শহর থেকে এসেছেন। বিদেশ জায়গা। বয়সও বেশি নয়।

তিনি এবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আপনার নামটা জানতে পারি?

বললাম, বিলক্ষণ। না জানাবার মত কোন আভিজাত্যই নেই। আমার নাম সীমন্তভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

—ও! আপনিই সে? আপনি তো এতদিন জেলে ছিলেন।

—জানলেন কেমন করে?

—আপনার বন্ধু ভবেন ঘোষালের কাছে।

এতদিন জেলে থেকে কেমন হয়েছি কে জানে। আমি যেন অবিশ্বাস্য চোখে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। যেন সহসা ও'কে আমার বেশি আপন মনে হল। বললাম, আপনি ভবেনকে চেনেন?

—চিনি একটু। আসেন মাঝে মাঝে।

—আসে?

আমার এতদিনের পাথর-চাপা প্রাণে যেন নতুন করে বাতাস লাগল। ব্যথা পেয়ে আনন্দ আমার দ্বিগুণ হল। ভোলেনি ভবেন। পারেনি

থাকতে। ছুটে আসতে হয়েছে তাকে স্টেশনে। আর ওর মন তখন ভার হয়ে উঠেছে বন্ধুদের জন্যে।

ভাবতে ভাবতেই কী হল আমার। যেন হঠাৎ মুখটা পুড়ে আমার ছাই হয়ে গেল। ভবেনের হাসির আড়ে, চোখের ছায়ায় কী এক তীক্ষ্ম শ্লেষ ও ষড়যন্ত্রী জয়ের ঝিলিক হানতে দেখলাম। আরও একটি মুখ, যার চোখ নেই, মুখ নেই। বোবা ও অন্ধ। পরমুহূর্তেই ছি ছি করলাম নিজেকে। তবু কে যেন আমার হাসিটুকু মুখোসের মত ছিঁড়ে নিয়ে গেল মুখ থেকে। নিজেকে লুকোবার জন্যে, চকিতে মুখ ঘোরালাম আমি।

নতুন মাস্টারমশাই তখন বলছেন, হ্যাঁ আসেন। হয় তো এ অভাগাকে দয়া করতেই আসেন। একেবারে একলা থাকি। কোথায় যাই, ভেবে পাইনে। ভবেনবাবু এলে একটু কথাবার্তা কয়ে বাঁচি।

ফিরে দাঁড়িয়েছি শালঘেরির মুখোমুখি। এতদিন পরে ফিরে যদি এলাম, তবে মনটাকে এমন ছোট কৌটোয় পোরা পোকার মত নিয়ে এলাম? কেন? আমি তো সব জানি, আমি তো সব জেনেছি ভবেনের কথা। সব দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে আমি এসেছি সেই চিরচেনা কোলের গন্ধে। সেই ধুলোয়, সেই বাতাসে। তবে?

তবে কিছুই নয়। আমার বুকের মধ্যে আজ যে সুর বাজছে, সেই সুরের বিরতিতে এ শুধু মহাকালের বিষাণের ধ্বনি। তাকে যে শুধু বিরতিতেই শোনা যায়। নিরন্তরের কোলাহলে সে থাকে অগোচরে। ভ্রষ্ট চোখের দুর্নিরীক্ষ্য দরজার সামনে সে ধ্বনি বিদ্যুৎ চমকের মত। সহসা শোনা যায়। পরখ করে যায় আর নিজেকে বাজিয়ে নিয়ে ফেরার কথাটা যায় স্মরণে এনে দিয়ে। সে সব আমাকে অগ্নি-শুদ্ধ করে, ফিরিয়ে দিয়ে গেল আমার ফেলে-যাওয়া ফিরে-আসা সেতুর বুকে।

ওই তো দেখা যায়, শালঘেরির সীমা ঠেকে আছে আকাশে। বাতাসে যেন ছোট ছোট ঢেউ। সেই ঢেউয়ে আমি শুনতে পাচ্ছি, আমার প্রাণের ছলছলানি। ফিরে এসেছি আমার গ্রামে। যে আমার মা শুধু নয়, খেলার সঙ্গিনী নয় কেবল। যে রূপময়ীর মৃত্তিকা স্তরে স্তরে, কোষে কোষে এক কালনাশী জীবনপ্রবাহের, আবিষ্কারের ইশারা পেয়েছি। সেটুকু আমার কাজের জীবনের এক ব্যাপক পরীক্ষার অপেক্ষা। মাটির সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠের জীবন বিচিত্রকে একবার খুঁজে দেখব আমি।

না, আমার হাসিকে শুধু মুখের মুখোস হতে দেব না। এতদিন যাকে দেখব বলে এত কাজল মেখেছি মনে মনে, আজ কোনো গ্লানি দিয়ে আমি কালিমা করব না সেই কাজলকে।

নতুন মাস্টারমশাই যেন একটু থতিয়ে গেলেন। তিনিও চুপ করে ছিলেন। তারপর বললেন, আপনি ভাবছেন কেমন করে গাঁয়ে ফিরবেন। আর আমি যা তা বকে চলেছি।

তাড়াতাড়ি বললাম, না না। ফিরে এসেছি তাতেই নিশ্চিন্ত। এখন আপনার সঙ্গে একটু—।

কিন্তু তিনি বিশ্বাস করলেন না বোধহয়। বললেন, বুঝেছি। আপনার আর কিছুতেই স্টেশনে পড়ে থাকা উচিত নয়। এতদিন পরে এসেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, গড়াইয়ে না গেলে রিকশাওয়ালাদের পাওয়া যাবে না। বচনেরও দেখা নেই। আপনি একটা কাজ করতে পারেন।

—বলুন।

—যদি আপত্তি না থাকে, আর বিশ্বাস করেন, তবে এসব মালপত্র আমার কাছে আজকের মত রেখে দিতে পারেন। কেন না, সন্ধ্যেও তো হয়ে এল প্রায়। বচনটা হয় তো আসবেই না। আপনিও আজকেই লোক পাঠাতে পারবেন না সব নিয়ে যেতে। তাই কালকেই সকালে সব নিয়ে যেতে পারবেন।

—তাহলে আমি চলে যাব বলছেন?

—হ্যাঁ, কিন্তু হেঁটে নয়। আমার একটা সাইকেল আছে। চালাতে যদি পারেন।

এক মুহূর্তে এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলাম। বললাম, খুব পারি সাইকেল চালাতে। আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন আপনি।

—তবে আসুন, দুজনে ধরাধরি করে এগুলো ঘরে তুলে ফেলি।

তাই করলাম। দরজায় এসে বসে থাকব, তা কেমন করে হয়। জিনিষপত্র তোলা হয়ে গেলে, ভদ্রলোক স্টেশন ঘর থেকেই সাইকেল বের করে দিলেন। সাইকেলে হাত দিয়ে পা যেন সুড়সুড়িয়ে উঠল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মনে হল কপালটা যেন চড়চড়্ করছে। অনভ্যাসের ফোঁটায়। তাড়াতাড়ি নামতে যাচ্ছিলাম সিঁড়ি দিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সাইকেলটা পাঠাব কেমন করে?

উনি আমার দিকেই তাকিয়েছিলেন। বললেন, বচন গিয়ে নিয়ে আসতে পারে। নয় তো কাল যে আপনার মাল নিতে আসবে—।

—ঠিক, ঠিক। তার সঙ্গেই পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

আমি বলে উঠলাম। সে-ই তো সোজা কথা। নামতে গিয়ে আবার থেমে গেলাম। বললাম, আপনার নামটা কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি।

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। বললেন, সেটা সত্যি ভুল বটে। আমার নাম বিজন ঘোষ।

বললাম, চলি তাহলে বিজনবাবু।

বিজনবাবু বললেন, আসুন। সময় পেলে মাঝে মাঝে এই বিজনে আসবেন।

—নিশ্চয়।

বলে হাসতে গিয়ে কোথায় যেন একটু চকিত বিষণ্ণতার রেশ লেগে গেল। আবার মনে হল, শালঘেরি স্টেশনের এই বিজনে ছেলেটি সত্যিই নির্বাসনে

আছে। আমি আবার বললাম, নিশ্চয়ই আসব। এই তো সবে সুরু।

সাইকেলে উঠলাম। শালঘেরির রাস্তায় কালো আলকাত্‌রার পোঁছড়া দেয়নি। মাটির সড়কটাকে ঝামা পিটিয়ে উঁচু করেছে। এমনিতে বোঝা যায় না, কিন্তু কয়েক মাইলব্যাপী, পূর্বদিকে মাটি ক্রমেই ঢালুর দিকে। যেন অতি সন্তর্পণে নেমেছে পা টিপে টিপে। তারপরে আবার গিয়ে উঠেছে একটু একটু করে। কেবল দক্ষিণের ঢালুটা আর বাধা মানেনি কোথাও।

ঝামা-পেটানো রাস্তা বটে। অঞ্চলের রং ছাড়েনি। বাতাসে বাতাসে লাল মাটির ধুলো এসে ছড়িয়েছে। নিজেকে ছড়িয়ে সে যেন আঞ্চলিক পরিচয়কে রেখেছে ধরে। ততোধিক না হলেও গরুর গাড়ির চাকার দাগ পড়েছে নতুন রাস্তায়। না পড়াটাই অস্বাভাবিক।

সব ধান কাটা হয়ে গিয়েছে মাঠের। থাকার এক রূপ। না থাকার আর এক রূপ। আসন্ন এ সন্ধ্যার ছায়ায়, পূরবী রাগিণী বাজছে যেন এ রিক্ত মাঠের বুক জুড়ে। হরিতের সোনা গিয়েছে, এ রুক্ষ পাংশু পরিত্যক্ত বুকে তবু পাখীরা দল বেঁধে দানা খুঁজছে। আজকের পূরবী শুধু কালকের মিলনরাগের প্রস্তুতি। এ শুধু প্রসবের বিরতিতে রূপের হেরফের। নতুন গর্ভসঞ্চারের কামনা তার শিরায় শিরায়। প্রতীক্ষা শুধু অনাগত বর্ষার।

মাঠ ছাড়বার সময় হয়েছে পাখীদের। অনেকে উড়ে চলেছে আমার মাথার উপর দিয়ে। আরো কতদিন এমনি গিয়েছে ওরা। ওদের আয়ুষ্কালের হিসেব আমার জানা নেই। কিন্তু প্রতিদিনের যাওয়া আসার দলের কেউ কি অবাক হয়ে গেল না ওদের সেই প্রত্যহের পুরনো মানুষটিকে দেখে?

পশ্চিমে লেগেছে লাল, তার কিছু ছায়া পড়েছে পূবে। উত্তরে অস্পষ্ট সেই চিরচেনা বোম্বা বুড়োর কালো ছায়া লেপটে আছে আকাশে। আসলে ওটা পাহাড়। আর সব পাহাড়ের মত ওটা বুড়ো তো বটেই। কিন্তু বোম্বা নাম ওর ভূগোলে লিখতে সাহস করেননি ভূ-বিশারদেরা। শুধু আমাদের শালঘেরির মায়েদের সেই সাহস ছিল। শালঘেরি থেকে ওকে দেখা যায়। যখন খুদে দস্যিদের আর কোন রকমেই সামলানো যায়নি, তখন ওই বোম্বা বুড়োকে ডাকাডাকির মহড়া চলত। কিছু নয়, বোম্বা বুড়ো আসবে, আর পিঠে ফেলে নিয়ে চলে যাবে।

ভাবো একবার কী ভয়াবহ কাণ্ড! কিন্তু তারপর? তারপর কী হবে?

খুদেগুলির এদিক নেই, ওদিক আছে। তারপর কী হবে, সেইটি জানবার ঔৎসুক্য তার। কিন্তু তার পরেরটুকু যখন জানতে চেয়েছে, তখন বুঝতে হবে দস্যিটা ভুলেছে। এবার বোম্বা বুড়োর সম্পর্কে যা খুশি তাই বলা যেতে পারে কুটনো কুটতে কুটতে, খুন্তি চালাতে চালাতে পিদীমের সলতে পাকাতে পাকাতে।

মায়ের মুখখানি মনে পড়ে গেল। সেই বোম্বার ভয়ে উদ্দীপ্ত চোখ, ফোলানো ঠোঁট, আর আজ বুঝতে পারি, মায়ের নাকছাবিখানি যে ঝিলকে

উঠত, সে শুধু চোরা হাসির রেশ।

মা আমাকে বোম্বার রূপকথার নায়ক দেখে গেছে। বোম্বাকে পাথর বলে জানা, ডাগর ছেলেকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করেনি।

এবার দক্ষিণে বাঁক। শালঘেরির ঘেরাওয়ে এলাম। বেশ তাড়াতাড়ি এসেছি। দাঁড় ছেঁড়ার দৌড় যে। সামনে বাগ্দিপাড়া। কারা যেন জটলা করছে বসে—পাড়ার মুখে বসে। ওরা আমাকে চিনতে পারলে না। মতি, শরৎ আরো যেন কে কে। আমি নামলাম না। হাসিটুকুও চেপে গেলাম। কথা হলেই নামতে হবে। চল্লিশ মাসে আমার কী পরিবর্তন হয়েছে কে জানে। ওরা শুধু তাকিয়ে রইল ভিনদেশী মানুষকে দেখার মত।

বাগ্দিপাড়ার পরেই সেই চিরকালের ছোট ছোট বাবলা আর আঁসশেওড়ার জঙ্গুলে জমি। তার পরেই, গোপালের মন্দির। শুধু গোপালের নয়, আরও কয়েকজনের ঠাঁই ছিল। কালের জটা ঝুলছে প্রায় সকলেরই শিরে ও হৃৎপিণ্ডে, বট কিংবা অশ্বত্থের তলগামী শিকড়ে। পোড়া ইঁটের চিত্রকাহিনীর নায়ক-নায়িকারা পা বাড়িয়েছে লয়ের দিকে। তবু তাদের যৌবন মরেনি। সেই একই ভঙ্গিতে তারা লীলায়িত। মাকড়সার ঝুলে ও নোনার ঝাপসায় চোখের দৃষ্টিতে এখনো ধ্যান জ্ঞান দর্প বিলোলতা। অশ্বসওয়ারের তরবারির শাণ নেই, উদ্যোগ আছে। নৃত্যের তাল আছে সুরদাসীর, উচ্ছ্বাস নেই।

প্রাচীন শালঘেরি গ্রাম। প্রাচীন মন্দির আর ষোড়শ শতাব্দীর রাজকীয় গড় প্রাসাদের ভাঙা জীর্ণ ভুতুড়ে ইমারতের ছড়াছড়ি। খানে খানে উঁচুনীচু খেয়ালী রিক্ত রক্ত-রক্ত বালি-বালি জমির বিস্তার। অসম্পূর্ণ ভোগের দীর্ঘশ্বাস বিদ্ধ শুধু কাঁটা ঝোপের রুক্ষ জটায় জটায়।

শাঁখ বাজছে। আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল। এক নয়, দুই নয়, শঙ্খনাদ ঘরে ঘরে। বাড়ির দরজার সামনে এসে আমি দাঁড়িয়েছি। কেউ নেই আশেপাশে। দরজাটা খোলা, উঠোনটা ফাঁকা। তুলসীতলায় বাতি দেওয়া হয়ে গেছে। সে বাতির শিখা যেন আমার দিকে বিষন্ন বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। আমি জানি, এ শুধু সাঁঝের নয়। মহাকালের বিষাণ বাজছে। সে আমাকে সাহস দিয়ে আহ্বান করছে ভিতরে। তবু যে-ডাক সারাক্ষণ আমার ভিতরে অনুচ্চারিত স্তব্ধতায় থমকে ছিল, প্রদীপের দিকে তাকিয়ে সেই ডাক আমার ঠোঁটে অস্ফুটে ফুটে উঠল, বাবা! বাবা!…

আমি সাইকেল নিয়ে উঠোনে ঢুকলাম। ডাকলাম, পিশীমা। পিশীমা গো।

—কে? কে?

দেখলাম, দালান সংলগ্ন বারান্দার থামের আড়াল থেকেই পিশীমার মূর্তি দেখা দিল। তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। দেখলাম, রুদ্রাক্ষের মালাখানি ঝুলে পড়েছে হাতে। জপে বসেছিলেন বোধ হয়। কয়েক মুহূর্ত যেন পিশীমা সন্ধ্যা-জপের ঝোঁকে এক অবিশ্বাস্য অশরীরি রূপের মায়া

দেখলেন। তারপরে নেমে এলেন ধাপ বেয়ে।

আমি এগিয়ে গিয়ে সাইকেল রাখলাম বারান্দায় ঠেস্ দিয়ে। বললাম, পিশীমা, আমি এসেছি। আমি টোপন।

ব'লে তাঁর পায়ে হাত বাড়ালাম। পিশীমা আমাকে দু'হাতে ধ'রে একেবারে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, অর‍্যা অর‍্যা, তুই টুপান এসেছিস র‍্যা। অ মা গ, আমি কী করব গ, তুই টুপান এসেছিস?

দু'হাতে আমার চুলের মুঠি ধরে ফুঁপিয়ে উঠলেন পিশীমা, অ মা গ, আমি কী করব গ। ইবারে আমি চলে যাব গা, ইবারে আমি চলে যাব ই বাড়ি ছেড়ে। আর আমি থাকব না।

বলবেনই, এ কথা তো বলবেনই পিশীমা। আমি দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম পিশীমাকে। ডাকতে গিয়ে টের পেলাম, আকণ্ঠ আমার ভরে গেছে কিসে। তবু আমি ডাকলাম, পিশীমা, পিশীমা।

পিশীমা সে ডাক মানলেন না। তেমনি রুদ্ধ কান্নায় গলা তুলেই বললেন, ই বাড়িতে তোর বাবা নাই। তুই আসলি, আমি আর থাকব না, আমি আর থাকব না।

এই সাহসটুকুই তো চেয়েছিলাম। এ বাড়িতে ঢোকবার সাহস। যিনি বসেছিলেন আমার ফিরে আসার প্রতীক্ষায়, তিনি গত হয়েছেন আজ ছ'মাস। জেলে পাওয়া সেই চিঠিখানির কথা আজও মনে পড়ে। পিশী লেখেননি। পাড়ার কবিরাজমশাই একখানি পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলেন, 'কল্যাণীয় টোপন, তোমার পিতৃদেব স্বর্গলাভ করিয়াছেন।...তোমাকে দেখিতে বড় বাসনা ছিল!'...

কিন্তু আমার কথা আমি কাকে বলব? বাবাকে একটিবার দেখবার জন্যে যে আমার দু'চোখ দুরাশায় মরেছে। সেকথা আমি কাকে বলব।

কাউকে বলব না। কারণ, সে দুরাশা যুক্তিহীন। সে চিরদিন থাকবে আমার বুকের পিঞ্জরে। আমি শুধু বললাম, পিশী, আমি তবে যাই কোথায়?

কিন্তু পিশীমা কি আমার কথা শোনবার পাত্রী? তিনি তখন আমাকে আল্‌গা দিয়ে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়েছেন, অলো অ কুসু। কু-সি।

কাছাকাছি কোথা থেকে মেয়ে গলার জবাব এল, কী বলছ জেটি।

—অরে শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়, দ্যাখসে, কে এসেছে।

বলতে বলতে পিশীমা দালানে গেলেন ছুটে। পিদীম হাতে নিয়ে অদৃশ্য হলেন অন্য এক ঘরে। কিন্তু ও কথাটি তখনো মুখে আছে, থাকব না, আর থাকব না।

আমি যেন অপরাধীর মত অন্ধকার দালানে ঢুকে বাবার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে বাতাস নেই। শীতার্ত অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। দরজায় হাত দিয়ে দেখলাম, ভেজানো। ঠেলতেই খুলে গেল।

কিন্তু ঘরে অন্ধকার নেই। বাবার সেই পুরনো জার্মান হ্যারিকেনটাই টিম-টিমে করে নেভানো। পুরনো খাটে বিছানা পাতা। ঘরের সব জিনিষ এক-রকমই আছে।

বাবার সামনে চিরদিন মাথা নুইয়ে থেকেছি। চোখ তুলে তাকাইনি। ভালবেসেছিলাম কিনা, কোনদিন মনে আসেনি সে চিন্তা। আজ আমি হাত বাড়িয়ে তাঁর বিছানায় বুলিয়ে দিতে লাগলাম। মাথা নুয়ে এল। চোখ ঝাপ্‌সা হল। মনে মনে বললাম, আজ থেকে আমি আপনার বিছানায় শোব।

উঠোন থেকে আবার সেই মেয়েগলা শোনা গেল, কী বলছ জেটি, কী হয়েছে?

ঘর থেকে জবাব দিলেন পিশীমা, অলো অ কুসু, বাতি ফাতি গুলোন সব কুথাকে গেছে দ্যাখ, খুঁজে পাচ্ছি না। বাতি জ্বালা, বাতি জ্বালা বাড়িতে।

পিশীমার শ্বশুরবাড়ি ছিল রামপুরহাটে। বিধবা হয়ে এখানে আছেন বিশ বছর। এযুগে আমাদের কথা অনেক বদলেছে। কিন্তু পিশীমার কথা আর সুর কোনোদিন বদলাল না।

গলা যার শোনা গেল, নাম তার কুসুম থেকেই কুসু বলেই বোধ হ'ল। শুনতে পেলাম তার ভীতবিস্মিত গলা, কেন গো জেটি? কিছু বেরিয়েছে নাকি?

—মর্ মুখপুড়ি। বেরুবেটা আবার কী? এসেছে, এসেছে যে। বাতি জ্বালা, বাতি জ্বালা সব। আজ আমার দেয়ালী লো!

হাসি পেল আমার। চোখের জল তবু শুকলো না। পিশী চলে যাবেন? চলে যাবেন বলে বুঝি এমন বাতি খুঁজে মরছেন? আমার নিজেরই যেতে ইচ্ছে করল বাতি খোঁজবার জন্যে।

কুসুমের চুপি চুপি চাপা গলা শুনতে পেলাম, কী এসেছে? কে এসেছে জেটি?

—ক্যানে, উঠানে দেখতে পালি না?

—না তো।

—কী বলছিস্ লো ছুঁড়ি। টুপান, অ টুপান।

ওই আমার ডাকনাম। কিন্তু টুপান নয়, টোপন। তবে ও-কার আ-কার নিয়ে পিশীর চিরদিনের গোলমাল। তাতে নাম আলাদা শোনাতে পারে। পিশীর উচ্চারণ বদলানো যায় না। সাড়া না দিয়ে পিশী যে কী কাণ্ড করবে, বলা যায় না। বাবার ঘরের বাইরে এসে বললাম, এই যে পিশী, আমি বাবার ঘরে গেছলাম।

অমনি পিশীর কান্না-ভরা গলা আবার শোনা গেল, ক্যানে? আর ক্যানে রে? অ'রে ডাকা, অ'রে থাঁড়া, আর ক্যানে।

বলতে বলতে পিশী বাইরে এলেন। হাতে বাতি। বাতির আলো পড়েছে পিশীর গায়ে। পিশীর মুখ দেখতে পেলাম আবার ভাল করে। বাবার ছায়া তাঁর মুখে। যৌবনের মেয়েলী চটকটুকু গিয়ে এখন লোলরেখা মুখে পিশী যেন তার ভাইয়েরই ছাপ পেয়েছেন।

কেন গিয়েছিলাম, সেকথার জবাব দিতে পারলাম না। কিন্তু আমার মুখে কি ছিল, কে জানে। পিশী তার কথা থামালেন। কাছে এলেন আমার আরও। বাতি তুললেন আমার মুখের দিকে। বললেন, নামা দেখি মুখখান, আমি একবারটি দেখে নিই।

নির্দেশমাত্র মুখ নামিয়ে নিয়ে এলাম। পিশী আবার আমার মাথায় হাত দিলেন। আর এবার কিছুই বললেন না। কেবল আপন মনেই মাথাটি নাড়তে লাগলেন, আর আমার সারা গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন।

কেন জানিনে, আমার প্রাণখানিও যেন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। শালঘেরিতে এসে, এমনি একটু স্পর্শ পাব, সেজন্য যেন আমার সকল ইন্দ্রিয় পিপাসিত হয়েছিল।

তারপরে পিশী বললেন, তোর মুখখানি আমাদের বোঠানের মতন।

অর্থাৎ আমার মায়ের মত। পিশী আবার বললেন, সেই টিকলো নাকখানা, ফাঁদি তরাসে চোখ, আর যত রাজ্যের চুল। বাবারে বাবা! কী চুল তোর মা'র মাথায় ছিল। বিরক্ত ধরে যেত না ও চুল বাঁধতে? আমার তো হাত সরত না।

মায়ের মুখখানি মনে করবার চেষ্টা করলাম। যে-বয়সে দেখলে মানুষের মুখ মনে থাকে, তার অনেক আগেই আমি মা'কে হারিয়েছি। শুধু মায়ের ছবিখানি মনে পড়ে। সেই ছবিখানি, বারো বছরের এক মেয়ে, ভেলভেটের জামা আর বিষ্ণুপুরী রেশমী শাড়ি পরা। নাকে নোলক, মাথায় টিকুলি, গলায় মোটা বিছে হার। আমার জন্মের দু'বছর আগের সেই ছবি। মারা গেছে উনিশ বছর বয়সে। সেই থেকে বাবা আর বিয়ে করেননি।

ইতিমধ্যে পিশীর বুঝি হুঁস্ ফিরে এল। আবার গলা তুলে ডাকলেন, অ কুসু।

এবার পিশীমার ছায়ার আড়াল থেকেই একটি সলজ্জ চাপা গলায় জবাব এল, এই যে জেটি, আমি এখানে।

পিশী ফিরলেন আলো নিয়ে। কুসুমকে দেখতে পেলাম। বড় যেন লজ্জা পেল সে আমাকে দেখে। যদিও লজ্জা পাবার বয়স তার হয়নি এখনো। হয়তো বছর চোদ্দ বয়স হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের মেয়ে, তায় দূর পাড়াগাঁয়ের। ডুরে শাড়িখানি জড়িয়ে, এর মধ্যেই সে গিন্নিবান্নি সেজে বসেছে। শরীরে যে-ছায়াটুকু পড়েছে, সেটা বয়সের চেয়ে, কিশোরীর মনের রং বেশি। এর মধ্যেই সে শালীন হয়ে উঠেছে। চোখের পাতায় নেমেছে লজ্জার ভার। যে-ভার তার শরীরের রেখায় উদ্যত হয়ে আছে

প্লাবনের জন্য। মাজা মাজা রং, তাতে সদ্য বেড়ে ওঠার মুখে দীঘল কচি ডাটাটির গায়ে যেন নতুন কিশলয়ের চিকণ শ্যামলিমা। নাকখানি বুঝি একটু চাপা-ই। বড় বড় চোখ। অপরিচিত পুরুষের সামনে এখনো তার চোখে যেন একটু ভয়ের ইশারা। কিন্তু লজ্জার অবকাশ এসেছে পুরোপুরি। তার চেয়েও বেশি, যা তার গভীরে থমকে যাচ্ছে আবর্তিত বন্যার মত, সে তার রুদ্ধ হাসি। সেটাই টের পাওয়া গেল পরে।

পিশী বললেন, দ্যাখ্, দ্যাখ্, ক্যানে কুসু, কে এসেছে। ই আমাদিগের টুপান লো, টুপান। আজ আমার বাড়ির কুথাও আঁধার থাকতে পারবে না। শীগ্‌গির বাতি জ্বালা, বাতি জ্বালা। বুক আমার ধড়াস্যে দিয়েছে মেয়েটা। বলে কিনা, উঠানে কাউকে দেখতে পেলাম না। সি আবার কি গ', আমি কি স্বপন দেখলাম নাকি?

দেখলাম, কুসুর শরীর কাঁপছে। পরমুহূর্তে তার আঁচল উঠল মুখে, আর চকিতে একবার আমাকে দেখে নিল। তারপরেই ধুপ্ করে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে নমস্কার করে নিল একটি।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ও কি, ও কি হচ্ছে?

পিশী বলে উঠলেন, তা করবে বৈকি বাবা। পেন্নাম করবে না বড়কে? তোদের ইংরাজী জেলের কী নিয়মকানুন, তা তো আমরা জানি না। আমরা দেশের লোক, দেশের মতন করি।

আমি বললাম, ও। পিশী, আমি বুঝি বিদেশের লোক হয়ে ইংরেজের জেলে গেছলাম।

—তা কি জানি বাপু।

কিন্তু কুসুমকে চিনতে আমার একটু ভুল হয়েছে। দেখলাম, সে আমার দিকে বেশ ভাল করেই নিরীক্ষণ করছে। আমি তবু পিশীকেই জিজ্ঞেস করলাম, পিশী, এ মেয়েটিকে তো চিনতে পারলাম না।

পিশী ফিরে যাচ্ছিলেন বাতি নিয়ে। ফিরে বললেন, অ মা! ওকে তুই চিনিস না?

জবাবটা কুসুমই দিল। বলল, আহা! আপনি বুঝি সব ভুলে গেছেন?

তা বটে! কুসুমের ঠোঁট যেরকম ফোলবার লক্ষণ দেখা দিল, তাতে বোঝা গেল, ভুলে যাওয়াটা আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু মনে করতে পারছি না কিছুতেই। এবং 'সব' বলতে কুসুম কোন্ ভুলে যাওয়া কাহিনীর ইঙ্গিত করছে, ধরতে পারলাম না।

বললাম, একটু মনে করিয়ে দাও তো।

কুসুমের দু'চোখে একটি ক্ষমাহীন অভিমান স্ফুরিত হতে দেখা গেল। বলল, আপনাকে পুলিশে ধরবার আগের দিন, সন্ধ্যেবেলা সেই বাড়িতে এলেন। চিঠি লিখে পাঠালেন ঝিনুক-দি'কে। আমি গিয়ে দিয়ে এলাম?

একথা কখনো মিথ্যে হতে পারে না। কিন্তু গোলমালটা হয়ে গেছে মন

নয়ে। সেদিন কুসুমের মন আর আমার মন, এক জায়গায় ছিল না। ঝিনুককে কী লিখেছিলাম, সেকথাও বুঝি মনে নেই। কুসুমের জীবনে যা ঘটনা, আমার জীবনে তখন সেটা একটা দুর্ঘটনার কোলাহলে মুখর। সেই সন্ধ্যাটা বালিকার মনে আছে, আমার নেই। তাতে কুসুমের রাগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এবং মেনে নিতে হল।

বললাম, ও। তুমিই বুঝি সে?

—তবে?

যেন অধিকার রক্ষার্থেই কুসুমের জবাবে একটু জোর পড়ল। বলল, আমার খুব মনে আছে, আপনাকে কেমন যেন পাগলের মত দেখাচ্ছিল।

—পাগল?

—হ্যাঁ, সত্যি পাগলের মত। ওই যে সেই, আপনার বন্ধু কে একটা ছিল গড়াইয়ের লোক, পুলিশের গুলিতে মরে গেছল সদরে, তার জন্যে নাকি অমন হয়ে গেছলেন। আমি জানি।

এবার হাসতে গিয়ে পারলাম না। কুসুমের দিকে তাকিয়ে বললাম, সেকথাটাও তুমি জান নাকি?

—সবাই জানে।

ঠোঁট উল্টে জবাব দিল কুসুম, শালঘেরির কে না জানে? আপনি তো বন্ধুর শোধ তোলবার জন্যে পুলিশকে মারতে গেছলেন।

তাই নাকি? মানুষও দেখছি, সত্যি কিংবদন্তী সৃষ্টি করতে ভালবাসে। শোধ নিতে পারি, এসব ক্ষমতা ছিল না, ভাবিওনি। কিন্তু যার ডাকে সেদিন ঘর ছেড়েছিলাম, তার মৃত্যু সংবাদে চিরদিনের জন্য ঘর ছাড়তে চেয়েছিলাম।

এবার পিশী বললেন, ওকে তুই চিনিস না বুঝি? ও আমাদের হরলালের মেয়ে। হরলাল বাঁড়ুজ্যে, ওই তো দক্ষিণ দিকের বাড়ি।

আমি যেন অনেকখানি সহজ হতে পারলাম। আর পরমুহূর্তেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, তুই মানে, হরকাকার মেয়ে?

কুসুম খিল্‌খিল্‌ করে হেসে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে পালাল। পিশীর হাত থেকে আলো টেনে নিয়ে বলল, দাও জেটি, আলো দাও, আর তোমরা পিশী ভাইপো'তে বসে বসে গল্প কর।

পিশী বললেন, আগে বাতিগুলোন বার কর সব। দ্যাখ্‌, কেরোসিন তেল আছে টিনে।

কুসুম যেন বিরক্ত হয়ে বলল, তোমাকে আর বলতে হবে না। কোথায় কি আছে, সে তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি।

—দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দেখছিস্‌, রাতদিন ছুঁড়ি আমাকে অমন চোপা করবে।

বলতে বলতেই পিশীর মুখে স্নেহের হাসি লক্ষ্য পড়ল। আমার কাছে এসে, কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, হরলালটা তো বদের ধাড়ি। এই নড়ায়ের সময়, গড়ায়ে না এ্যাট্টা ঘাঁটি মাটি কী হয়েছিল? সেখানে

যে ডাক্তার ছিল, হরলাল তার কম্পাউণ্ডার হয়েছিল। মদ ভাং তো বরাবরই চলত। তারপর সেখানে বুঝি কি চুরি করে পালিয়ে গেছিল। তা সে সব গেছে, এখন বাড়িতে এসে বাবু বসেছেন। উদিকে জমিজিরেত সব খাজনার দায়ে লাটে। ঘর ভরতি কাচ্চা-বাচ্চার কাউমাউ দিনরাত্তির। আর উনি উদিকে নেশা করে বেড়াচ্ছেন।

হরলাল বাঁড়ুজ্যে কাকাকে গাঁয়ের সকলের মত আমিও জানতাম, লোক তিনি সুবিধের নন। অবশ্য ওই একদিকেই। মুচীপাড়ায় অস্পৃশ্য-আড্ডার ব্যাপারে আর নেশাভাং-এ হরকাকার চিরদিনেরই দুর্নাম। চুরির অপবাদটা নতুন শুনতে হল। তার চেয়েও দুর্ঘটনা জমিজমা বেহাত হওয়া।

পিশী আবার বললেন, আর মাথার 'পরে এই সোমত্ত মেয়ে. আজ বাদে কাল বে' দিলেই হয়। সি কথাটি ভূতটার মনে নাই। বউটা এ-বাড়ি ও-বাড়ি ধার করে সারা। তাই, বুঝলি টুপান, কুসুকে আমি আমার কাছেই রেখে দিয়েছি একরকম বলা যায়। পারিও তো না একা একা সব দেখতে।

বড় সংকোচ হ'ল পিশীর কথা শুনে। তাঁর কথার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুসুমকে এ বাড়িতে তার অধিকৃত স্থানে যেন আমি থাকতে অনুমতি দিই। কারণ, পিশী যে ভাবছেন, এ বাড়িতে আর তিনি কেউ নন। গৃহকর্তা ফিরে এসেছে, সুতরাং সবই তার অনুমতি নিয়ে করতে হবে।

বললাম, পিশী, তুমি ভাবছ, আমি তোমাকে বারণ করব ?—তুমি যে ওকে রেখেছ, সেটা তো ধর্ম।

অমনি পিশীর চাপা স্বরের মধ্যেই একটু বিক্ষুব্ধ গলা শোনা গেল, ছাই! ওকে রাখায় আবার ধম্মো। আমার হাড় মাস কালি করে ছাড়ছে। একখানা করতে দশখানা। ডেকে ডেকে সাড়া পাই না। আর আমাকে যেন বউ-কাট্‌কি শাশুড়ির মতন ধমকায় গ'। তবে—

গলা আবার আর একটু নামল পিশীর। বললেন, কাজে বড় দড়। যখন করে মন দিয়ে, তখন একেবারে দুগ্‌গোর মতন দশ হাত দিয়ে করে। দেখতে পাবি, থাকলেই দেখতে পাবি।

বুঝলাম, সন্তানহীনা পিশীমার সঙ্গে, এ শূন্য বাড়িটিতে, কুসুমের একটি খেলাঘর পাতা হয়েছে। এ খেলার কোনো দর্শক ছিল না এতদিন। আজ আমি এসেছি। শুধু দর্শক হয়েই যে আমার কাজ ফুরাবে, এমন ভরসা নেই। শ্রোতাও হতে হবে। চাই কি, মাঝে মাঝে বিচারকের আসনও নিতে হবে বোধ হয়। আর সেই মামলায়, পিশী সব সময় থাকবে বাদী, কুসুম আসামী।

কিন্তু কুসুমের কাজের প্রশংসার উল্লেখে, পিশীর আবার সেই অনুমতি চাওয়াটাই ফুটে উঠল। বোধ হয়, আমার আগের কথায় তাঁর তুষ্টি হয়নি।

বললাম, পিশী, তুমি যেমনটি চাইবে, এ বাড়িতে তেমনটিই হবে। আমিও তোমার হুকুমেই চলব।

পিশী ভারী খুশি। বললেন, দেখব, কেমন পিশীর হুকুম মেনে চলিস।

তারপরেই গলা তুলে বললেন, কুসি, ও কুসি।

কোন্ ঘর থেকে যেন জবাব এল, কি বলছ ?

—বাতি জ্বালান তোর হবে আজ, না কী ? করছিস কী ?

—পা ছড়িয়ে বসে গেজেট করছি।

আমি অবাক হলাম। হাসিও পেল। পিশী সাক্ষী মানলেন, দেখলি তো, দ্যাখ্, এই রকম করে আমার সঙ্গে। আয় টুপান, আমার কাছে এসে বসবি আয়।

বাবার ঘরের পাশের ঘরেই পিশীর ঠাঁই। কুসুমও সেখানেই বাতি জ্বালাতে ব্যস্ত। পিশী আসন পেতে দিতে উদ্যত হলেন।

আমি বললাম, ও কি করছ পিশী, আমি মেঝেয় বসব।

বলে বসতে না বসতেই কুসুমের প্রশ্ন, তোমাকে ধরে ধরে খুব মারত জেলে ?

যাক, আপনি থেকে তুমি হওয়া গেছে কুসুমের কাছে। তাতে বুঝতে পারছি, আমি আমার সেই শালঘেরির সীমানার মধ্যেই এসেছি।

বললাম, মারলে বুঝি তুই খুশি হতিস ?

—ও মা ! তাই কি বললাম নাকি ?

কিন্তু প্রশ্নটা যে পিশীর মনেও। বললেন, হ্যাঁরে, সত্যি মারধর করে নাই তো ? শালঘেরির চাটুজ্যে বাড়ির ছেলের গায়ে পুলিশ হাত তুলেছে, এমন হয় ?

বাধা কিছু নেই। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ যে একেবারেই আঘাত করেনি, তা নয়। কিন্তু সেটুকু না বললে যদি পিশী খুশি হন, কেন বলি ?

বললাম, না পিশী, মারধর করেনি।

—পাথর ভাঙতে হত ?

চিমনী মুছতে মুছতে কুসুমের পরের প্রশ্ন।

হেসে বললাম, না।

—তবে কী করতে সারাদিন ? খালি রান্না আর খাওয়া ?

পাথর যদি ভাঙিনি, তবে রান্না খাওয়া ছাড়া আর কি করবার থাকতে পারে। কুসুম কুসুমের মতই জিজ্ঞেস করেছে। আর, প্রশ্নটা দেখলাম, পিশীর চোখেও জ্বলছে। বললাম, খেয়েছি, রান্না করিনি।

—কে রান্না করত ?

—লোক ছিল।

সহসা যেন পিশীর কী মনে পড়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে, একটি বাতি নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, অ মা, সব ভুলে বসে আছি, মাথার ঠিক নাই।

কিন্তু কুসুমের প্রশ্ন শেষ হয়নি। বলল, খালি খেতে আর শুয়ে থাকতে ?

বললাম, একটু পড়াশোনাও করতাম। শুধু খেয়ে শুয়ে কি দিন কাটে ?

—কিন্তু সারাদিন তো একটা কুঠ্‌রির মধ্যে বন্ধ করে রাখত ?

—না। সকালে বিকালে একটু মাঠে বেরুতে দিত।

—মাঠ। মাঠ আবার কি ? ওটা জেল নয় ?

—জেলেরও মাঠ আছে কুসুম।

—ও মা, তাই নাকি ?

হ্যাঁ। ছোট মাঠ, কিন্তু খেলাধুলো করা যায়।

—বেশ তো।

কুসুমের বড় বড় চোখ দুটি যেন এ সংবাদে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে একমুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ নামাল।

বললাম, তুই যাবি কুসুম ?

—কোথায় ?

—জেলে ?

কুসুম ফস্‌ করে দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে বাতি ধরাল। তারপরে বলল, যেতে ইচ্ছে করে।

জবাব শুনে আমিই অবাক হলাম। বললাম, কেন রে ?

—দেখতে।

ও, জেল খাটতে নয় ?

বলে, হাসতে গিয়ে লক্ষ্য পড়ল, কুসুম আর একটি বাতি জ্বালাতে জ্বালাতে, মুখ টিপে টিপে হাসছে। যেন বলতে চাইছে কিছু।

জিজ্ঞেস করলাম, কি কুসুম, কি হয়েছে ?

কুসুম ছোট। তার কিশোরী মুখখানিতে তবু যেন আশ্বিনের আকাশের খেলা। দেখলাম, সহসা তার মুখখানি গাঢ় ছায়ায় গেছে ভরে। সে বলল, আমি তো রোজ মেসোমশায়ের কাছে আসতাম। আর মেসো খালি তোমার কথা বলতো।

মেসোমশায় মানে আমার বাবা। হাসিটুকু আমারও গেল। বললাম, কী বলতেন কুসুম ?

কুসুম ছেলেমানুষ, কিন্তু সংসার তার অন্তরকে বিস্তৃত ও গভীর করেছে। বলল, বলতো, তুমি কত দুষ্টু ছিলে আর সেই দুষ্টুমি তোমার নাকি কোনোদিন ঘুচল না। আমি যদি বলতাম, 'মেসো, টোপনদা তো এখন জেলে, তাতে দুষ্টুমির কী আছে?' মেসো বলত, 'এটাও দুষ্টুমি, তোরা জানিস না। আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করে ও জেলে বসে আছে।' জান টোপনদা, তোমাকে দেখতে না পেয়ে মেসো মরে গেল।

—কুসুম।

রুদ্ধ গলায় ডাক দিয়ে আমি থামিয়ে দিলাম কুসুমকে। কিন্তু কুসুম যেন কত বড়। আমার দিকে একবার তাকিয়ে, নিজের চোখ মুছে বলল, এখন রোজ কেঁদো বসে বসে।

পিশী এলেম। হাতে একটি তামার জলপাত্র। তার থেকে জল নিয়ে আমার মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, নানান জাতের মধ্যে ছিলি বাবা, একটু গঙ্গাজল দিয়ে দিলাম।

আপত্তি করার উপায় নেই। কুসংস্কার বলে, আর যাকে হোক বুড়ি পিশীর কাছে প্রতিবাদও নিরর্থক। পিশী যদি শান্তি পান, সেটুকুই লাভ।

বাতি জ্বালান শেষ। পিশী বললেন, ও কুসু, ঘরে যে কটা আলু ছাড়া আর কিছুটি নাই লো? টুপানকে আজ খেতে দেব কী?

আমি বললাম, কী আবার দেবে পিশী। এসেছি সন্ধ্যে করে, আগে খবরও দিতে পারিনি। শালঘেরিতে এখন কী পাওয়া যায়, না যায়, তা আমিও জানি। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। যা আছে, তুমি তাই কর।

খিদে আমার সত্যি নেই। কেন, তা জানিনে। জীবনের নতুন লগ্নে এসে যেন পৌঁছেছি। আজ প্রত্যহের চাহিদাটা সীমানার বাইরে।

কিন্তু কুসুমের চোখ-মুখের ভাব খুব সুবিধের বোধ হল না। দেখলাম, মুখখানি গম্ভীর ক'রে, ভ্রূ কুঁচকে সে আঁচল খুঁটল। আঙুল কামড়াল, আর কিছু বললে বোধ হয় এখুনি উঠোনে নিয়ে গিয়ে, বোম্বা-বুড়োকে দেখিয়ে ভয় দেখাবে।

তারপরেই সে একটি বাতি হাতে নিয়ে, বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি এখুনি আসছি।

—অ' লো, কোথা যাচ্ছিস লো? অ' কুসু। না, আর পারি না এ ছুঁড়িকে নিয়ে।

আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, ও কোথায় গেল পিশী?

—কী জানি। ও মুখপুড়িই জানে। কী একটা মাথায় এসেছে, অমনি ছুটল। তুই বস, বস। তা হাঁ রে টুপান, তোর সঙ্গে কি কোন জিনিষ-পত্তর নাই র‍্যা? সাইকেলে এলি কোত্থেকে?

এতক্ষণে পিশীর সে কথা মনে পড়েছে। বললাম সব কথা। এমন সময়, বাড়িতে যেন ডাকাত পড়ল একেবারে। এক রাশ ছেলেমেয়ে দালানে এসে ঢুকল দুড়দাড় করে।

পিশী হেঁকে উঠলেন, কে রে, কে তোরা?

দরজায় দেখি এক ঝাঁক ছোট ছোট মুখ আর কৌতুহলিত চোখ।

পিশী বলে উঠলেন, এ্যাই দ্যাখ্, এ্যাই! কুসি বাইরে গেছে, আর গোটা শালঘেরিময় এতক্ষণে বুঝি রাষ্ট্র হয়ে গেল, তুই এসেছিস্। এসব কুসির ভাই-বোন।

বলতে বলতেই একটি বয়স্ক মহিলার গলা শোনা গেল, টোপান নাকি এসেছে সেজদি?

পিশী বললেন, কে, হরর বউ? আয়। হ্যাঁ. টুপান এসেছে। আয়, দেখবি আয়।

পিশীর মাথার ঠিক নেই। যেন হরলাল কাকার স্ত্রী আমাকে কোনো-দিন দেখেননি। তিনি এলেন ঘরের মধ্যে। শুধু যে এতদিনের অদর্শনেই কাকীমা এমন ঘোমটা টানছেন লজ্জায়, তা আমার মনে হল না। তাঁর চেহারা, পরিধেয়ের দারিদ্র্য, সর্বোপরি জীবন-ধারণের গ্লানির লজ্জাকেই যেন তিনি তাঁর ময়লা জীর্ণ শাড়িখানি দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করলেন। তাছাড়া বয়সও তাঁর এমন কিছু বেশি নয়। কুসুমই প্রথম সন্তান।

আমি উঠে পায়ের ধুলো নিলাম। তিনি আমাকে স্পর্শ না করে, ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে, চুম্বনের শব্দ করলেন। বললেন, বেঁচে থাক বাবা। এ বাড়িখানি তোমার জন্যে যেন খাঁ খাঁ করছিল।

পিশী বললেন, বস হরর বউ।

—না সেজদি, উনুনে ভাত রয়েছে আমার। কুসি গিয়ে বলল, তাই ছুটে এসেছি। এই দেখুন না, আমি এসেছি তো সব সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। মালতীটা রয়েছে একলা, কী কুরুক্ষেত্তর না জানি হবে।

পিশী বললেন, তা বটে। তবে যা। কিন্তু কুসি গেল কোথা?

—কী জানি। কিছু তো বললে না। বাতি নিয়ে ছুটল কুথা।

—দ্যাখ্ দেখি, আমি আর পারি না ছুঁড়িকে নিয়ে। রাত-বিরেতে এত বড় মেয়ে, দুম্‌দাম করে কুথাকে দৌড়ল।

কুসুমের মা বললেন, গেছে হয় তো কিছু আনতে টানতে, আসবে এখুনি।

পিশী ঝাম্‌টা দিলেন, তোর আর কি? তুইতো বলে খালাস।

তা তো বটেই। কুসুমের মা হতে পারেন হরকাকার স্ত্রী। কিন্তু কুসুম যাঁর, তাঁরই সাজে এ কথা বলা। কথা শুনে মনেও হয় না, কাকীমার কোন দাবী-দাওয়া থাকতে পারে মেয়ের ওপর।

কাকীমা হাসলেন। আমাকে বললেন, যাই বাবা।

—হ্যাঁ, আসুন।

বলেও আমি যেন নিয়ম রক্ষার জন্যেই বলে ফেললাম, হরকাকা ভাল আছেন তো?

কাকীমা যেতে গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার লক্ষ্য করলাম, কুসুমের মায়ের মুখখানি কুসুমের মতই। বয়স বুঝি বত্রিশ তেত্রিশের বেশি নয়। কিন্তু এর মধ্যেই বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে। ভঙ্গিতে ক্লান্তি, তবু কোথায় যেন একটি রুদ্ধ কান্না থমকে আছে। সিঁদুরের মেঘ দেখা গাভীর মত কী এক সর্বনাশের ভয় যেন তাঁর দুটি চোখ জুড়ে।

একটু করুণ হেসে বললেন, সেটা বাবা দেখলেই বুঝবে। কেমন যে আছেন উনি, সে আমরা জানি না, উনিও জানেন কিনা জানি না।

বলে এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ ক'রে চলে গেলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছেলে-মেয়েরাও। আমি বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। পিশী বললেন, সহ্যও আছে বউটার। তাই বলি, লোকে মন্দিন

দাঁতে চিবিয়ে খায়, তদ্দিন দাঁতের কথা মনে থাকে না।

পিশীমা হরকাকার কথাই বলছিলেন। আমি বললাম, কিন্তু অযত্নে সেই দাঁত মাঝে মধ্যে ব্যথা করেও ওঠে পিশী।

পিশী বললেন, আ, বাবা, সে বোধ কি হরর কাছে।

পরমুহূর্তেই পিশীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। আপন মনেই বলে উঠলেন, কী করে এত কষ্ট সহ্য করে বউটা কে জানে। এমনিই হয়তো হয়।

পিশীমার কথায় মনটা চমকে উঠল। মনে পড়ল, তিনি আঠারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। একটা অচেনা বিস্ময় ও ব্যাকুল জিজ্ঞাসা বোধহয় চিরদিন তাঁর বন্ধ দুয়ারে চাপা পড়ে আছে।

আবার বসতে না বসতেই কুসুমের ঝটিতি আবির্ভাব। বলল, পেয়েছি জেটি।

—কী পেলি?

—ডিম।

—আ মুখপুড়ি লো, আ মুখপুড়ি, সব নিয়মকানুনের মাথা খেয়েছিস্ তুই। ডিম নিয়ে তুই আমার ঘরে ঢুকেছিস?

কুসুম খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। বলল, ও গো, না না, এখানে নিয়ে আসি নাই, সে আমি আঁশের হেঁসেলে রেখে এসেছি। জেটিটা ভারী বকবক করে।

কিন্তু ডিমের নাম নেওয়া হয়ে গেছে। পিশী যেন শান্তি পাচ্ছেন না আর। হাত নেড়ে বললেন, যা যা, তুই যা দেখি আঁশঘরে। আমি চাল দিয়ে আসছি। কাঠ জ্বালাগা তুই।

কুসুম গেল রান্নাঘরে। পিশী গেলেন চাল আনতে। বুঝলাম, রান্নার দায়িত্বটা কুসুমের ওপরেই। আমি ঘরের বাইরে পা বাড়ালাম সাইকেলটা দালানে তুলে আনতে।

অমনি পিশীর গলা শোনা গেল, যাচ্ছিস কুথা টুপান?

পিশীর নজর এড়ায় না। বললাম, সাইকেলটা তুলে রাখছি পিশী।

অনুমতি হল, রাখ্, কিন্তু আজ আর কোথাও বেরোস্ না বাবা।

বললাম, না পিশী, আজ কোথাও বেরুব না।

সাইকেলটা তুলতে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। অন্ধকার উঠোন। আমার নড়তে ইচ্ছে করল না।

রাত বুঝি কৃষ্ণপক্ষের। হাল্‌কা কুয়াশায় ঢাকা নক্ষত্রেরা কী এক গুপ্ত আসরে বসে যেন নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছে। আর হাসছে মিটিমিটি করে। ছায়াপথ রেখাটি মাঝ আকাশের কাছ থেকে, কোন্ এক দূরে পথের অজানায় গেছে হারিয়ে।

আমাদের পাকা বাড়ি, কিন্তু মাটির পাঁচিল। পাঁচিলের বাইরে গাছের সুপুরি ঝাড়। খানকয়েক বাড়ির খড়ের চালের মাথা দেখা যায়। আমি

যেন চারদিক শুঁকে শুঁকে দেখতে লাগলাম।

শেয়াল ডেকে উঠল। ও-ডাক কেউ কোনোদিন কান পেতে শোনেনি। আমি শুনিনি কোনোখানে। আজ আমার শুনতে ইচ্ছে করছে। শুনে আমার প্রাণ জুড়োচ্ছে। আমি যে অনেকদিন ওই ডাক শুনিনি। যে আমার প্রত্যহের মাঝে সত্ত্বায় মিশেছিল, সে আজ জানান দিয়ে যাচ্ছে এতদিনের অনুপস্থিতিতে।

সাইকেলটায় হাত দিতে যাব। কুসুমের কীর্তির আর একটি পরিচয় পাওয়া গেল। বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল, টোপন! টোপন এসেছ নাকি হে?

কে? পণ্ডিতমশাইয়ের গলা মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বললাম, হ্যাঁ, এসেছি। আসুন। পিশী, বাতিটা দাও।

বলে নিজেই ছুটে গেলাম। পিশীর থান কাপড়খানি দেখলাম, ঘোমটায় একেবারে কলাবউয়ের অবস্থা করেছে। তাড়াতাড়ি আমাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, দালানে বসিস, আমি যাই।

পিশীর মধ্যে যে এমন একটি লজ্জাবতী বউ এখনো লুকিয়ে আছে, সেকথা এর আগে বুঝতে পারিনি। কিংবা পুরনো দিনগুলির কথা বুঝি ভুলেই গেছি।

আলো নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম। দেখলাম, পণ্ডিতমশাই-ই বটেন। আদিনাথ কাব্যতীর্থ, শালঘেরিরই বাসিন্দা। আমাদের স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত ছিলেন তিনি। আমি প্রণাম করলাম। বললাম, আসুন পণ্ডিতমশাই।

—আসব কী! চোখে দেখতে পাইনে। গেছলাম একটু লাইব্রেরীতে, বই আনতে। হাল আমলে কী সব বই বেরুচ্ছে, একটু পড়তে ইচ্ছে হয়। ফেরবার সময়, হরর মেয়ের সঙ্গে দেখা। দেখলাম, ছুটছে। ওই বললে, তুমি এসেছ। তাই না এসে পারলাম না।

সে আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। এবং এও বুঝেছি, দিনের বেলা হলে উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম, সমস্ত পাড়ায় খবর চলে যেত, আমি এসেছি।

বললাম, ঘরে আসুন, বাইরে বড় ঠাণ্ডা। কিন্তু আপনি কেন রাত্রে কষ্ট ক'রে এলেন পণ্ডিতমশাই, আমিই তো কাল সকালে যেতাম।

আমরা আসতে না আসতেই পিশী মাদুর পেতে রেখেছিলেন। পণ্ডিতমশাই বসে বললেন, আর বসব না। যেতিস্‌ তো বটেই, তবু কানে যখন শুনলাম। ভাল আছিস তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পণ্ডিতমশাই একবার তাকালেন আমার দিকে। পণ্ডিতমশাইয়ের চোখের সেই ভয় দেখানো রক্তাভাটা আজও তেমনি আছে। ওই চোখ দেখলে আমরা চিরদিনই কেঁচো হয়ে থেকেছি। গ্রীষ্মকালে হাতে রাখতেন

একটি তালপাতার পাখা। সেইটি আরও মারাত্মক ছিল। পাখার ব্যজনীতে ও'র প্রাণ জুড়োত, কিন্তু অনেকের প্রাণ খাবি খেত।

পণ্ডিতমশাই বললেন, তোর আর দোষ কি? ছিলি বন্দী। কিন্তু ছ' মাস আগে যদি ছাড়ত, তোর বাবা বেচারী শান্তি পেতেন।

শুধু বাবার কথাই ঘুরে ফিরে আসছে। আসবেই। বিশেষ করে, পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে বাবার খুবই প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

পণ্ডিতমশাই বললেন, অনেকদিন বাদে ফিরলি। এতদিন তো কাউকে আটকে রাখেনি। এ তল্লাটের সবাইকেই তো ছেড়ে দিয়েছে আগে।

আমি বললাম, যাদের দেয়নি, তাদের দলে পড়ে গেছলাম পণ্ডিতমশাই। বোধ হয়, যুদ্ধ থেমেছে বলেই ছাড়া পেলাম।

—তা ঠিক।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, যেখানে ফিরে এসেছিস, সেখানেও শান্তি নেই। শালঘেরি আর সে শালঘেরি নেই, বুঝলি টোপন। এখন অনন্তর মাইনর স্কুলে পড়াই। হাইস্কুলে রিটায়ার করেছি। তা সব যেন কেমনধারা হ'য়ে গেছে। দোষ কারুর দেয়া যায় না। অবিশ্যি। কেমন যেন একটা ফারাক হ'য়ে যাচ্ছে। আমরা বুঝতে পারি না আজকালকার ছেলেপিলেদের। ছেলেপিলেরা চিনতে পারে না আমাদের। মানে, এ শুধু স্কুলের কথা বলছি না। ঘরের ছেলেদের কথাও বলছি। আর মানুষেরাও তেমন নেই আর। কোথায় কী ঘটল, ঠিক টের পেলাম না। মনে হচ্ছে, কী যেন নেই।

আমি অবাক হয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এ তো শুধু সংবাদ দিচ্ছেন না পণ্ডিতমশাই। যেন কী একটি অভাব, কিসের একটি বেদনায় ও হতাশায় ঝিমিয়ে পড়েছেন। আমার ভাববার মত কিছু আছে বলে মনে হ'ল না।

তিনি নিজেই আবার বললেন, কালই দেখছি সবচেয়ে বড় দেবতা। তিনিই রাজত্ব করছেন। করবেনই। আমরাও তো বুড়ো হলাম।

সে-ই সত্যি কথা। এক কাল যায়, আর এক কাল আসে। যাদের জীবনে, বয়সে ও মনে যাওয়াটাই বড় হ'য়ে ওঠে, তাদের দীর্ঘশ্বাসে শুধু ফেলে আসার বাতাস। নতুন তার অচেনা। চেনবার ইচ্ছে এবং সাধও চলে যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম বাড়ির খবর। লোকজনের সংবাদ। বললেন সব। তারপরে হঠাৎ বললেন, যাক্, লেখাপড়া শিখেছিস্, কিন্তু জীবনের সামনে দাঁড়াবার অবকাশ পাসনি। এবার সময় এসেছে বাবা, ঠিক ক'রে ফেল, কি করবি।

ব'লে তিনি উঠলেন। পন্ডিতমশাইয়ের কথায় যেন সেই মহাকালের বিষাণের ধ্বনি। জীবনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমি। এইবার আমাকে চলার কথা ভাবতে হবে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, কিছু করব।

বাইরে আসতে আসতে বললেন, অবিশ্যি তোর বাবা হয়তো তোর কোনো অভাব রেখে যাননি। কিন্তু, বসে তো থাকতে পারবি নে।

—তা তো নিশ্চয়ই নয়।

বাতি নিয়ে দরজা অবধি গেলাম। বললেন, আসিস বাড়িতে।

—যাব। গুরু-মা'কে প্রণাম জানাবেন।

—জানাব।

চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিশীর গলা, আগুন একটু চড়িয়ে দে কুসি।

যেন গলা খুলে বাঁচলেন।

দালানের ভিতর দিয়েই আমিষ রান্নাঘরে যাওয়া যায়। দেখলাম, পিশী দালানে বসে, কুসুমকে পরিচালনা করছেন। এবং জবাবে কুসুমের ওই এক কথা, হচ্ছে, তুমি থাম দিকি।

তার পরেই পিশীর এক প্রস্থ খুসুনি। আবার নির্দেশ।

আমাকে দেখেই পিশী ব'লে উঠলেন, আর বসিস না টুপান, যা, হাতমুখ ধুয়ে আয়। কুয়ার পাড়ে জল তোলা আছে। তা'পরেতে একটু খেয়ে নে।

এখন এ নির্দেশ মানা-ই ভাল। খাবার মন নেই বটে। কিন্তু মন খাবার খায় না। খাবারে যার তুষ্টি এবং পুষ্টি, সে কাল রাত থাকতেই শুকোচ্ছে। কাল রাত্রে আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যেহেতু, রাত্রে বাড়ি ফেরার উপায় ছিল না, সেই হেতু সকালে বেরুতে হয়েছে। মুক্তির আনন্দেই বোধহয় কাল আর জেলের ভাত মুখে তুলতে পারিনি। সকালে হাওড়ায় কিছু খাবার নিয়ে নষ্টই করেছি। যে-গাড়ি ফেল করবার কোনো কারণ ছিল না, সে গাড়ি হারাবার ভয়ে, প্রাণ ধরে খেতেও পারিনি।

হাত মুখ ধুয়ে এসে পিশীর কাছ থেকে একখানি কাপড় চাইলাম। পিশী বাবার ঘর থেকে, বোধহয় বাবারই একখানি পাড়হীন ধুতি বার ক'রে দিলেন। প'রে নিয়ে এসে বসলাম পিশীর কাছে, আমিষ ঘরের দরজার মুখোমুখি।

কিন্তু পিশীর এটুকু খাবার যে কতটুকু, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অন্তত ডজন কয়েক নারকেল আর তিলের নাড়ু। নতুন গুড়ের মুড়কি এক পাথর, আর এক পাথর দুধ।

বললাম, পিশী, ইংরেজের জেলখানাটা তো তোমার বাড়ি ছিল না। ওখানে যা খাইয়েছে, তাতে পেটের আর কিছু নেই। এত সব আমি খেতে পারব না।

—এত সব খাবার কোথা? সেই সকালে তো বেরিয়েছিস্।

—তা বেরিয়েছি। কিন্তু এই যদি এখন খাই, তোমার ওই ভাত আর ডিম আমার খাওয়া হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে আক্রমণ এল, ইস্। এই রাত ক'রে ডিম নিয়ে এসে আমি রাঁধছি, উনি খাবেন না।

পিশীর চোখে একটু সংশয়ের ছায়া। কি জানি, আমি যদি আবার কুসুমের ও-ধরনের কথায় রেগে যাই। কিন্তু রাগব কার ওপরে। এসে তো একবার দেখেছিলাম, কুসুম যেন লজ্জাবতীটি। তারপরে তো নিজমূর্তি ধারণ করেছে। ওই মূর্তি, এক তো ছেলে মানুষ, তার ওপরে পিশীকে উদ্ধার শুধু নয়, যেভাবে ছুটোছুটি করে রান্নার যোগাড়ে বসেছে, তার ওপরে রাগ করব, তেমন যোগ্যতা আমার নেই। এসব থেকে একটি জিনিষ বোঝা যাচ্ছে, কুসুমের জিভে একটু ধার। বয়সের চেয়ে বেশি দেখেছে বলে, কথাও একটু পাকা পাকা। কিন্তু কুসুম এখনো কলি। বরং আমাকেই এখন থেকে তৈরি থাকতে হবে, কুসুমের ওই ধরনের বাণী শুনতে।

কিন্তু উভয় পক্ষের এই আক্রমণে মন আমার যত খুশিতে ভরে উঠছে, উভয়ের মন রক্ষার্থে ততই শংকিত হ'য়ে উঠছি। একজন বয়সের অনেক উঁচুতে। আর একজন অনেক নীচুতে। দুটিকে এক করলে বোধহয় একই দাঁড়ায়।

শেষ পর্যন্ত মান রাখলেন পিশী। বললেন, আচ্ছা, যা পারিস খা। কিন্তু ভাত খেতেই হবে। সেই হচ্ছে আসল।

গাছকোমর বাঁধা ছোট কুসুম শিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নোড়া নিয়ে। এমন সময় সদর দরজায় যেন কে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ব'লে মনে হ'ল।

কুসুমের হাত থমকাল। সে তাকাল পিশীর দিকে ত্রস্ত চোখে। পিশীও দেখলাম, ওর দিকেই তাকিয়েছেন। দু'জনেরই যেন চোখে কিসের প্রশ্ন আর উৎকর্ণ অপেক্ষা।

পর মুহূর্তেই ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল উঠোনে। আর অস্পষ্ট একটা কাশির আওয়াজ।

কুসুম ত্রস্ত উৎকণ্ঠায় ডাকল, জেঠি!

পিশীর মুখ দেখলাম কঠিন। বললেন, হুঁ। আজ ওর যম বসে না এখানে? টুপান, বাতি নিয়ে দ্যাখ্ দেখি, কে?

আমি একটু অবাক হলেও তাড়াতাড়ি বাতি নিয়ে বাইরে গেলাম। দেখলাম দালানের সিঁড়ির কাছে কে একজন দাঁড়িয়ে। পিছন থেকে আর একজন যেন আমাকে দেখে, চকিত ছায়ার মত অদৃশ্য হল বাইরের দরজা দিয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম, কে?

প্রায় জড়ান গলায় জবাব শোনা গেল, তুমি কে বাবা এখানে? কিসের সন্ধানে?

বাতিটা তুলে অবাক হ'য়ে দেখলাম হরলাল কাকা। কুসুমের বাবা। তাই পিশী আর কুসুমের অমন দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল। দেখলাম, হরলাল কাকার দুই চোখ লাল। মুখে মদের গন্ধ। উনিও ঠিকমত দাঁড়াতে পারছেন না। বেতস লতার মত দুলছেন। বাতিটা উঁচুতে তোলায়, চোখ খুলতে পারছেন

না যেন।

বললাম, আমি টোপন হরকাকা।

—টোপন!

হরকাকার যেন সংবিত ফিরে এল। মাথা ঝাঁকিয়ে, রক্তচোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। গলার স্বর বোধহয় পরিষ্কার করতে চাইলেন। ততটা পারলেন না। কিন্তু মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। বললেন, টোপন! তুমি এসে পড়েছ নাকি?

বললাম, হ্যাঁ। আপনার কি শরীর খারাপ নাকি?

মদ খেয়েছেন, একথা জিজ্ঞেস করতে আমার বাধল। কিন্তু হরকাকা যেন ছটফট করতে লাগলেন। এমন একটা অভাবিত অবিশ্বাস্য পরিবেশে যে এসে পড়বেন, ভাবেননি। আর কেন এসে'ছন, তাও জানিনে এখনো। কেবল এটুকু বুঝেছি, এ আসাটা পিশী কিংবা কুসুমের একেবারেই অপছন্দ।

হরকাকা যেন খুবই সুস্থ, এমনভাবে হেসে বলতে চেষ্টা করলেন, ও, তুমি এসে পড়েছ খালাস হ'য়ে? বেশ, বেশ। এই কুসিটাকে একটু দেখতে এসে-ছিলাম। সারাদিন তো দেখা পাইনে—

কুসুমের ছুঁড়ে দেওয়া ছুঁচের মত কথা শুনলাম, ম'রে যাই আর কি!

হরকাকা তেমনি বলে চলেছেন, সেই জন্যে। আর দিনকাল খুব খারাপ হয়েছে কিনা আজকাল। মানে, এই একটু রুগী দেখতে গেছলাম পুবের পাড়ায়। সেখান থেকেই ফিরছি।

এবার আমারই হকচকাবার পালা। বললাম, রুগী, মানে আপনি কি ডাক্তারি করছেন নাকি আজকাল?

হরকাকা ঘাড় দুলিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ওইটেই ধরেছি কি না আজকাল। শালঘেরিতে তো ভাল ডাক্তার টাক্তার নেই একটাও। আছে যা সব চশমখোর। কলকাতার বিদ্যের দাম চায় সব। কী? না মেডিকেল কলেজের পাশুড়ে।

পাশুড়ে? মানে কী? যে পাশ করেছে? তা হবে। হরলাল কাকার ভাবা হয়তো কিছু বাড়তি কথার দাবী রাখে। কিন্তু তিনি কোথায় পাশ করেছেন, সে কথা জিজ্ঞেস করলে, সারা রাত্রিব্যাপী তিনি সে কাহিনী শোনাতে পারেন হয়তো। সুতরাং সে কথা তুলতে আমি সাহসী হলাম না। বরং বলে ফেললাম হরকাকা?

কুসুমেরই গরম তেলে ছ্যাঁকছেকে কথা শোনা গেল, না, না, আর বসতে হবে না।

হরকাকা যেন সে কথা শুনতেই পেলেন না। বললেন, না, আর বসব না টোপন, যাব। খেয়েদেয়ে শুই গে, আবার হয়তো রাত ক'রে কোনো রুগী বাড়ি থেকে ডাক আসবে। মানে আমি তো আবার, তোমার ওই নগেন ডাক্তারের মত ক্রুয়েল হ'তে পারিনে, যে, রুগী এসে রাত্রে ডাকলে বলব, 'ওরে যা রে শালা, বাড়ি যা, দু'চার টাকায় নগেন ডাক্তার যায় না।'

হরকাকা নগেন বসুর মতই বোধহয় হাত-পা ছুঁড়তে গিয়ে, নিজেকে সামলে নিলেন। আমাকে বাধ্য হ'য়ে এর পরে বলতে হ'ল, তা তো বটেই।

হরকাকা হাসবার চেষ্টা করলেন আবার। বললেন, নয় কী? না হয়, মেডিকেল কলেজেই পড়িনি। গড়ায়ে সাহেব ডাক্তারের সাগরেদি তো করেছি, না কী? সে একটা অত বড় সার্জন তো, তার হাতেই তো আমার হাতেখড়ি, কী বল? সে সাহেব, অ্যাঁ? আর নগা শুদ্দুর। আমাকে বলে কি না, মুকুখু?

পিশীর গলা এবার পাওয়া গেল, টোপন, ওকে বাড়ি যেতে বল্।

যেন আমার অপরাধ কেটে গেল, এমনিভাবে বললাম, আপনাকে পিশী বাড়ি যেতে বলছেন এবার!

হ্যাঁ, যাই।

বলেও হরকাকা দাঁড়িয়ে ঠোঁট চাটলেন বারকয়েক। আবার বললেন, যাক্, তুমি তা'হলে এসে গেলে? পাড়ায় একটা মানুষ ফিরল এ্যাদ্দিনে। আমার কথায় কিছু রাগ-টাগ করলে না তো টোপন?

বললাম, না না, রাগ করব কেন?

অথচ এই হরকাকা আগে যখন মাতাল হতেন, আমাদের সামনে কখনো আসতেন না। এলেও কথা বলতেন না। আমরাও বলতাম না। বরং উনি আমাদের একটু ভয়ই করতেন।

হরকাকা বললেন, আচ্ছা, আবার আসব। তবে, রোগ-বিরোগ হলে ডেকো আমাকে, কোনোরকম লজ্জাটজ্জা ক'র না।

হাসতে গিয়েও পারলাম না, কেমন যেন করুণ মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা। এই হরকাকা যেদিন ম্যাট্রিক পাশ করেন, তখন আমরা খুব ছোট। শুধু হরকাকাদের বাড়িতে নয়, গোটা শালঘেরিতে সেদিন উৎসব হ'তে দেখেছিলাম। অবশ্য, আরো কয়েকজন পাশ করেছিলেন।

আবার পিশীর গলা শোনা গেল, দাঁড়াও।

হরকাকা দাঁড়ালেন। হরকাকার সঙ্গে আমার পিশীর দিদিভাই সম্পর্কই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রামপুরহাটে আমার মৃত পিশেমশায়ের সঙ্গে কোনোরকম একটা ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল হরকাকার। মেয়েদের যে বলে, 'পিতার ঘরের চেয়ে শ্বশুরবাড়িই আপন, এ ক্ষেত্রে সেটাই কাজ করেছে। যে মহিলাকে হরকাকা দিদি বলে ডাকতেন, তাকেই এখন বৌঠান বলে ডাকতে হয়। সে হিসেবেই, কুসুমেরা পিশীমাকে ডাকে জেটি বলে।

হরকাকা দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে বলছ বৌঠান।

—হ্যাঁ।

দেখলাম, পিশীমা অল্প একটুখানি ঘোমটা টেনে দিয়ে, বাটিতে ক'রে কী নিয়ে এসেছেন। কিছু বুঝতে পারলাম না! পিশী এগিয়ে গিয়ে বললে, 'নাও, বরাদ্দ নিয়ে যাও। আজ বুঝি লজ্জা পাচ্ছ? হা ভগবান!'

আশ্চর্য ! হরকাকা দেখলাম, বাটিটি নিয়ে, কী খেতে আরম্ভ করেছেন।

পিশী আমাকে বললেন, নে, তুই বাতিটা রেখে, খেয়ে নি গা যা।

এই পিশীই না আমাকে হরকাকার যম বলছিল? যখন হরকাকা প্রথম ঢুকলেন, সেই যমের সামনেই পিশীর এমন কীর্তি? যাকে দূরে দূরে করা, তাকেই বাটি ভরে খাবার?

ওদিকে কুসুমের গলা শুনতে পেলাম। এবার অবশ্য গলার স্বর খুবই চাপা। বলছে, জেঠি, তুমিই বাবাকে নাই দিয়ে দিয়ে, এই সন্ধ্যের মৌতাতটি করেছ।

পিশী বললেন, তুই থাম্।

—কেন থামব?

কিন্তু থামতেই হল। কেন না, পিশী জল গড়িয়ে নিয়ে এলেন হরকাকার জন্যে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করে ফেললাম, আপনার সঙ্গে আর একজনকে এসেছিল হরকাকা?

—তার্কা।

তার্কা? বোঝা গেল সেটা তারক। কিন্তু কোন্ তারক।

জিজ্ঞেস করলাম, তার্কা কে?

হরকাকার মুখে তখন নাড়ুর ভিড়। বললেন, আ রে, ভুবণখুড়োর ছোটছেলে। আমাকে খুব ভালবাসে। কলকেতায় একটা বড় চাকরি করত, তা যুদ্ধ থেমে গিয়ে এখন বেকার হ'য়ে গাঁয়ে বসে আছে। এসেছিল, মানে, ছেলেমানুষ তো, বছর বাইশ চব্বিশ বয়স হবে, আমাদের কুসুমকে বে' করতে চায়।

এবার দেখলাম উঠোনে বোমা ফাটল। না, শুধু বোমা নয়, হাউই বোমা। ফাটে, আবার জ্বলেও। কুসুম এবার একেবারে উঠোনে। একে আগুনের আঁচেই মুখখানি লাল হয়েছে। তার ওপরে রাগে একেবারে খ্যাপাচণ্ডী। চিৎকার ক'রে বলল, খ্যাংরা! খ্যাংরা, বুঝেছ? ওই বে'র মুখে খ্যাংরা, আর তোমার ওই নেশুড়ে তার্কার মুখেও খ্যাংরা।

হরকাকা আমাকেই সাক্ষী মানলেন, দেখেছ টোপন, আজকালকার মেয়েদের দেখ, কেমন বাপের মুখের ওপর কথা বলছে।

পিশী তাড়াতাড়ি বললেন, এ্যাই, এ্যাই দেখ মুখপুড়িকে, রান্না ফেলে চলে আসছে। যা যা, শীগ্গির যা। রোজই তো বলে।

কুসুম তেমনি গলাতেই বলল, তা' ব'লে আজও বলবে, টোপনদা'র সামনে?

তাও তো বটে। আমি আজ এখনো প্রায় নতুন আগন্তুক একজন। আমার সামনে এসব কথা ফাঁস করা চলে? তাও তারকের মত নেশুড়ে বর? নিশ্চয়ই আপত্তিকর।

এর মধ্যে দুঃখ আছে, বেদনা আছে। যন্ত্রণা অপমানও কম নেই জীবনের তবু এ যে শালঘেরি। আমি যে শালঘেরিতে এসেছি, তা যেন মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। সেই আমার মন জুড়ে, আমার দু'চোখের দিগন্ত জুড়ে।

কিন্তু হরকাকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ নির্বিবাদেই খাচ্ছেন। কুসুম চলে গেল রান্নাঘরে। পিশী বললেন, এই নাও জল।

বাটিটা মাটিতে রেখে বললেন হরকাকা, জল খাব না বৌঠান, চলি। তবে আপনাকে আমি বলে রাখছি, ও মেয়ে নিয়ে অনেক ভোগান্তি আছে।

পিশী বললেন, আচ্ছা, সে বোঝা যাবেখনি।

হরকাকা দরজা অবধি গিয়ে আবার দাঁড়ালেন। বললেন, চলি হে টোপন।

—আসুন।

কিন্তু গেলেন না। আবার বললেন, বুঝলেন বৌঠান, মেয়েটার মাথা আপনিই খাচ্ছেন। আপনিই ওকে বুঝিয়েছেন, তারকার সঙ্গে ওর বে' হ'লে, তারকা আমার মদের খরচ যোগাবে।

পিশী এবার অন্য মূর্তি ধরলেন। বললেন, এবার যাবে, না টোপন গিয়ে দরজা বন্ধ করবে ?

কিন্তু সেকথা শোনবার জন্য হরকাকা আর দাঁড়িয়ে নেই। কথা শেষ করেই, অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন। আমি আমার ফেলে যাওয়া মুড়কি খেলাম আবার।

পিশী বললেন, রোজ, পিরতিদিন এ সময়ে এসে জ্বালাতন করবে। ওই যে জানে, মেয়েটা রয়েছে আমার কাছে। যেন আমি জোর করে ধরে রাখছি। ও তাই কিছু উশুল নিতে আসে। বদ্ বামুনা কোথাকার!

পিশীর গালাগালি বেশ মুখরোচক। বদ বামুনা। এমন গালাগাল তো আর কখনো শুনিনি।

কুসুম অমনি ফোঁস ক'রে উঠল, তোমারও দোষ আছে জেঠি। চলে যাচ্ছিল। তোমার আবার সোহাগ ক'রে ডেকে খাওয়ান কেন ?

পিশী যেন কেমন অসহায় হ'য়ে পড়লেন। আমাকেও সাক্ষী মানলেন না এবার। অন্যদিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললেন, তা' কি করব। এসে রোজ রোজ খেতে চায় বৌঠান ব'লে। না দিয়ে কি পারা যায়। তবে, এবারে টুপান আসছে, আর ওর মুরোদ হবে না আসবার।

তা হয় তো আসবেন না হরকাকা। কিন্তু আমি তো জানি, তাতে আমি কতখানি পাপের ভাগী হব। পিশীর মনে কতখানি অশান্তি হবে, তা তো খানিকটা অনুমান করতে পারছি। যে মাতালকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে তাঁর ইজ্জতে লাগে, ভয় পান, সেই পিশীকেই তো আমি দেখলাম বাটি ভ'রে খাবার দিয়ে আসতে। এটুকু না দিতে পারলে যে তাঁর রাতের চোখ বুজবে না, সেকথা আমি জানি। আর এও বুঝি সত্যি, মাতালটাকে খেতে দিয়ে পিশী

তাঁর ভগবানের কাছে ক্ষমা চান। বলেন, হেই গো বাবা, ওই নষ্টটাকে, ওই ভ্রষ্টটাকে তুমি সুমতি দাও।

সেই তো জীবনের বিস্ময় আমার চিরদিন ধরেই থাকবে। সকল মানুষের থাকবে। কারণ, মানুষের মনের আকাশের চিত্রবিচিত্র তো অমনি ক'রেই দেখা যায়।

পিশী তো শুধু একজন সন্তানহীনা থরথরে বিধবা নন, যিনি সহোদরের গলগ্রহ হ'য়ে জীবন কাটাচ্ছেন। তিনিও এক সংসার গড়েছেন বুকে। গড়তে পেরেছেন, সেই আমাদের পরম পাওয়া। সেই সংসারের এক বাসিন্দা হরকাকা। আমিও সেই সংসারেই থাকতে চাই।

আমি বেশ গম্ভীর হ'য়ে বললাম, তা হরকাকার দোষ আছে ঠিকই, আর সেটা ক্ষমাও করা যায় না। কিন্তু ও'র খিদের সঙ্গে কী সম্পর্ক ও-সবের?

পিশী যেন অকূলে একটা কুল পেলেন। ফিরে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, এ্যাই, এ্যাই দ্যাখ্ দেখি? বল্, লোকটা খিদে পেয়ে খেতে চাইলে, আমি কী করি বল্ দেখি?

আমি বললাম, তুমি ঠিকই কর পিশী।

পিশী বিজয়িনীর মত কুসুমের দিকে ফিরে বললেন, শোন্ কুসি, একবার শোন্। এ তোর গোঁয়ারের মতন কথা তো লয়। এ নেকাপড়া জানা ছেলের কথা।

কুসি তখন পাকা গিন্নিটির মত ডিমের ঝাল রান্না করছে। জবাব দিল, ওসব তোমরা পিশী ভাইপোতে বলগে যাও। আমি শুনতে চাই না। ব্যাটাছেলে, খেটে খাবার মুরোদ নেই, চেয়েচিন্তে খায় কেন?

কুসুমের কথায় বোঝবার উপায় নেই, সেই ব্যাটাছেলে ওর বাবা। আর যুক্তি তো তার কথাতে আছে। তার ওপরেও যেটা আছে, সেটা রাগ দিয়ে ঢাকা বটে। আসলে পিতার অপমানের গ্লানি ও বেদনা।

আমি যেন কুসুমকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বললাম, পিশীকে তোর বাবা বৌঠান ব'লে মনে করেন, তাই চেয়ে খান।

কুসুম ঠোঁট উল্টে বলল, শালঘেরির বাড়ি বাড়ি বাবার অমন অনেক বৌঠান আছে। কোথায় চেয়েচিন্তে বেড়ায় না, শুনি?

বুঝলাম, এসব বিষয়ে কুসুমের চেয়ে আমি কথা ও অভিজ্ঞতায় কম পারদর্শী।

পিশী বললেন আমাকে, অথচ দ্যাখ টুপান, এ লোক যদিন্ মন দিয়ে ডাক্তারি করত, তা হলে সত্যি দু'পয়সা আসত ঘরে। আসছিলও তো। ওষুধ দিত, সুঁই দিত লোককে। নগেন বোস্ও তো বলেছে, হরলাল পাশ না করুক, তার এলেম আছে। ইচ্ছে করলে, একটু আধটু পারে। তা কি সে করবে? তা' হ'লে শালঘেরিতে যে মাতালদের আসরই আর থাকবে না।

একটু পরেই কুসুম ঘোষণা করল, রান্না হ'য়ে গেছে।

ওটা আমি আগেই ভেবে রেখেছিলাম, রান্না হ'লেই খেতে বসব। কারণ, আমার খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত কুসুম বেচারীর মুক্তি নেই।

বললাম, খেতে দে কুসুম, আর দেরী করব না।

পিশী উঠে প'ড়ে বললেন, এখানেই ঠাঁই কর তবে। তোকে আর উঠতে হবে না টুপান, সামনেটা একটু মুছে দিলেই হবে'খন। দুধ তো খেলি না। ভাতের পরে খাস্। কুসি।

—বল।

—বড় বগী থালাখানা বার ক'রে রেখেছি। ধোয়া আছে ওটা। একটু জল দিয়ে ধুয়ে, ওতেই ভাত দে ওকে।

আগুনের আঁচে কুসুমের জ্বলজ্বলে মুখখানি দেখে বড় মায়া লাগল! নিজে খেয়ে উঠব, ও বেচারী কোথায় কী খাবে, কিছুই জানি নে এখনো।

জিজ্ঞেস করলাম, তুই খাবি নে কুসুম?

কুসুম বলল, আমি বাড়িতে খেতে যাব।

কথাটায় কেমন যেন অপরাধী বোধ হল নিজেকে। বললাম, বাড়িতে খেতে যাবি? তুই এখানে খাস্ না?

কুসুম বলল, খাই। দিনের বেলা খাই। জেঠি তো এ বেলা ভাত খায় না, তাই আর শুধু শুধু এখানে উনুন ধরাই না। খেয়ে আবার জেঠির কাছে চলে আসি রাত্রে। তুমি বস।

আমি বসলাম। কিন্তু মনে মনে অস্বস্তি হতে লাগল। পিশী বোধ হয় বিছানার ব্যবস্থা করছিলেন আর একটু ভাল ক'রে। ফিরে এসে বললেন, কাল থেকে কুসি এখানেই খাবে। তোর জন্যে তো রান্না হবেই। ওরও রান্না হবে। আমারও একটু হাড় জুড়োয়। ওখানে যা দিই, তাতে তো ছুঁড়ি পেট ভরে খেতে পায় না।

কুসুম আমাকে ভাত বেড়ে দিয়ে বলল, তোমাকে বলেছি, না?

—বলবি ক্যানে? বুঝতে তো পারি।

কুসুম জবাব দিল না। সে রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। বোধ হয়, জেল থেকে আসা লোকটার খাওয়া দেখার কৌতূহল।

বললাম, তুই তা' হ'লে খেয়ে আয় না কুসুম।

কুসুম যেন কতই বড়। আমাকেই যেন ও ছেলেমানুষ ঠাউরেছে। বলল, তুমি খাও দিকি। আমি এঁটো পেড়ে যাব।

অগত্যা। কিন্তু ভাত মুখে দেবার আগেই কুসুমের হঠাৎ হাসি শোনা গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, কী হল রে?

কুসুম বলল, তুমি এ রান্না খেতে পারবে না।

—কেন?

—তোমার ভাল লাগবে না।

—ও, তুই তা হলে জেলের চেয়ে খারাপ রাঁধিস্ বল্। আচ্ছা, খেয়ে দেখা যাক।

পিশী বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হাতের রান্না খেয়ে টেয়ে দ্যাখ্ দেখি। তারপর একটা ছেলে দ্যাখ্। দেখে বে'থা দে।

—অ্যা হ্যা হ্যা।

পিশীকে ভেংচে দিল কুসুম। তিনি সেদিকে ফিরেও দেখলেন না। বললেন, হরলাল যা করবে, তা তো বুঝতেই পারছি। ও কাজ আমাকে-তোকেই করতে হবে।

কুসুম চেষ্টা করছিল রান্নাঘরে চলে যাবার। কিন্তু যাওয়া হল না। সঙ্গে সঙ্গেই বলল, তার আগে তা'লে টোপনদা'র বে' দাও। নইলে তোমাদের দুটিকে এসে খাওয়াবে কে?

আমি হাসতে গেলাম। বুঝি ভাতই আটকাল আমার গলায়। নাকি বুকের মধ্যেই কোথায় খচ্ করে উঠল, বুঝতে পারলাম না। তবু হাসবার চেষ্টা করে, গম্ভীরভাবে বললাম, বটে?

পিশী বললেন কুসুমকে, সে বুদ্ধি আর তোকে দিতে হবে না। এই আসছে সবে, দ্যাখ্ ক্যানে, লাগালাম বলে।

কিন্তু আমি যে হাসতে পারছি নে? আমি কেন কথা বলতে পারছিনে? শালঘেরিতে যে আমি এমন ক'রে ছুটে এলাম, যদি আসতে পারলাম, তবে আমার আসতে চাওয়ার ইচ্ছেতে কে এমন ক'রে কালি লেপে দিতে চায়? যে-মহাকালের বিষাণের ধ্বনির কাছে আমি সাহস চেয়েছি, সে কেন এমন ভয় দেখায় মাঝে মাঝে?

আমি প্রাণ খুলে হাসতে পারলাম না বলেই বোধহয় প্রসঙ্গটা হঠাৎ থেমে গেল। চারদিকে নিঝুম। হয় তো আরও খানিকটা সময় গ্রামের স্পন্দন টের পাওয়া যেত। শীতকাল বলেই সব স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঝিঁঝির ডাক শুনতে পাচ্ছি। দূরে নয়, কাছেপিঠেই। বোধহয় দালানের মধ্যেই কোথাও কোনো কোণে কপাটের আড়ালে রয়েছে।

কুসুম বলল, ভাত দিই টোপনদা।

পিশী বললেন, বলার কী আছে? দে আরো দুটি।

সাড়ে তিন বছর পরে, বড় নতুন লাগল কথা কয়টি। কুসুমের মত মেয়ে এতদিন ভাত দেবে বলে দাঁড়িয়ে থাকেনি। পিশীর চাপিয়ে দেওয়া ভাতও এতদিন খেতে পাইনি। আজ বৈদ্যুতিক আলো নেই। কালও ছিল। আজ টেবিল চেয়ার নেই। পুরনো দালানের ভাঙা ফাটা অমসৃণ মেঝেয় আসন পেতে বসেছি আসন পিঁড়ি হয়ে।

আজ আমি আঁতুড় ঘরে এসে খেতে বসেছি। কুসুমকে বললাম, দে, আরও দে, বড্ড খিদে লাগছে। ডিমের ঝাল যে জোর রান্না করেছিস কুসুম।

পাতে ভাত দিল কুসুম। লজ্জা পেয়ে বলল, যাও। মিছে কথা। মন-

রাখা কথা, আমি যেন জানি না।

বললাম, কেন, তোকে বুঝি আমি খোসামোদ করব। আমার বয়ে গেছে। জানলে পিশী, তোমার দেওরঝিটি রাঁধে ভালই।

পিশী বললেন, সে আমি জানি। তবে মেয়েটির মুখদোষ আছে তো, তাই একটু ঝাল বেশি। তা' ভাল খাবে, ঝাল হ'লে একটু স'য়ে ট'য়ে নিতে হবে।

পিশীর রসিকতায় বুঝলাম, কুসুমের সঙ্গে তার জেটির সখীত্বও আছে। থাকাই স্বাভাবিক। দুজনে সারাদিন একসঙ্গে থাকে। মন খুললে, আর মন দিলে বয়স তো পৌষের কুয়াশা। বেলা বাড়লেই দেখাদেখি। ওদিকে মনের বেলাও বেড়ে যায়। বন্ধুত্ব আছে বলেই একজনের অত চোপা। আর একজনের অত শাসন।

পিশীর কথা শুনে কুসুম বলল, আহা!

অস্বস্তি নিশ্চয়ই হচ্ছে কুসুমের। লজ্জা মেশান অস্বস্তি। কুসুমের চেয়ে ছোট মেয়েকে বললেও, কোথা থেকে যেন লজ্জা এসে জড়িয়ে ধরে তাকে। সে বলে, আহা!

একটু দামাল হ'লে, এসে দু'ঘা বসিয়েও দিতে পারে। মেয়ে মাত্রেরই বুঝি ও লজ্জাটা থাকে।

কিন্তু কলকাতা শহর হ'লে, কুসুম আজ ফ্রক প'রে স্কুলে যেত। শালঘেরিতে ফ্রক পরতে না দিলেও, স্কুলে যেতে বাধা ছিল না। কুসুমের মত কোনো মেয়েই বোধহয় আজ স্কুলের বাইরে নেই এ গাঁয়ে।

সেইটি আমাদের এ গাঁয়ের গৌরবও বটে। গোটা জেলায় আর কোথাও আমাদের গাঁয়ের মত পুরনো গার্লস্ হাইস্কুল নেই। এ জেলার ছেলেরা 'লেখাপড়া জানা' মেয়ে বিয়ে করবার জন্যে শালঘেরিতেই চিরদিন ঘটক পাঠিয়েছে। উঠোন নিকোয়, ধান ভানে, তবু কলম ধরে। এমন মেয়ে যদি চাও তো শালঘেরি যাও।

কিন্তু কুসুমের কোথাও আমি স্কুলের ছাপ দেখতে পাচ্ছিনে। ও যে-ঘরের মেয়ে, সে ঘরে তা সম্ভব হয়নি হয়তো। জানি, এক্ষেত্রে অভাবটাই সব নয়। ইচ্ছেটাই বড় কথা। সে ইচ্ছের প্রতিরূপ হরকাকাকে তো চোখের সামনেই দেখলাম।

অথচ, কতটুকু কুসুম। কাব্যের ভাষায় 'কিশোরী' বলা যাবে না, কুসুমের শরীরে সে বয়সের প্লাবন এখনো নামেনি। হয়তো শারীরিক পুষ্টির অভাবেই সে প্লাবন থমকে আছে। তবু যে আগন্তুকা তার দীর্ঘ শরীরের রেখায় ধীর পায়ে আসছে, সে মায়াবিনীর নিষ্পাপ মোহ সঞ্চারিত তার আয়ত চোখের গাঢ়তায়। সেটুকু বুঝি তার দেহের চেয়ে মনের ছায়াই বেশি।

কারণ, সেটাকে পেরিয়ে গেছে কুসুম। স্কুলে যাবার মনটা ওর অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেছে। জল না পেয়ে। কে জানে তার অবশিষ্ট আছে কিনা ওর মনের

মাটির তলায়। কিন্তু আর একটা কাজও ও পারে। ও একটা বড় সংসার চালাতে পারে, সে বুদ্ধির ছাপ ওর চোখে মুখে। সচ্ছলতার সংসারে মল বাজিয়ে ফেরা নয়। অভাবের সংসারেই কুসুম আজ লক্ষ্মীরূপিণী হতে পারে। মা না হয়েও, মায়ের মন পেয়ে গেছে সে। তাই সংসার না করেও গিন্নী ব'নে গেছে। এ মনটাকে কারুর জল দিতে হয়নি। এ মনটা কুসুমের অনেক গাছের ভিড়ে, বনলতার মত বেড়েছে। এ সংসারের এ স্বাভাবিক রোদ-বৃষ্টি পেয়ে অনাদরে অবহেলায়।

জিজ্ঞেস করলাম, কুসুম, তুই স্কুলে পড়িস্ নি কোনোদিন?

কুসুম যেন চমকে উঠে বলল, হ্যাঁ। ক্লাস সিকস্ অবধি পড়েছি।

অবাক হলাম। সংসারে এমনভাবে ভিড়েছে, পড়ার ছায়াটুকু শুষে নিয়েছে সব। কিন্তু আর কেন পড়েনি, সেটা জিজ্ঞেস করলে ঠাট্টার মত শোনাবে।

পিশী বললেন, এই তো দু'বছর হল, ওসব একেবারে ঘুচেছে। হরলাল বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল, ওরও শেষ। নইলে, ভালই তো ছিল লেকাপড়ায় আর ওসব হবেও না। এখন যেখানে নোয়া বাঁধা আছে, সেখানে গেলেই আখেরটুকু কাটে।

কী আর বলব পিশীকে। কিছুক্ষণ আগেই পণ্ডিতমশাই যে এসে বলে গেলেন, সব যেন কেমন হ'য়ে যাচ্ছে। আমি কিছু বললেও পিশীর তেমনি মনে হবে। মনে হবে, সব যেন কেমন ধারা। কিন্তু নোয়া বাঁধার চেয়েও মেয়েরা যে আজ জীবনধারণের অপমান আর গ্লানিটাকে আগে দূর করতে চাইছে। কারণ, নোয়াটিকে নোয়া রাখতে চায় তারা। লোহার বেড়ী নয়।

খাওয়া শেষ করে উঠলাম আমি। পিশী বারণ করলেন আর এই ঠাণ্ডায় বাইরে যেতে। দালানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। নিতে নিতেই কুসুমের এঁটো পাড়া শেষ।

পিশী বললেন, পান খাবি র‍্যা টুপান?

—না পিশী, অন্য কিছু থাকে তো দাও।

কুসুম জিজ্ঞেস করল, খেয়ে এলে চুল বেঁধে দেবে জেটি?

পিশী বললেন, হ্যাঁ।

কুসুম যেন দৌড়ে পালাল। পিশী আমাকে বললেন, শুবি তো শুগা যা। নইলে বস, আমি একটু বসি। জপটা তখন থেমে গেছে। শেষ করে লিই।

আমাকে সুপুরি দিয়ে পিশী বসলেন আবার জপে। ওটুকু না হলে আজ আর দু'চোখের পাতা এক হবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উল্টে গেলেও নয়।

আমি বাবার ঘরে গেলাম। পুবদুয়ারী বাড়ি। পশ্চিমে খানিকটা বাগান। জানালাটা খুলে দিলাম আস্তে আস্তে। পিশী টের পেলে বকবেন। বাতাসও শীতার্ত। তবু না খুলে দিয়ে পারলাম না।

মনটা যেন এতক্ষণ ধ'রে নানান স্রোতের ধারায় ঘোলা হয়েছিল। কাল থেকেই এমন হয়েছিল। এবার যেন একটি নিঝুম অচেতনের মধ্য দিয়ে, ফিরে আসাটা আবার ভেসে উঠতে লাগল চোখের উপরে।

প্রথমেই কানে বাজল প্রেসিডেন্সী জেলের ওয়ার্ডারের বুটের খট্‌খট্‌ শব্দ। তারপরেই দূরাগত প্রহরা ধ্বনির সেই ডাক। ডাক এবং প্রত্যুত্তর।

ফিরে আসব, এ কথা কোনোদিন ভাবতে পারতাম না। অনেক বন্দী ছিলেন। এখনো কেউ কেউ আছেন। আমি ভাবতাম, আজীবন যেন আমি বন্দী হয়ে থাকব। চিরদিন ধরেই আছি। আমার আর কোনো বাইরের লজ্জা নেই।

শুধু দুটি জিনিস আমাকে আমার সব হতাশার গ্লানি থেকে মানুষ হিসেবে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এক—একদিন আমরা স্বাধীনতা পাব। আর এক—ইতিহাস, প্রত্ন এবং নৃতত্ত্বের ওপর কিছু বই। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক এবং নরতত্ত্বের বইয়ে কিছু জিজ্ঞাসার পিছনে পিছনে ছুটে বেড়ান। কর্তৃপক্ষের সন্দেহক্রমে, সেসব বইও আমি প্রথমে পাইনি। বিশিষ্ট রাজবন্দীদের চেষ্টায় পরে পেয়েছিলাম। আমার প্রতিমাসের প্রাপ্য টাকায়, শুধু বই কিনতে পেরেছি, সেইটিই আমার পরমভাগ্য বলে জেনেছিলাম।

কিসের যেন শব্দ হ'ল? চুড়ির শব্দ। কুসুম এল, ওরই কাঁচের চুড়ি বাজল। জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলাম আমি।

শুনতে পেলাম, পিশী আর কুসুম ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে। তা'হলে পিশীর জপ শেষ হয়েছে। ওরা বোধ হয় ভেবেছে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তাই চুপি চুপি কথা হচ্ছে।

সত্যি, আমার চোখে যেন এক প্রগাঢ় ছায়া। গভীর ভার। একটি প্রসন্ন অবসাদ আমার সর্বাঙ্গে। তবু ঠিক ঘুম তো আসছে না।

হঠাৎ শুনলাম, চাপা হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে দালানে। পিশীর বৃদ্ধ শ্লেষ্মাজড়িত হাসির শব্দই বেশি। তারপরেই, ধুপ্‌ করে একটি শব্দ। এবং সঙ্গে সঙ্গে পিশীর একটু চড়া গলা শোনা গেল, দূর হ মুখপুড়ি, দূর হ আমার সামনে থেকে। দেখি, সোজা হয়ে বস ক্যানে। চুলের জট ছাড়াতে তো আমি হিমসিম খেয়ে গেলাম। সাবাং দিস একটু মাথায়।

একটু পরেই দালানের দরজা বন্ধ হল। পিশী ডাকলেন, টুপান জেগে আছিস্‌?

হঁ্যা, পিশী। তোমরা শোও। আমি দরজা বন্ধ করছি।

তারপরে সব চুপচাপ। একটু বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পিশী হেঁকে ডেকে উঠবেন। তবু দরজার কাছে এলাম। এসে আমাকে থামতে হল। কে গান করছে?

আমি পা টিপে টিপে দালান দিয়ে এলাম পিশীর ঘরের জানালার কাছে। হ্যারিকেন তখনও জ্বলছিল। দেখলাম, কুসুম পিশীর গা ঘেঁষে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। আর পিশী গুন্‌গুন্‌ করে গান করছেন।

দোগ্‌ধোবতী গাভী
সে যে বড় ভাবী
অ'র‍্যা কালো রবি
যদিন ক্ষীর খাবি…

জানিনে, রোজ এ গান পিশী করেন কি না। এ যেন তাঁর মাতৃহৃদয়ের সব আনন্দ, সব বেদনা, সারাদিনের শেষে উৎসারিত হচ্ছে। মনে মনে বললাম, কুসুম আপন ঘরে স্নেহ না পেয়েও তুই স্নেহের সমুদ্রে শুয়ে আছিস। সংসারের সব হতভাগা ছেলেমেয়ের তুই হিংসার পাত্রী।

বাইরে আর গেলাম না। ফিরে এলাম ঘরে। নিঃসাড়ে দরজা বন্ধ করলাম। লেপ টেনে শুয়ে, অন্ধকারে তাকিয়েই মনে হ'ল, বাবার চোখ দুটি সামনে। আমার চোখ যেন আপনি নত হ'ল। আমি বললাম, বাবা, আমাকে ক্ষমা করুন।

যেন শুনতে পেলাম, বাবা বলছেন, জীবন পারাবারের কূলে এসেছিস্ টোপন। আজ রাতে ঘুমা।

ঘুম ভাঙল বেশ একটু বেলায়। জানালার ছিদ্র দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, তাতেই বুঝলাম রোদ উঠে গেছে। একেবারেই যে হতচকিত হইনি, তা নয়। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তারপরেই বুঝেছি, জেলে নয় বাড়িতে। শালঘেরিতে আজ আমার অনেক দিনের পরে রাত্রি প্রভাত হ'ল। কিন্তু যে গলাটা শুনে ঘুম ভেঙেছে, তার মিষ্টি তবু কর্কশ মেয়েলী আওয়াজ তখনও শুনতে পাচ্ছি, সাপ খেলা দেখ্‌বা গ। কালোমাণিকের নাচ্ দেখ্‌বা!…

ঘুম ভেঙেই সাপের কল্পনাটা ভাল লাগল না। কালো সরীসৃপের কল্পনায় গায়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠল। আমার শালঘেরির ঘুম ভাঙার ডাক। তবু, কতযুগ পরে যেন সাপুড়ে বেদেনীদের ডাক শুনলাম। খেলা দেখাও হবে। এখনও দিন যায় নি। শীতকালের মধ্যে ওরা আরও অনেকদিন আসবে। কিংবা শালঘেরির সীমান্তেই হয় তো ওরা যাযাবর ডেরা বেঁধেছে কোথাও। পথে পথে অমন ডাক আরও শোনা যাবে।

চাদর মুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বোঝা গেল, ঘরদোর মোছা হয়ে গেছে। ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছে উঠোন। কুসুমের ডুরে শাড়িখানিও উঠোনের দড়িতে মেলা হয়ে গেছে। অর্থাৎ স্নান সারা হয়ে গেছে ওর। কিংবা সকালবেলার গা' ধোয়া। কিন্তু কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। তবু পিশীর গলা শুনতে পাচ্ছি যেন কোথায়।

উঠোনে নেমে এলাম। ঝক্‌ঝকে নীল আকাশ মাথার ওপরে। রাস্তার ওপারেই অঘোর চক্রবর্তীর বাড়ি। উত্তরে চক্রবর্তীদেরই জ্ঞাতি অশনি রায়ের পাকা মোকাম। দক্ষিণে তাকালে প্রথমেই নজরে পড়ে, তিন রাস্তার মোড়ে, সোজা আকাশমুখী দেবদারু গাছ। তারও পরে কতগুলি শালগাছ।

শালঘেরির নামের মহিমাটা পুরোপুরি আছে। এমন পাড়া নেই, এমন রাস্তা নেই, যেখানে শালগাছ নেই।

দক্ষিণ দিকে তাকালে বোঝা যায়, গাছগুলি খুব তাড়াতাড়ি হারিয়ে গেছে আকাশে। কারণ, দক্ষিণে পুবে শালঘেরি ক্রমেই নামতে নামতে গিয়ে ঠেকেছে, শালঘেরির সীমানা তামাই নদীর ধারে।

শালঘেরিতে মাটি তার রূপের সীমানা বন্ধক রেখেছে। কোনোদিন প্রয়াগে যাই নি। শুনেছি, সেখানে গঙ্গা-যমুনার শ্যাম ও গেরুয়ার কুল বাঁধা। কেউ কাউকে নিয়ে রং-এ একাত্ম হয়নি। এই শালঘেরিতে এসে উত্তর পশ্চিমের পাথুরে রক্তাভা যেন আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। যেন জলে রং ধুয়ে গেছে। শালঘেরির দক্ষিণ সীমা পার হতে না হতেই, ধোয়া লালে যেন একটি ধূসরতার আভাস চোখে পড়ে। পাথর কমে আসে। কাঁকরের ছড়াছড়ি কমে যায়। কয়েক মাইলের মধ্যেই মাটি কালো হয়ে উঠেছে।

কিন্তু তামাই নদীর ওপারে লালের বিস্তারটা আর একটু বেশি। পাথুরে সীমা যেন গোঁয়াতুমি করে এগিয়ে গেছে আরও অনেকখানি। তারপরে একটু সুদীর্ঘ বাঁক নিয়ে, পুববন্দী করে ঘাড় গুঁজে গুঁজে উঠেছে উত্তরে। তামাইয়ের ওপারে ঘন শালবন।

কিন্তু না, এখানে দাঁড়িয়ে আর শালঘেরির রূপ চিন্তা করতে পারিনে। চোখে মুখে একটু জলের ছিটা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। গোটা শালঘেরিকে আজ একবার প্রদক্ষিণ করে, তবে ঘরে ফেরা।

কুয়োতলা থেকে ফিরতে গিয়ে, চোখে পড়ল পিশী বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। এগিয়ে গেলাম। ঝুড়ি দেখেই বোঝা গেল, মাছ নিয়ে এসেছে। কিন্তু সে মাছে পিশীর মন ওঠেনি। তাই আর কোনো মাছ জেলে এনে দিতে পারবে কি না, তারই খোঁজখবর চলছে।

একলা পিশী নেই সেখানে। কুসুম তো আছেই। তা ছাড়া আশে-পাশের বাড়ির মেয়েরাও আছে দু'তিনজন, তার মধ্যে অঘোর জ্যাঠামশায়ের স্ত্রী। জ্যাঠাইমা বলে ডাকি তাঁকে। কাকীরা আমাকে দেখে ঘোমটা টেনেছেন। ওটা বয়স্ক ভাসুরপোর প্রতি সমীহ দেখানো।

চক্রবর্তী জ্যাঠাইমা বললেন, এসেছিস বাবা ফিরে! এই মাত্তর ঠাকুরঝির মুখে শুনছিলাম। কতদিন পর!

আমি প্রণাম করলাম। মাথায় হাত দিয়ে বললেন, বেঁচে থাক্ বাবা। বেঁচে থাক্।

পাড়ার কাকীদেরও জনে জনে প্রণাম করতে হল। প্রণাম না করাতে যাঁদের আধুনিক বাতিক আছে, আমি সেই দলে পড়িনে। এ আমার রক্তে আছে। ভালমন্দ জিজ্ঞাসাবাদ হ'ল খানিকক্ষণ। অঘোর জ্যাঠাও এসে উপস্থিত হলেন। ছোটখাটো ভিড় জমে গেল একটি আমাদের বাড়ির সামনে।

জেলেটি এতক্ষণে বলল আমাকে, চিনতে পারছেন গ' দাদাঠাকুর। আমি জেলেপাড়ার বৈকুণ্ঠ।

বলে সে উপুড় হয়ে নমস্কার করল। অদর্শন একটা অস্পষ্টতা এনেছে। বললে আর চিনতে ভুল হয় না। তামাই নদীর জেলেপাড়ায় সবাই আমাকে চেনে। আমিও চিনি তাদের সবাইকে। কারণ তামাইয়ের তীরে তীরে আমার অনেক অস্নাত অভুক্ত বেহিসেবী দিন কেটেছে ঘুরে ঘুরে। আরও কাটবে। সেজন্য আমি প্রস্তুত হয়েছি।

বললাম, মনে আছে বৈকি। কেমন আছ বৈকুণ্ঠ?

বৈকুণ্ঠ বলল, দিনকাল বড় খারাপ। তা সেকথা থাক। আমি চলি, বড় মাছের লাগাড় দেখি আগে।

পিশী বলে উঠলেন, অ, মানুষ চিনছিস, অমনি ছুটছিস মাছের জন্যে। আর আমি বুড়ি যে এতক্ষণ চেঁচিয়ে মরে গেলাম, তখন তোর চেতন নাই।

বৈকুণ্ঠ যেতে যেতে বলল, বলতে নাগে ঠাকরুন্, এ কি যে সে দাদাঠাকুর, জেল থেকে আইসছেন।

শহর নয় গ্রাম। রাস্তার ওপর হলেও সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ঢুকতে হয়। বেশ বুঝতে পারছি, আমার দুই ডানায় যেন দুটি পাখার কাঁপুনি লেগেছে। সে উড়তে চায়। উড়ে বেড়াতে চায় শালঘেরির আকাশে। মন আর স্থির থাকতে চায় না।

কুসুম বলল, টোপনদা, নিমের দাঁতন চাই?

—দে।

নিমের দাঁতন দিয়ে কুসুম বলল, চা খাবে?

বিলক্ষণ। কিন্তু এ বাড়িতে বাবা কোনোদিন চা খেতেন না। পিশীকে আমার জন্যে বরাবর চায়ের ব্যবস্থা রাখতে হ'ত। আর সেয়ানা বয়সেও বাবাকে সেটা না লুকিয়ে খেলে চলত না। টের পেলে যে রাগারাগি করতেন তা নয়। সংস্কারে লাগত তাঁর। চা'কে কোনোদিনই ভাল নজরে দেখেন নি। যদি জানতে পারতেন, শ্রীমান প্রতিদিন বাড়িতে অন্তত দু'বার চা পান করেন, তা হলে, মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অসন্তুষ্ট হতেন। কিংবা এ শুধু আমারই ধারণা। বাবা হয় তো জানতেন সবই। জেনেও না জানার ভান করে, চুপ করে থাকতেন।

বললাম, চা'য়ের ব্যবস্থা সব আছে তো?

কুসুম বলল, জেঠি সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে। কাল রাতে আমাকে বলে রেখেছে, সকালে মুখ ধুয়ে উঠেই তুমি চা খাবে।

বললাম, তবে আর দেরী নয়, শীগ্‌গির চা পিয়ে দি গে যা।

বলে দাঁতন করতে করতেই একটু অবাক হয়ে বললাম, আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছিস রে কুসুম?

কুসুম হেসে মরে গেল। মুখে আঁচল চেপে, হাসি সামলে সে বলল, কী

কী আবার ? তোমাকেই দেখছি।

—আমাকে দেখার কী আছে ?

কুসুম সেকথার কোনো জবাব না দিয়ে বলল, জেলে গেলে বুঝি মানুষ ফরসা হয় টোপনদা ?

—কেন রে, আমি কি একেবারে কালীকেষ্ট ছিলাম নাকি ?

—ছিলে না ? তুমি আমার চেয়ে কালো ছিলে।

—তবে এখনো তাই আছি।

—ইস্‌। তুমি এখন কী ফরসা হয়ে গেছ। আমার চেয়ে অনেক ফরসা হয়ে গেছ।

যে-দেশে মেয়ের রং কালো হলে বরের ঘটকেরা মুখ ফেরায়, সেই দেশের মেয়েরা রং নিয়ে চিরদিন অশান্তিতে মরে। শুধু বা তাই কেন ? ফরসা হতে ইচ্ছে যায় সকলের। সুন্দর হওয়ার ইচ্ছে। কুসুম জানে, ওকে দেখতে এসে কেউ কালো বলবে না বটে। ফরসাও বলবে না। তাই জেলে গেলেও লোকে ফরসা হয় নাকি, এ বিস্মিত প্রশ্ন ওর মনে জেগেছে।

পিশী যেন কী কাজে ব্যস্ত ছিলেন ঘরে। বাইরে এসে বললেন, হ্যাঁ, তা গায়ের রংটা তোর এক পোঁছ ঘষে মেজে দিয়েছে জেলখানা থেকে।

বললাম, পিশী, এ তো তোমাদের গাঁয়ের জল নয়। মেশিনে শুদ্ধ করে নেওয়া কলকাতার জল। মানুষের আসল রং ধুয়ে দেয়, তাকে আর চিনতে দেয় না।

পিশী বললেন, তবে এদিককার মেয়েগুলনকে বে'র আগে কিছুদিন কলকাতায় রেখে দিলে হয়।

আমি বললাম কুসুমকে, দ্যাখ কুসুম, জেলখানায় যাস তো বল্‌। মেমসাহেব সেজে আসবি, রাজপুত্তুর বরের আর অভাব হবে না।

কুসুমের জবাব পাওয়া গেল, ঝাঁটা মার রাজপুত্তুরের মাথায়। আমার চাই না। তুমি এখন তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এস দিকি। চায়ের জল আমার হয়ে এল।

অমনি পিশী ছুটলেন। নিশ্চয় খাবারের ব্যবস্থায়। কুয়োতলায় পা বাড়িয়েছি। এমন সময়, দরজার কাছ থেকে হাঁক, এইস্যে পড়লাম গ' টোপনদাদা।

আমি ফিরে অবাক হয়ে বললাম, আরে, ছোটবাবু যে ? তুমি একেবারে সাত সকালে মাথায় মাল চাপিয়ে হাজির ?

শালঘেরির বচন মাহাতো মাথায় মাল শুদ্ধই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আগে একগাল হাসল। বলল, ধরে না লামালে যে ঢুইকতে পারছি না। একবারটি ধর এইসে।

আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রাঙ্কের হাতল ধরলাম।

পিশী বেরিয়ে এসে বললেন, একেবারে দালানে এনে তোল বাবা, উঠোনে

আর নামাসনে।

কিন্তু নামাতেই হল। কারণ, দরজা দিয়ে সব ঢুকবে না বলে, একে একে দালানে আনতে হ'ল সব। এই শীতের মধ্যেও বচনের ঘাম দেখা দিয়েছে।

বললাম, হ্যাঁরে ছোটবাবু, তুই এসব মাথায় বইতে গেলি কেন? আমি তো এখুনি গরুরগাড়ি পাঠাচ্ছিলাম সব আনতে। আর এ কি একটা মানুষের কাজ?

বচন পিশীর দিকে ফিরে, বেশ একটু শ্লেষভরেই বলল, দ্যাখো দিকি ঠাকরুন কথার ছিরি? এ্যাট্‌টা মানুষের কাম না ত কি দুটো মানুষ বয়ে আনছে? এনেছি যখুন, তখন এ্যাট্‌টা মানুষেরই কাম বইলতে নাগবে, আঁ? কি বল গ?

পিশী বললেন, বটেই তো। ওরা বাবা সবই উল্টা বোঝে।

বচন মাহাতো সঙ্গে সঙ্গে বলল, বটে না? মিছিমিছি এ্যাদ্দিন জেল খেটে আসলে, বাব্ধবহারা হলে, স্বরাজ তো ঢু ঢু।

বলে বচন মাহাতো এতক্ষণে আমাকে এসে প্রণাম করল। সে বরাবরই এরকম। বক্তৃতা সে দেবেই দেবে। শালঘেরির প্রাক্তন স্টেশনমাস্টার মহাদেব-বাবু এইটি শিখিয়েছেন বচনকে।

বললাম, বিয়াল্লিশের নেতারা এবার সব ছাড়া পাচ্ছে, স্বরাজ আসবে এবার, দাঁড়া। তা তুই কেমন আছিস ছোটবাবু?

আর সকলের মত বচনও জানাল, আর থাকা না থাকা। দেশখানা তো ফের মন্বন্তরের দেশ হয়ে গেল। সে যাক গা, আমার এ্যাট্‌টা প্যাট, পরিবার নাই, ছেলেপিলে নাই, কাঁসী পিটে কাটিয়ে দেব। উদিকে তোমাদের মাস্টেরের কীর্তিকলাপ শুনেছ ত?

—কোন্‌ মাস্টার?

—মাহাদেববাবু গ, মাহাদেববাবু, তোমাদের শালঘেরির ইস্টিশন মাস্টার।

—শুনেছি। তিনি তো গড়াইয়ে নাকি আখড়া খুলেছেন।

—আখড়া? কিসের আখড়া, তা শুনেছ কী?

—বৈষ্ণবের আখড়া।

—হুঁ। তার সঙ্গে কিশোরী-ভজনও চলেছে।

—কিশোরী ভজন?

বচনের মুখের ভাব দেখে আমার হাসি পেল। বোধহয়, ওর মুখে তামাক পাতা পোরা আছে। তাই ঠোঁট দুটি অমন টিপে শক্ত করে রেখেছে। কালো কুচ্‌কুচে চেহারা। ইঁদুরের মত কালো কুত্‌কুতে দুটি চোখ। পেশীবহুল প্রৌঢ় শরীর। কাঁচাপাকা চুলের মাথার পিছনের অর্ধেক প্রায় কামানো। গায়ে নীল কুর্তা। পরনে একটি ছেঁড়া, তালি মারা খাকী প্যাণ্ট।

ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, সে, হাঁ, উনি যা করছেন, তাকে নিকি অই বলে। অই কিশোরী ভজন। গড়াইয়ের ডোমপাড়ার ছেউটি রাড়ি, আতি ডোমনী নিকি

আধা (রাধা) হইয়েছেন। আর মাহাদেব আর মাহাদেব নাই, উনি কেষ্ট হইয়েছেন। লাগ্ ভেল্কি লাগ্।

কুসুম খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। পিশী ধমকালেন, এ্যাই ছুঁড়ি, চুপো।

কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা অভাবিত মনে হচ্ছে। মহাদেববাবুর কথা শুনে বরাবরই মনে করেছি, জীবন সম্পর্কে ভদ্রলোকের তিক্ততা অপরিসীম। কোথাও কোনো আকর্ষণ নেই। বরং সংসার বৈরাগী বলা যায়।

আমার হতচকিত বিভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, হাত তুলে যেন সান্ত্বনা দিল বচন। বলল, আরো আছে। লীলা এখানেই খতম লয়। উদিকে, এই বুড়া বয়সে মামলায় পড়তে হয়েছে মাহাদেববাবুকে। ওয়াঁর ইস্তিরি খোরপোষের দাবি ক'রে মামলা করেছেন। যাও, ইবারে দাঁতন কাটি ফেলে মুখ ধুয়্যা আস, তা'পরে কথা হবেন।

তাই যেতে হয় এর পরে। বচনের কথা যদি সত্য হয়, তা'হলে খবর খুবই খারাপ। মহাদেববাবু কতখানি মন্দ, সেটাও বিচার্য। ভিতরের ব্যাপার তো কিছুই জানিনে। মহাদেববাবুর অত্যন্ত সংসারবিদ্বেষী কথাবার্তা শুনেও কোনোদিন ভদ্রলোককে আদতে খারাপ মনে হয়নি। কিন্তু এসব কিশোরী-ভজনের সাধ এই প্রৌঢ়ত্বের অন্তিমে এসে কেন হল তাঁর ?

তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এলাম। বললাম, ছোটবাবু কিছু খা আগে।

—বা! না খেয়ে যাব নিকি ? পেরথমটা তো বিশ্বেসই করতে পারি না, তুমি আসছ। মালপত্রগুলন দেখে টুকুস বা পেত্যয় হল। তা'পর এখন যিটি আছেন ইস্টিশনে, সিটিও তো পাগল।

—পাগল ?

—হুঁ। বদ্ধপাগল। মাহাদেববাবু খালি পাঠ শুনাতেন। আর ইনি মৌনীবাবা। সারাদিনে কথাটি নাই। তাকিয়ে আছে তো তাকিয়ে আছে। বসে আছে তো আছেই। কাছে বসে থাকলে টের পাবার যো নাই, মানুষ বসে আছে। দশটা কথা জিজ্ঞেস করলে, এ্যাট্টার জবাব পাওয়া যায়। ইদিকে মেজাজখানিও সুবিধার লয়কো মোটে। বড় রাগ। ভয়ে মুখ খুলতেও পারি না। কী গেরো বল দিকিন্। মাহাদেববাবু কথা বলা অভ্যেস করিয়ে গেলেন, ইনি বোবা করতে চান।

কুসুম আবার খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। আমারও হাসি পেল। সত্যিই তো। দুই দেবতার টানাপোড়েনে বচন মাহাতোর প্রাণ যাচ্ছে। একজন কথা বলতে শিখিয়েছে। আর একজন চুপ করতে শেখাচ্ছে। শালঘেরি স্টেশনের এও এক বৈচিত্র্য দেখছি।

বচন আবার বললে, কাল রাতে আমাকে বোবা মাস্টের বললে, তোমার জিনিসপত্তর লেবার জন্য গাঁ থেকে লোক যাবে সকালে। অ মা! ভোর রাতে আমার গা থেকে কম্বল টেনে নিয়ে বলে কি না, মালগুলন পেঁছে দিয়ে এস। আমি বলি, কেন ? / এত সাত সক্কালে কী হল ? না, ভদ্দরলোকে, মানে তুমি,

ভদ্দরলোকের জামাকাপড় সব এখানে পড়ে রইছে, গায় দিতে অসুবিধা হবে। এখুনি নিয়ে যাও। নিয়ে যাও তো নিয়ে যাও। এ হুকুমের আর নড়চড় হবার যো নাই। আর অত সকালে কুথা গরুর গাড়ি, কুথা রিশকা, কে খোঁজে। অবিশ্যি—

বচনের কয়েকটি দাঁতশূন্য কালো মাড়ির হাসিটি এতক্ষণে দেখা গেল। বলল, আমারও আসবার জন্যে মনখানি বড় আঁকপাক্ করছিল। কিন্তুন্ কি জান টোপনদা, আমার আসতে মন করছে জানলে ও বোবা মাস্টার আমাকে আর আসতে দিত না।

কুসুম হেসে লুটিয়ে পড়ল। বলল, কেন? লোকটা সত্যি সত্যি পাগল নাকি গো?

পিশীও হেসে বাঁচছিলেন না বচনের কথায়। আর আমি যেন শালঘেরির মত সুখ-দুঃখ হাসি-বেদনার কথা আকণ্ঠ পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলাম।

বচন কুসুমকে বলল, তবে আর বলছি কি গ খুকী দিদি। বচন মাহাতোর কপাল এমনি। পাগল নিয়ে আমার বাস, তানারাই আমার মুরুব্বি।

কুসুম বলে উঠল, ও জেঠি, লোকটাকে আমি দেখতে যাব।

আমার বিস্ময়ের আগে পিশীর চোখ দেখলাম কপালে উঠেছে। বললেন, কী বললি রাক্ষুসী, এই ইস্টিশন মাস্টারটাকে দেখতে যাবি তুই?

কুসুম বলল, হ্যাঁ।

পিশী ক্ষেপে উঠে বললেন, ঠেঙিয়ে তোর পা খোঁড়া করব আমি। পাগল যাবে আবার পাগল দেখতে।

কুসুম ছুটে পালাল রান্নাঘরের দিকে।

সেইটিই সত্যি। কুসুমের বিচিত্র দাবী। আসলে স্টেশনমাস্টার বিজন ঘোষ যে সম্পূর্ণ আলাদা লোক, সে ধারণা ওর নেই। বচন একজন পাকা শিল্পী। কোন্ লোক কেমন, সেটা ওর কাছে কিছু নয়। লোকটাকে ওর নিজের কেমন লেগেছে, সেইটিই বড় কথা। নিজের যেমন লাগে, ও তার তেমনি রূপদান করে। হয়তো এর পরে ও বিজনবাবুকে গিয়ে বলবে, টোপন দাদাদের বাড়ির খুকীদিদি তোমাকে দেখতে আসতে চেয়েছে। কেন? কে জানে? তোমাকে দেখতে আসার জন্য সে পাগল। ব্যস্। বিজনবাবুর মাথাটি যাবে খারাপ হয়ে।

অথচ আমি তো একটু দেখেছি বিজনবাবুকে। যে-ছায়া বচন দেখতে পায়নি তাঁর মুখে, সে ছায়া নির্বাসিতের বেদনা। ভদ্রলোকের বয়স অল্প। উৎসাহ করলে, কোথাও যে বদলি হয়ে যেতে পারেন না, তা নয়। হয়তো স্বেচ্ছায় এ নির্বাসন বেছে নিয়েছেন। তাঁর সে-কথাটি তো ভোলবার নয়, 'সময় পেলে এ বিজনে আসবেন মাঝে মাঝে।'

বচনকে পিশী ধামা ভরতি মুড়ি মুড়কি বাতাসা দিলেন। শালঘেরির ময়রা পাখীর দোকানের ছানার মিষ্টিও দেখলাম পড়েছে বচনের পাতে। বচন

জল চেয়ে মুখ ধুয়ে উঠোনের রোদে বসে গেল ঠ্যাং ছড়িয়ে।

কুসুম বলল, টোপনদা, তোমার চায়ের জল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

বললাম, আবার গরম কর।

পিশী রাশিখানেক খাবার এগিয়ে দিলেন সামনে। দেখে আমার চক্ষুস্থির।

বললাম, পিশী, তুমি কি ভেবেছ, জেল থেকে আমি একটা রাক্ষস হয়ে ফিরে এসেছি।

পিশী বললেন, ওরে, না না, রাক্ষস ক্যানে হবি। ওটুকুন খেতে পারবি।

পারি না পারি, আমাকে বসতে হবে। যা পারি খাব। চিরদিন তাই খেয়েছি। এই সাড়ে তিন বছরে সে অভ্যেসটা একেবারে কাটিয়ে দিয়েছে জেলখানা।

ট্রাঙ্কটার দিকে চেয়ে আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম বিজনবাবুর কাছে। বচনের কাছেও। জামাকাপড়ের অসুবিধা তো ছিলই। বইপত্রগুলির জন্যে মনটা ভিতরে ভিতরে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল।

কুসুম চা করে নিয়ে এল। আমাকে জিজ্ঞেস করল, টোপনদা, তোমার ওই ছোটবাবুকেও চা দেব নাকি?

—দিবি না? ও চায়ের যম।

কুসুমের চোখে একটু চিন্তার ছায়া। সে গলা নামিয়ে পিশীকে জিজ্ঞেস করল, ওকে কিসে করে চা দেব জেঠি?

—ক্যানে, গোয়াল ঘরে পুব তাকে একখান পেতলের গেলাস আছে না? রাখালের গেলাসটা? ওতে করেই দে।

চা নিয়ে গেল কুসুম বচনের কাছে। বচন প্রায় একটি উল্লসিত হুংকার ছাড়ল, চা? আরে বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্! তা টোপনদাদার যে ছোট বুইন আছে, তা তো জানতাম না?

আমিই বললাম দালান থেকে, আমার সব খবরই বুঝি তুই জানিস ছোটবাবু?

বচন বলল, তা শালঘেরির সকলের খবরই আমার কিছু কিছু জানা আছে টোপনদাদা। আমি জানতাম, তুমি এক ছেলে।

বললাম, তবে জেনে রাখ, একটা বোনও আছে।

—বেশ, বেশ। খুকুদিদির রাজপুত্তুর বর হোক।

আবার রাজপুত্তুর? শুনতে পেলাম কুসুমের ভ্যাংচান, ই হিঁ হিঁ।

বচন বলল, তা ভ্যাংচালে কী হবে গ। অই যা বলে দিলাম, তা দিলাম।

কিন্তু কুসুমের মন এখন সেদিকে নয়। সে আবার পুরনো প্রসঙ্গটা টানল। বলল, কী করে তোমাদের ওই ইস্টিশন মাস্টারটা? গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে?

—হ্যাঁ।

—বিড়বিড় করে বকে ?

বচন দ্বিধাহীনভাবে বলল, তা কি আর না বকে ? খুব বকে। বিড়বিড় করে ছড়া কেটে বকে।

—ছড়া কাটে ?

—হ্যাঁ। সে ছড়া তুমি আমি বুঝতে লারব। সমস্কেতর ছড়া। আবার পকেটে বই রাখে। সে-বই বের করে, পড়ে পড়ে ছড়া কাটে। অই তোমার গে যাত্রার পাঠ বলার মতন।

বচনের কথা শুনে বুঝতে পারি, বিজনবাবু কবিতা আবৃত্তি করেন। আর হয়তো, পকেট থেকে যে-বইগুলো বের ক'রে তিনি ছড়া কাটেন, সেগুলোই ও'র একমাত্র সঙ্গী। মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক আমার দলের লোক।

তারপরেও কুসুমের বিস্মিত প্রশ্ন, একা একা আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসেও ?

বচন নির্বিকার ভাবে বলল, হাসে বৈকি খুকীদিদি।

কুসুমের বিস্ময় এবং উৎসাহ ক্রমেই বাড়ছে। জিজ্ঞেস করল, কামড়ে টামড়ে দেয় ?

বচন আরও উৎসাহিত। বলল, খেপে টেপে গেলে, তা কি আর না দেয় ?

কুসুম। ও মা! ও তো ক্ষ্যাপা পাগল।

বচন। ক্ষ্যাপাই তো খুকীদিদি।

এর পরেই কুসুমের যুক্তিবাদী প্রশ্নটা শোনা গেল, তবে লোকটাকে ইস্টিশন মাস্টার ক'রে রেখেছে কেন ?

কিন্তু বচন তাতেও দমবার পাত্র নয়। বলল, অই, বোঝ। সরকারের খেয়াল। সব তো পাগল। সরকারও পাগল।

এবার বোধ হয় কুসুমের একটু সন্দেহ হয়েছে ? কিন্তু না। কুসুম হাসছে।

সব পাগল এ সংসারে। মস্তিষ্ক ভাল শুধু বচন আর কুসুমের। আমার খাওয়া তখন সাঙ্গ হয়েছে। বাইরে এসে বচনের দিকে একবার ভাল ক'রে তাকালাম। তারপরে জিজ্ঞেস করলাম, তারপর তোমার খবর কি ছোটবাবু ?

বচন তখনো আমার মতলব টের পায়নি। তাই সচ্ছন্দভাবেই বলল, কেটে যাচ্ছে টোপনদাদা। আমাদের আবার খবর।

বললাম, না না, সে সব খবর জিজ্ঞেস করছি না। তোর গুণপনার কথা জিজ্ঞেস করছি। ওদিকে কেমন চলছে টলছে।

একেবারে জোঁকের মুখে নুন। বেগতিক বুঝে বচন হো হো ক'রে হাসি জুড়ে দিল।

পিসী কিছু বুঝলেন না। তারা তাকিয়ে রইল বচনের দিকে।

আমি বললাম, না না, হাসি নয় ছোটবাবু। তোর মাইনের টাকাগুলো যায় কোথায়, সেটা বল্। পরকে তো পাগল বলা হচ্ছে, নিজে তুই কী, সেটা বলে যা। মাসের শেষে মাইনে পেয়েও তোকে ধার করে চাল কিনতে হয়, কেন ?

বচন তখন খাবার আর চা শেষ করে, কুয়োতলায় গেছে গ্লাস ধোবার জন্যে। আর বোকার মত হাসছে।

পিশী বললেন, ক্যানে র‍্যা টুপান, কী করে ও টাকা দিয়ে।

—জিজ্ঞেস কর না বাবুকে।

কুসুমই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, কি কর ছোটবাবু?

বচন বলল, অই টোপনদাদার যেমন কথা। ওতে কান দিতে নাই।

—কান দিতে নাই?

আমি বললাম, জান পিশী, কলসি কলসি তাড়ি গিলে মরে।

—ও মা! নেশুড়ে?

—শুধু তাড়ি নয় পিশী, বাবুর মদ ভাং গাঁজা কিছুটি বাকী নেই।

একেবারে অধোবদন বচন। কে বলবে, সে এতক্ষণ এত কথা বলছিল। কুসুম ততক্ষণে হেসে গড়িয়ে পড়েছে। পিশী কি বলতে যাচ্ছিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি তাকে দেখতে পেলাম। দেখে যেন আমি কেমন থতিয়ে গেলাম। আমার সকালবেলার রোদ বুঝি চকিতে কালকুটি মেঘে ঢেকে যাচ্ছিল। যে এসেছে, সেও দরজায় দাঁড়িয়েছে থমকে। চোখ তার পুরোপুরি আমার দিকে নয়।

একবার, একমুহূর্ত আমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। একটা হিংস্র বিদ্বেষ আর ঘৃণা আমার ভিতরে শাণিত হয়ে উঠল। আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে চাইলাম তৎক্ষণাৎ। আমার গলার কাছে একটি তীব্র গর্জনের কটু অপমানকর সম্বোধন উথলে উঠতে চাইল।

কিন্তু আর একবার দরজায় তার প্রতি চোখ পড়তেই, আমি যেন চমকে সংবিত ফিরে পেলাম। আমার ভিতরে কে যেন ছি ছি করে ধিক্কার দিয়ে উঠল। মুহূর্তে আমি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। বুকে টেনে নিয়ে বললাম, ভবেন. ভব, তুই এসেছিস? এসেছিস?

মুখ তুলে আমি ভবেনের চোখের দিকে তাকালাম। ভবেন যেন লজ্জিত বিষণ্ন। ভাল ক'রে চোখ তাকাতে পারছে না। আমাকে জড়িয়ে-ধরা তার হাত দুটি যেন কাঁপছে। বলল, জোর ক'রে চলে এসেছি।

হে মহাকালের বিষাণ ধ্বনি, আমাকে সাহস দাও। আমাকে সাহস দাও। ভবেন আমার বুকে। আমার আবাল্যের বন্ধু। ওর সঙ্গে কথা বলবার সাহস আর ভাষা দাও।

সহজ গলাতেই বললাম, কেন রে, জোর করে কেন?

ভবেনের ঠোঁটও কাঁপছে। চওড়া শ্যামল পুরুষ ভবেন। মাথার চুল ওল্টানো, বড় বড়। দেখলেই বোঝা যায়, তার মোটা চুলের গোড়া অত্যন্ত শক্ত। দৈর্ঘ্যে আমার চেয়ে কিঞ্চিৎ খাটো। কিন্তু আমার চেয়ে শক্তিশালী নিঃসন্দেহে। গেরুয়া পাঞ্জাবী আর ধুতি তার পরনে। নতুন শুধু একটি জিনিস দেখছি। ভবেন গোঁফ রেখেছে।

দেখলাম, ভবেনের সেই চিরদিনের ঈষৎ রক্তাভ চোখ দুটিতে কেমন এক সংকোচ ও অপরাধের ছায়া। জানি নে, ওর চোখে জল আসছে নাকি।

সে আমাকে প্রায় ফিস ফিস করে বলল, কেন জানি না টোপন। আমি সাহস পাচ্ছিলাম না।

আমারও গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। তবু জোর ক'রে, স্বাভাবিক গলায় তাড়াতাড়ি বললাম, ছি ছি ভব, ওকথা বলিস না। তুই একটা উল্লুক।

থেমে থেমে, অনেকটা যেন চুপি চুপি বলল ভবেন, আমাকে তাই বল্‌ টোপন, তাই তুই আমাকে বল্‌। কিন্তু তুই এসেছিস্‌ শুনে আমি কেমন ক'রে ঘরে বসে থাকি?

আমার বুকে উথলে কী যেন ঠেলে আসতে চাইছে। কিন্তু তা আসতে দিলে চলবে না। শালঘেরি! আমি তোমার বুকে ফিরেছি। এখানে আমার চিরদিনের অধিকার। এখানকার ধুলোয় লুটিয়ে হেসে খেলে বেড়ানো আমার রক্তগত দাবি। আমাকে তুমি বাদ সেধ না।

বললাম, তুই ঘরে বসে থাকলেই বুঝি সব মিটে যেত। আমি যেতে পারতাম না তোদের বাড়ি? আমার বুঝি পা নেই? না, আমার দাবি নেই?

ভবেন তেমনি চাপা গলায় বলে উঠল, রাস্কেল, তুই একটা রাস্কেল। দাবিদাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করছিস তুই? কিন্তু তুই কি আর সত্যি যেতিস টোপন?

নিজের কাছে নিজেকেই জিজ্ঞেস করি, যেতাম কী? আমি যে অনেক ছোট, অনেক হীন। হয়তো যেতাম না। কারণ, আমি যে কাল থেকে বারে বারে ভবেনের প্রসঙ্গ উঠতে না দেবার চেষ্টা করেছি। বিদ্বেষই বোধ হয় নয় শুধু। ভয়ে, আমার অক্ষমতা, আমার ছোট প্রাণের, আমার শামুকের মত গুটিয়ে যাওয়া মনের ভয়ে, ভবেনের নাম কাল আমি একবারও উচ্চারণ করিনি।

বোধহয় তাই আমি বন্ধুর সঙ্গে লুকোচুরি করে কথা বললাম আজ. যেতাম কি না, না এসে পরীক্ষা করে দেখতিস। আয়, ঘরে আয়।

বুঝতে পারছিলাম, উঠোনের ওপর বাকী তিনটে লোক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। পিশী, কুসুম আর বচন। জানিনে, আমাদের কথাবার্তা তারা কতখানি শুনতে পেয়েছে।

আমরা ফিরতেই বচন বলে উঠল, ই দেখ, কাকে বলে বন্ধুত্ব।

কুসুম হাসছিল আগে থেকেই। পিশী বললেন, হ্যাঁ, এ্যাদ্দিনে ভবেন ঠাকুরের দেখা পাওয়া গেছে টুপান চাটুজ্যের বাড়িতে। বন্ধুটি গিয়ে ইস্তক, ইদিকে আর ছায়াটি মাড়ায় নাই, বুঝলি টুপান। পিশী ম'ল কি বাঁচল, কোনো খোঁজ নাই।

ভবেন তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ ক'রে বলল, সেকথা বললে চলবে না পিশীমা। বিজয়া দশমীর দিন প্রত্যেক বছরে এসেছি।

পিশীমার ঠোঁট দুটি একেবারে বেঁকে উঠল। বললেন, উঃ উঃ, বাপ্‌স্‌রে! শালঘেরির দখিনপাড়া থেকে উতরপাড়ায় আসা কি চাট্টিখানি কথা? বলে বিশ কোশের তফাৎ।

ভবেন অসহায় হয়ে পড়ল। বেচারী! কী করবে। নানান কারণে আসতে পারেনি। তা'ছাড়া মন নিয়ে কথা। পিশীর সঙ্গে কী কথা বলতে আসবে ভবেন। ওর জীবনে পরিবর্তনও এসেছে। ওর ঘরে এখন…। আবার আমার ভিতরে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আমি মনে মনে বললাম, চুপ। চুপ কর।

তবু পিশীর দিক থেকে এ অভিযোগটুকু শুনতেই হবে তাকে। পরিত্রাণ নেই।

ভবেনকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। বচন বলল, অই গ' টোপানদাদা, দাঁড়াও। এখন তো আর আমাদের মুখ তাকাবে না। বোবা মাস্টেরের সাইকেলটা দাও, লিয়ে যাই। আর বোবা মাস্টের বারে বারে বলে দিয়েছে কী যেন বইললে? হুঁ হুঁ, বলে দিয়েছে, বেজনে যেইও। তা বেজনটা কুথা গ?

হেসে বললাম, সে তুই চিনবি না।

বচন বলল, বেশ না চিনলাম। কিন্তুক বেজনে যাও না যাও, বলে যাই, মাঝে মধ্যে টুকুস্‌ ইস্টিশনে যেইও।

—যাব।

বলে দালান থেকে তাকে সাইকেলটা বার করে দিলাম। বললাম, বিজনবাবুকে বলিস, শীগ্‌গিরই যাব একদিন।

বচন সবাইকে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। কেবল কুসুম না বলে পারল না, আবার এস ছোটবাবু।

—আসব গ' খুকীদিদি।

ভবেনের দিকে ফিরলাম। হাত ধরে বললাম, আয়, ঘরে আয়। চা খাবি?

—খাব।

আমি গলা তুলে বললাম, কুসুম, আর একটু চা দিবি আমাদের?

—দেব।

ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই বুঝতে পারছি, ভাল করে তাকাতে পারছিনে ভবেনের দিকে। ভবেনও পারছে না। আমার কোনো অপরাধবোধ নেই, তবু কী এক লজ্জা, কী এক সংকোচ আমাকে ঘিরে ধরছে।

জানি, ভবেনেরও অপরাধবোধ থাকা উচিত নয়। তবু ওর চোখে মুখে সর্বাঙ্গে যেন একটি অপরাধীর আড়ষ্টতা।

আমি ভয় পাচ্ছি, ভবেন কী বলবে। পারলে আমি দু'হাত দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ডের দ্রুত তালকে কঠিনভাবে চেপে ধরতাম।

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম, বল্‌ ভব, শালঘেরির খবর বল্‌।

না বললেও অন্তত আশা ছিল, ভবেন আমাকে আমার নিজের কথা বলতে বলবে। কিন্তু, দেখলাম সে খাটের বাজু ধরে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই সে মুখ ফিরিয়ে রেখেই বলল, টোপন, ঝিনুক তোকে যেতে বলেছে।

ঝিনুক! ঝিনুক! নাম হিসেবে খুবই অদ্ভুত। বিচিত্র! কেউ বুঝি কোনোদিন শোনেনি এমন নাম। কিন্তু ওই নামটি শুনতে চাইনি আমি। বারে বারে এড়িয়ে যেতে চেয়েছি! কারণ, মানুষ সকলের সঙ্গে ভাণ করতে পারে। নিজের সঙ্গে পারে না। মানুষ মা বাবা বন্ধু স্ত্রী, সকলের সঙ্গে ভাণ করতে পারে। এমনকি, তার আরাধ্য ভগবানের সঙ্গেও বুঝি পারে। পারে না কেবল নিজের সঙ্গে।

আমিও পারি না। পারিনি।

আমি মহাকালের বিষাণে কান পেতেছি। তার সেই গুরু গুরু সুরের মধ্যে চেয়েছি তার বাণী পাঠ করতে। জীবনের চলার পথের নিয়ম রাগিণী যখনই তার ছিঁড়ে বেসুর হয়েছে, তখনই বেজেছে বিষাণ। তখনই আমি অভয় চেয়েছি তার কাছে।

কিন্তু ঝিনুকের নাম শোনামাত্র আমার মনে হল, সেই বিষাণে যেন অট্টহাসি। আমার মুখখানি পুড়ে বুঝি ছাই হয়ে গেল।

তবু ভেঙেও না মচকে আমি হেসে বললাম, যাব, নিশ্চয়ই যাব। সেকথা কি আমাকে বলতে হবে নাকি।

বলে আমি মুখ ফেরাবার অছিলায় জানালা খুলতে যাচ্ছিলাম। সহসা ভবেন উঠে, তার শক্ত দু'হাতে, আমার দুটি হাত চেপে ধরল। বলল, রাস্কেল, তুই কিছু বলছিস না কেন আমাকে।

একটা প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে, আমি যেন কোথায় একটু শক্তি পেলাম। পরীক্ষায় পাশ করার জোর পেলাম যেন কেমন করে। আমি আমার পূর্ণদৃষ্টি মেলে তাকালাম ভবেনের দিকে।

ভবেনের চোখে তবু সেই অপরাধী অনুসন্ধিৎসা।

বললাম, ভব, কথা কি কিছু বলার আছে? এসব কি বলার?

ভবেন বলল, তোর নেই টোপন, আমার বলার আছে।

—না ভব, এতে কারুর কিছু বলার থাকতে পারে না। যা হয়েছে, সেটা শুভ হোক, এ ছাড়া আর সব কথাগুলোই আসল কাহিনীর মধ্যে বাড়তি হয়ে যাবে।

হেসে আবার বললাম, তুই একটা বাংলার সেকেণ্ড ক্লাস এম. এ। তুই কেন বুঝবিনে?

ভবেন বলল, ভুল হল টোপন। বাংলার সেকেণ্ড ক্লাস দিয়ে জীবনের পাঠ হয় না। মনে যত কালি জমেছে, তাকে ধোয়া যায় না। বাইরে গেলে একটা কলেজের চাকরি, আর না হয় শালঘেরির এই স্কুলে মাস্টারি, এই হয়

তুই চুপ করে থাকবি, হয়তো তুই এবার সত্যি আমাকে ভালবাসতে ভুলেছিস টোপন। কিন্তু আমি কিছু না বলে পারব না।

ভবেনের গলার স্বরে, আমার বুকের মধ্যে যেন টনটনিয়ে উঠল। বললাম, বল তাহলে।

ভবেন প্রথমেই বলল, আমার অপরাধ হয়তো ক্ষমার অযোগ্য। তবু আমাকে তুই ক্ষমা কর টোপন।

ক্ষমার কথা শুনে, আমার ভিতরে যেন কেউ বিদ্রূপ করে হেসে উঠল। বললাম, ক্ষমার প্রশ্ন আসছে কেন ভব?

—আসবে। আসবেই তো। যা করেছি, তা বলতে বাধছে। প্রশ্ন আসে, কারণ—কারণ—ঝিনুককে আমি বিয়ে করেছি।

একটা তীরবিদ্ধ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে গিয়েই, আমি যেন হেসে উঠলাম। বললাম, করবি নে কেন? ঝিনুক তো আইবুড়ো মেয়েই ছিল ভব।

ভবেন শুধু আমার হাতটা ঝেঁকে দিয়ে বলল, রাস্কেল।

কিন্তু আমার গলায় যেন আর শক্তি নেই। বুক থেকে সমস্ত কথাকে নিংড়ে শুষে নিতে চাইছে। শ্বাসরুদ্ধ করছে আমাকে। তবু এ প্রসঙ্গ থেকে আর নিবস্ত করবাব উপায় নেই ভবেনকে।

সে আবার বলল, কিন্তু টোপন, ঝিনুক, ঝিনুক কার ছিল?

ভবেনের কথাগুলি কথা নয় একটিও। ছুঁড়ে মাবা আগুন। আমি প্রায় ধমকে উঠলাম ভবেনকে, কী যা তা বলছিস, ছি! ঝিনুক তো স্বৈরিণী নয় যে, কখনো সে কারুর ছিল, এখন সে আর একজনের হয়েছে। ঝিনুক উপীনকাকার মেয়ে, এখন তোর বউ।

ভবেন যেন দমবন্ধ করে উঠল, দ্যাখ্, দ্যাখ্ টোপন, আমাকে এড়িয়ে যাবার, ছলনা করবার জন্যে কী সব বলছিস তুই। যে-কথা জানে সারা শালঘেরির লোক, সেকথা না জানার ভান করছিস তুই আমার কাছে? তোর কত কাহিনী যে আমার কাছেও জমা রয়ে আছে। কত রাত জেগে জেগে যে তুই নিজে আমার কাছে ঝিনুকের কথা বলেছিস, ভাণ করতে গিয়ে সেকথাও চাপতে চাইছিস তুই। কেমন করে চাপবি? এমন কথাও কি হয়নি টোপন তোর বিয়েতে, তোর বাবার পরেই দ্বিতীয় বরকর্তা হব আমি। তোর আর ঝিনুকের কান ম'লে দেব আমি।

আমার বুকের মধ্যে কোথায় চাপা পড়ে থাকা আগুনে যেন ক্রমেই ভবেন ফুঁ দিয়ে উসকে দিচ্ছিল। যাকে আমি জয় করতে চেয়েছিলাম, সেই মেঘ ভার হয়ে নেমে এল আমার মুখে। আমি বললাম, ভব, এসব কথা নিরর্থক। কেন আমি শুনব?

ভবেন বলল, শুনবি, কারণ তুই লুকোতে চাইছিস। টোপন, স্বয়ং উপীনকাকারও কি জানতে বাকী ছিল, তুই হবি ঝিনুকের বর? ঝিনুকেরও কি বাকী ছিল? ঝিনুক নিজেও কি তা কোনোদিন কারুর কাছে চাপতে

চেয়েছে? তোর জন্যে কি ও দুর্নাম পায়নি শালঘেরিতে? সেই দুর্নাম নিয়ে, তোতে আমাতে মন খারাপ করে কতদিন কত কত কথা বলেছি। কিন্তু শালঘেরিতে কুমারী মেয়ের প্রেম প্রথম নয়। ইতিপূর্বেও হয়েছে। লোকে কথা বলেছে। বিয়ের পর সবাই চুপ হয়ে গেছে আবার। এও তাই হ'ত। সেই ভেবে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। এও জানাজানি ছিল, উপীন-কাকা তোর বাবার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। প্রথমে মন কষাকষি হলেও, পরে দুজনেই রাজীও হয়েছিলেন মোটামুটি। না হলেই বা কি আসত যেত? ঝিনুককে কি কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারত তখন? টোপন!

ডাক শুনে ফিরে তাকালাম ভবেনের দিকে। কিন্তু আমি যেন ভবেনকে চিনতে পারলাম না। আমি ভুলে গিয়েছি, কাল রাত্রে আমি সাড়ে তিনবছর বাদে ফিরে এসেছি জেল থেকে। যেন দেখছিলাম, শালঘেরির পুবপাড়ায়, এক অস্পষ্ট জ্যোৎস্না রাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার সেই প্রিয় হিন্তাল গাছটির তলায়। আমার ছায়ার কোলে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এক মেয়ে। আমার জামা টেনে ধরে রেখেছে সে। দু'চোখ তার দুঃসাহসিনী অভিসারিকার নির্ভয় প্রেমে চকিত। সন্ধ্যাবেলার ধোয়া শরীর ও সদ্য বাঁধা চুলে তার, যেন কোনো ভোরের ফোটা ফুলের গন্ধ। আমরা কোন কথা বলিনি। আমরা শুধু দাঁড়িয়েছিলাম। সামনে আমাদের তামাইয়ের মাঠের কুহকী আলোর বিস্তার।

ভবেনের ডাকে আমি যেন অনেকদূর থেকে ফিরে এলাম। বললাম, অ্যাঁ?

ভবেন বলল, মনে নেই টোপন, ঝিনুক আর তোর সঙ্গে, তিনজনে আমরা তামাইয়ের ওপারে শালবনে চলে গেছি কতবার। আমি তোদের একলা থাকতে দিয়ে, ঘুরে এসেছি জঙ্গলে। এসে দেখেছি, শুকনো পাতায় বসে তোরা মুখোমুখি কথা বলছিস্। তোদের দুজনকেই কত ঠাট্টা করেছি আমি। দুজনেই তোরা লজ্জা পেতিস। তারপরে, ভাবনা দেখা দিত ঝিনুক বাড়ি ফিরে গিয়ে কী বলবে? এতক্ষণ তো নিশ্চয় খোঁজ পড়ে গেছে তারপর স্থির হত, আর দেরী নয়। তিনজন তিন দিক দিয়ে যাব। শুধু ঝিনুককে নজরে নজরে রাখতে হবে। একলা মেয়ে, তাই। তামাইয়ের হাঁটুজল হেঁটে পার হয়ে আসতাম আমরা।...

আমি হাত তুললাম। প্রায় পায়ে ধরার মত করে বললাম, থাক ভব কী হবে এসব কথা বলে।

ভবেন চোখ নামাল। গলার স্বর নামল আরও। বলল, বলতাম না কিন্তু তুই বললি। তুই যে বললি ঝিনুক স্বৈরিণী নয়। তা নয়, সেকথা কে আমি জানি। তাই বললাম। 'কার ঝিনুক' বলায় তুই যে প্রতিবাদ করলি তাই বললাম।

আমি বললাম, সেটা আমি এখনো প্রতিবাদ করব ভব। একথা তোর বলা উচিত নয়। ভব, এসব কথা কখনো আমাদের বলাবলি করা সাজে না

আর। কী ছিল, কী ঘটত, সেটা বড় নয়। যা ঘটেছে, সেটাই সত্যি। সেই সত্যের সঙ্গে আমাদের এসব কথা শুধু আঁধার সৃষ্টি করবে। সত্যিটা সংশয় হয়ে দাঁড়াবে। আমরা মানুষ, তার ঊর্ধ্বে নয়। কথা বলে মনে ভাঙাভাঙি হয় যদি?

ভবেন বলল, না হোক, তাই চাই টোপন। কিন্তু না বলেও যদি মন ভাঙে, তখন কি করব। আজকে যে তোর সামনে এসেছি, হলপ করে কি বলতে পারি, কোথাও কিছু ভাঙেনি? চিড় খায়নি একটুকুও? তবু যদি সামলে নেওয়া যায়, তাই অনেক চেষ্টা করে এসেছি তোর কাছে। ব'লে যদি পুরো ভাঙে, ভাঙুক। তবু তুই জেনে নে, কেন এমন ঘটল? কারণ, একথা তোকে আর কেউ বলবে না। বলতে পারবে না।

ভয় আমাকে আবার গ্রাস করতে উদ্যত হল। আবার কি বলবে ভবেন? ঝিনুক ওকে যেচে বিয়ে করতে চেয়েছিল, ও তাই বাধ্য হয়ে করেছিল? নাকি উপীনকাকা অনুরোধ করেছিলেন ওকে, তাই ও বিয়ে করেছে ঝিনুককে।

যা খুশী তাই সত্যি হতে পারে। জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে আমার। এসব ছায়া সেখানে যেন আর না পড়ে।

কিন্তু ভবেন থামল না। বলল, টোপন, উপীনকাকার কথা জানিনে, ঝিনুকের কথা বলতে পারি। বলতে পারি, ঝিনুক যে নিতান্ত মানবী, এটা জানতে পেরেছি। শুধু মানবী নয়, ঝিনুক যে একান্ত এই শালঘেরিরই এক মেয়ে, বাইরের জগত যার একেবারে অচেনা, বাহ্য সংসার নিয়ে যার অনেক সংশয়, ভয়, তাও আমার কাছে ধরা পড়েছে। কিন্তু—কিন্তু টোপন, বিশ্বাস কর, কাব্য করার সাধে বলছি না, সেই একান্ত মানবী যে চিররহস্যে ঢাকা, চির অচেনা, চির দুর্বোধ্য, সেটাও আবিষ্কার করেছি। আবিষ্কারের পর তখন তাকে একান্ত মানবী বলে আর চিনতে পারি না। নিতান্ত শালঘেরির মেয়ে বলে আর তাকে একটুও বোঝা যায় না। সেই আবিষ্কারের দিকে অবাক হয়ে, চুপ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই।

বলতে বলতে ভবেনের গলার স্বর আস্তে আস্তে ডুবে গেল। আর সে যেন সুদূরে শূন্যে পরম বিস্ময়েই তাকিয়ে রইল তার সেই আবিষ্কারের দিকে। আমি যেন ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না ওর কথার অন্তর্নিহিত বক্তব্য। কিন্তু ওর শূন্যে নিবদ্ধ চোখের বিস্ময়ে, একটা আহত পাখীর পাখা ঝাপটানো যন্ত্রণা যেন দেখতে পেলাম।

ভবেন হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, টোপন, মন নিয়ে মানুষ বেহুঁস হয়, জানিস?

জানি।

ভবেন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, দ্রুত উচ্চারণে বলে উঠল, মানুষ যখন অসহায় হয়, বিভ্রান্ত হয়, হতাশায় দুঃখে ঝিমিয়ে থাকে, তখন মানুষের হুঁস থাকে না। টোপন, ঝিনুক আর উপীনকাকার মনের এমনি অবস্থায় প্রস্তাব করলাম,

ঝিনুককে আমি বিয়ে করতে চাই।

আমি চকিতে একবার ভবেনের মুখের দিকে তাকালাম। ওর গলার শির গুলি স্ফীত। চোখ দুটি আরও রক্তাভ। গলার স্বর ওর ক্রমেই রুদ্ধ ও স্তিমিত হয়ে আসছে। বলল, টোপন, আমার অবস্থাও তখন ভাল নয়। অনিরুদ্ধ মারা গেছে। তুই জেলে চলে গেলি। কবে ফিরবি, কোনো ঠি নেই। যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ যেন জীবনের সব বিশ্বাস আর স্বপ্নের পর্দা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলে। দেখলাম, শালঘেরি গ্রামটা মরো মরো হয়ে খাবি খাচ্ছে। আমাকে কেমন একটা ভয়ে চেপে ধরল। আমি ভয় পেলাম, যে ভয় মানুষকে কাপুরুষ করে তোলে, অস্থির করে তোলে। মনে হল, জীবনটা নিতান্ত ছোট, সব কিছু শেষ হয়ে এল বলে। এমনি একটা হতাশা তখন সকলের মধ্যে। না, আর দেরী নয়, আর দেরী করলে সব হারাব। উমানি কাকার মনের অবস্থাও তাই ছিল। তাই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। আর ঝিনুক—ঝিনুক, তার মন কি আমি সত্যি জানি।

ভবেন যেন আবার স্তব্ধতার গভীরে ডুবে গেল। আর এই নির্মম স্বীকারোক্তির সামনে দাঁড়িয়ে কী বলা উচিত, বুঝতে পারলাম না। তবু বললাম ভব, পরে হবে এসব কথা।

ভবেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আর পরে নয় টোপন। মুখ যখন খুলেছে তাকে বন্ধ করব না। নইলে আর কোনোদিনই হয় তো বলা হবে না। এসব কথা রোজ রোজ বলা যাবে না। তুই ফিরে এসেছিস, টোপন, তুই ফিরে এসেছিস, আর ভয় নয়, মিথ্যে নয়, তোর সঙ্গে আমার মুখোমুখি, সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে হোক। তোর সঙ্গে তো আমি কখনও মিথ্যাচার করিনি। শোন শোন টোপন—।

ভবেন নিচু স্বরে প্রায় ফিসফিস করে বলল, টোপন, ঝিনুককে তুই ভাল বাসতিস, তাতে আমার অসাধ ছিল না। কিন্তু তোর ভালবাসা দেখে, কবে যেন আমারও একদিন ভালবাসতে সাধ হল ঝিনুককে। তোকে দেখে দেখে কবে যেন একদিন আমারও সাধ হল, ঝিনুকের দিকে আমি তোর মত করে তাকাই। তোর মত ওর হাত ধরি, ওর কাছে যাই। সাধ হল, ঝিনুক আমার দিকে অমনি করে তাকাক। অমনি করে হাসুক, হাত ধরুক, নির্ভয়ে অসংকোচে আমার পাশে আসুক। কবে কোন্‌দিন এসব কথা আমার মনে হয়েছিল হিসেব রাখিনি। বোধহয়, অনেকদিন ধরে, একটু একটু বিষক্রিয়ার মত শুরু হয়েছিল। যেদিন তার জ্বালা টের পেলাম, সেদিন আমি সরতে পারিনি টোপন।

আমি ভবেনের গায়ে হাত রাখলাম। ভবেন বলতে লাগল, ঝিনুককে পাওয়ার সাধে সরতে পারিনি। নিজেকে অনেক জিজ্ঞেস করেছি টোপন, কে এর জন্যে দায়ী? নিজেকে নিষ্টে পিষ্টে ধরেছি, মেরেছি, খুলেছি। কিন্তু ঝিনুককে আমি ভালবেসেছি। আর ঝিনুক? আমি জানিনে। শুধু

তখন ব্যক্তিত্বহীনা বিভ্রান্ত। উপনীকাকা হতাশ। বিয়ের ব্যবস্থা আমিই করলাম। তোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি বলে আমার মনে হয়নি। শুধু একটি অসহায় জবাব পেয়েছি নিজের কাছে, ঝিনুককে আমি ভালবেসেছি। অন্ধ ক্রূর স্বার্থপর হয়তো, নিজের কাছ থেকে ছাড়া পেলাম না আমি। টোপন, ত্যাগ করবি আমাকে?

আমি ভবেনের একটি হাত তুলে নিলাম। কী বলব! ফুলকে কত লোকে ভালবাসে। আমিও কেন বাসি? কোকিলের ডাক শুনতে সবাই চায়। আমিও চাই কেন? ভবেনকে আমি কী বলব। কিছু বলব না। কোনো অস্পষ্টতা তো নেই, কোনো জটিলতা তো নেই। জীবনরহস্যের রংমহলের দরজাটা কোনো সমারোহ না করেই খুলে দিয়েছে ভবেন আমার চোখের সামনে। সেই অপরূপ মহলের রূপহীন অরূপের দিকে তাকিয়ে, কোন্ দ্বন্দ্ব-যোদ্ধা কবে অসিমুক্ত করেছে?

ঝিনুক কেমন করে সকল পূর্বস্মৃতি ভুলেছিল, তা ভবেনের জানবার কথা নয়। যদি কেউ ভুলে যায়, তবে এক্ষেত্রে তাকে খাতকের মত গলা টিপে ধরতে পারিনে। এখানে সুদ আসলের প্রশ্ন নেই। মন নিয়ে যেখানে লেনদেন সেখানে হিসেবের তমসুক কে কবে লিখেছে। সে যে বড় গ্লানি। ব্যর্থতার অপমান!

ঝিনুকের মন, ঝিনুকেরই প্রাণের সিদ্ধান্তে চলবে, আমরা তা মেনে নেব। এইটুকু আমার সাহস। আমি তাই ফিরে এসেছি।

বললাম, তোর কথা তোকে ফিরিয়ে দিই ভব, তুই একটা রাস্কেল। ত্যাগ করব কেন? সেইজন্যে কি শালঘেরিতে ফিরে এসেছি?

—তবে কিছু বল টোপন। জেলে যখন সংবাদ পেয়েছিলি— ?

—ও কথা জিজ্ঞেস করে লাভ কি? তোর হলেও যা হত, আমারও তাই হয়েছিল। কিন্তু আমি ফিরে এসেছি ভব।

—তবু তুই কিছু বল টোপন। এই দিনটার জন্য আমি তিন বছরের ওপর অপেক্ষা করছি।

—তুই আর ঝিনুক সুখী হ'।

ভবেন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সহসা। আমাদের পুরনো বাড়ি কেঁপে উঠল তার উচ্চ হাসির ঝঙ্কারে। আর দরজায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কুসুম। দু হাতে তার দুটি পাথরের গেলাসে ধূমায়িত চা। চোখ কপালে তুলে সে চমকে উঠে বলল, বাবারে বাবা! ওকি হাসি!

ভবেন থামল। কুসুমকে দেখে সামলে নিয়ে বলল, অ্যাঁ? কী বলছিস কোসোম? চা আনছিস্ নাকি?

যেন হাসির দমকটা তখনো থামেনি ভবেনের।

কুসুম ভ্রূ কুঁচকে, ঠোঁট মুচকে হাসল। বলল, বেশ তো ভদ্দরলোকের মত কথা হচ্ছিল, আবার কুসুমকে দেখে গেঁয়ো কথা কেন? নাও, তাড়াতাড়ি

ওর হাত পড়ে গেল।

চা নিয়ে সেই হাসির উচ্ছাসেই ভবেন বলল, বাবারে, তু য্যা খুব বড়া হয়্যা গিছিস কোসোম।

কুসুম বলল, চিরকাল ছোট থাকব বুঝি? কিন্তু অমন দসার মত হাসছিলে কেন?

ভবেন বলল, ক্যানে? দেখছিস না, পুরনো দোসর ফির্যা আসছে।

কিন্তু কুসুমের কিশোরী চোখে বিস্ময়ের ছোঁয়া লেগে রইল ভবেনের দিকে তাকিয়ে। কারণ, এখন যে দেখবে ভবেনকে, সে-ই বুঝবে, তার চোখ মুখ হাসি, সবটাই অস্বাভাবিক। আমার মুখও স্বাভাবিক ছিল না। হাসতে পারছিলাম না, কথাও বলতে পারছিলাম না। কুসুম একবার আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল। বোধ হয় বুঝতে চাইল, কী হয়েছে।

দেখলাম ভবেনের হাসির রেশটা তখনো যায়নি। যেন মাতালের মত। হাসতে হাসতে খানিকটা আপন মনেই বলতে লাগল, সুখী হব। সুখী হব। কেন, আমি কি অসুখী নাকি?

চমকে উঠলাম ভবেনের কথায়। তাড়াতাড়ি বললাম, না না, সে কথা বলিনি রে। আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি—।

ভবেন যেন রুদ্ধ হাসির তরঙ্গে ফুলে ফুলে উঠে, বলে উঠল, আমরা যেন সুখী হই। বুঝলাম টোপন, ভেতরের দরজাটা তোর খুলল না। এত সহজে খোলে না জানি। অনেক দিন ধরে চাবি এক পাকে ঘুরে ঘুরে বন্ধ হয়েছে। উল্টো পাকে অনেকদিন না ঘুরলে খুবলে না। কিন্তু টোপন, ততদিন আমাকে যেন দূরে সরিয়ে রাখিস নে। তা'হলে আমার শালঘেরির বাস উঠে যাবে।

বলে সে, আমার দিকে তাকিয়ে চায়ের গেলাসে চুমুক দিল।

আমি বললাম, তুই দেখছি সত্যি রাস্কেল। আমার জন্যে তোর শালঘেরির বাস উঠবে, এ কি কখনও সম্ভব।

—দেখা যাক।

ভবেন হাসল। চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার বলল, অনেক দিন তোর জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম টোপন। ক্ষমা হয়তো কোনোদিন করবিনে। কিন্তু তাড়িয়ে দিতে পারবিনে। এবার একদিন বেড়াতে যাব টোপন।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় রে?

—তামাইয়ের ধারে, শালবনে। যাবি তো টোপন?

আমি বললাম, সেই জন্যেই তো এসেছি আরও। সারা তামাইয়ের ধারেই তো আমার কাজ।

ভবেন ফিরে তাকাল। ঠিক যেন মদ খেয়েছে ভবেন, এমনি রক্তাভ তার চোখ। মনে হয়, চোখের কোলগুলিও এর মধ্যেই বসে গেছে অনেকখানি। বলল, কাজ নয় টোপন, বেড়াতে যাব তামাইয়ের ওপারে শালবনে। তুই,

আমি, ঝিনুক।

ঝিনুক? কেমন করে এত সহজে বলছে ভবেন। কিন্তু ওর দিকে দেখে, ওর কথার সুরে, আমাকে আঘাত করার ইচ্ছে টের পাইনে। ভবেন যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। আর আমি অসাড় হয়ে পড়ছি। বললাম, বেশ বেশ যাওয়া যাবে।

ভবেন বললে, যাওয়া যাবে-টাবে নয়। মন রেখে বলিস, আর যাই-ই করিস, যেতে হবে।

কেন বলছে এ কথা ভবেন। ঝিনুক শিখিয়ে দিয়েছে নাকি বলতে? পুরনো দিনকে ফিরে পেয়ে, আমি একটু আনন্দ পাব, তাই? বন্ধু আর বন্ধুপত্নীর উদার সাহচর্যের অনুকম্পা? যেন ওরা একটা অপরাধ করে ফেলেছে। তামাইয়ের শালবনে বেড়াতে গিয়ে, তার প্রায়শ্চিত্ত করবে। এতটা নিষ্ঠুর কেন হবে ওরা। সে যে অনেক বড় অপমান করা হবে আমাকে: শালঘেরিতে ফিরে আসার সব আনন্দ, সব সাহস যে আমার নিভে যাবে আস্তে আস্তে।

ভবেন আবার বলল, যেতেই হবে কিন্তু একদিন তাড়াতাড়ি। অনেক দিন বলেছি ঝিনুককে, ও যায়নি।

আমি ফিরে তাকালাম ভবেনের দিকে। ভবেন চোখ নামিয়ে বলল, অনেক দিন ধরে যাবার ইচ্ছে।

কেমন যেন রহস্যময় অস্পষ্ট লাগল ভবেনকে! অনেক পরিবর্তন হয়েছে তার। চেহারার তো হয়েছেই। মানুষ হিসেবেও অনেক বদলেছে বলে আমার মনে হল। শুধু বয়স বাড়ার অতিরিক্ত ছাপটুকু নয়। কী একটা জিনিস যেন নেই আর ভবেনের মধ্যে। যার নাম জানিনে, অথচ অনুভব করছি, তা হারিয়ে গেছে ভবেনের কাছ থেকে।

তার কথা শুনে মনে হয়, একদিন তামাইয়ের ধারে শালবনে যাওয়াটাই জীবনের শেষ নিশানা হয়ে আছে।

বললাম, বেশ তো, যাব। চলু, এবার বেরোই।

—আমাদের বাড়ি যাবি তো? ঝিনুক বলে দিয়েছে, আজ ওখানেই খাবি।

আমি বললাম, ওরে বাবা। পিশী তাহলে আমাকে খেয়ে ফেলবে না? সেই ভোর থেকে একে তাকে দিয়ে নানান রকম বাজার দোকান হচ্ছে।

ভবেন বললে, সেটা আমিও আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু ওবেলা, অর্থাৎ রাতে তোকে আমাদের ওখানে খেতেই হবে। নইলে আমার যে ঘরে টেকা দায় হবে।

মনে মনে ভাবলাম, আর সেই ঘরের ঘরণী ঝিনুক। এমন খেলার ইচ্ছে কেন ঝিনুকের মনে যে, ভবেনেরও ঘরে টেকা দায় হবে?

বললাম, তাহলে পিশীকে একবার বলতে হয়।

ভবেন বলল, আমিই বলছি।

বলেই গলা তুলে ডাকল, পিশীমা! পিশীমা।

কুসুমের গলা ভেসে এল, জেঠি জপে বসেছে।

কিন্তু কুসুমের কথা শেষ হবার আগেই, পিশীর গলা শোনা গেল, যাই র‍্যা।

অর্থাৎ জপ শেষ হয়েছে পিশীর। বলতে বলতেই এলেন।—কী বলছ ভবেন?

—টোপন আজ রাতে আমাদের বাড়িতে খাবে পিশীমা।

পিশীমার মনঃপূত হল না। বললেন, এ্যাই তো আসছে হে বাড়িতে। দুটো দিন যাক না।

ভবেনের কথায় পিশী হেসে ফেললেন। আমারও মনটা খুশিতে ভরে উঠল। ভবেনের কথা শুনে।

পিশী বললেন, খুব ছেলে যা হোক্ তুমি। তা তোমার কথা আলাদা। এখানে আমি না বলতে পারি না।

যদিও পিশীর আমি এতখানি বাধ্য নই। কিন্তু এতদিন পরে এসে, তাঁর মনে আমি কোন গ্লানি সৃষ্টি করতে চাইনে। তাই তাঁর অনুমতি।

পিশী বেরিয়ে গেলেন। আমার সহসা মনে পড়ল। বললাম, ভব, তুই স্কুলে যাবিনে আজ?

ভবেন বলল, না। আজ আমার ছুটি।

—কিসের?

—তুই এসেছিস।

হেসে ফেললাম। বললাম, শুধু শুধু স্কুল কামাই করলি।

—তা বটে।

বলেই, আবার কী যেন মনে পড়ল ওর। বলল, শোন্ টোপন, স্কুলের ছেলেরা আর মাস্টারমশাইরা আসবেন তোর কাছে।

—কেন?

—তোকে কাল গ্রামের স্কুলের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে।

আমি একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম। বললাম, কেন ভব?

ভবেন হেসে বলল, কেন আবার? শালঘেরির দেশপ্রেমিক ছেলে তুই। তোর জন্য শালঘেরি গৌরব বোধ করছে। তাই—।

—না না না।

আমি প্রায় পা দাপিয়ে বলে উঠলাম। সন্দিহান চোখে তাকালাম ভবেনের দিকে। বললাম, তুই এসব পরামর্শ দিয়েছিস বুঝি? কিন্তু এসব আমি কিছুতেই পারব না। এখানে আবার ওসব কি?

ভবেন ভাণ করল কিনা জানি না। সে বলল, কী আশ্চর্য! আমি পরামর্শ দিতে যাব কেন? শালঘেরির লোক কি বোকা নাকি? না, তাদের মর্যাদাবোধ নেই যে, আমার পরামর্শে তারা কাজ করবে। গড়াইয়ে অনিরুদ্ধ

শহীদবেদী কি তোর আমার পরামর্শে করেছে গড়াইয়ের লোকেরা।

অনিরুদ্ধ শহীদবেদী করেছে, করতে পারে। কারুর সম্মান কিংবা শ্রদ্ধা দেখানকে কটাক্ষ করতে চাইনে। অনিরুদ্ধকে আমি অন্য মানুষ হিসেবে জানতাম। ববলাম, দ্যাখ্ ভবেন, অনিরুদ্ধ অনেক বড়, তার জন্যে লোকে শহীদবেদী করতে পারে। কিন্তু আমাকে নিয়ে কেন?

ভবেন বলল, এ বিষয়ে তুমি আমাকে মাফ কর। যাঁরা আসবেন তাঁদের সঙ্গে যত খুশি তর্ক করো, আমি কিছু বলব না।

— তুই তাদের বোঝাতে পারিস।

—তারা কেউ অবুঝ নন।

–কিন্তু বিশ্বাস কর ভবেন, শালঘেরিতে সম্বর্ধনার কথা ভাবলে এখনি লজ্জায় আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে।

—লজ্জায় হাত পা অবশ?

ভবেন হাসল। বলল, জেলে যখন গেছিস, এটুকু সামলাতে হবে।

বললাম, যেতে যাইনি। ধরে নিয়ে গেছল।

—সেইজন্যেই লোকের শ্রদ্ধা।

পথে বেরিয়ে সেসব কথা ভুলে গেলাম। পথে যার সঙ্গে দেখা হয়, তার সঙ্গেই কথা। এখানে ওখানে জটলা হয়ে যায়। পাড়ায় ঢুকলে বাড়িতে বাড়িতে ডাক। যার কোনোদিন কথা বলতে ইচ্ছে করেনি, সেও আজ ডেকে জিজ্ঞেস করছে।

পাখী ময়রা চীৎকার করে ছুটে এসেছে, উরে বাবা, টোপনঠাকুর, তুমি? তুমার ফাঁসি হয় নাই তবে? আর গোটা শালঘেরি জানে, তুমার ফাঁসি হয়্যা যেইছে। আস, আস, এট্টু মিষ্টিমুখ কর‍্যা যাও।

কেন যে পাখী ময়রার নাম পাখী রাখা হয়েছিল, বুঝিনে। কালো নধর ওই বিশাল বপুর নাম যদি পাখী হয়, তবে রোগা লোকগুলির নাম ফড়িং রাখা উচিত। যদিও ফড়িং নামের এমন ট্র্যাজেডীও দেখেছি।

বললাম, তোমার খাবার আজ সকালে বাড়িতেই খেয়েছি পাখী খুড়ো। আর একদিন দিও, খাব।

শালঘেরির স্কুলের মাস্টারমশাইরা ঘিরে ধরলেন? ছাত্ররা কৌতূহলী হয়ে সব তাকিয়ে রইল। সেই সময়েই প্রস্তাবনা গেয়ে রাখলে ক্লাস নাইন টেনের ছেলেরা।

আজ যেন শালঘেরির এ দিনটি শুধু আমার জন্যে। সকল ঘরের, সব মানুষের। কোথাও কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। প্রায় একই রকম আছে সব। শুধু পোস্ট অফিসের মাস্টারমশাইয়ের পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আমাকে চেনেন না।

শালঘেরির পথে বিপথে শাল মহীরুহ। আর পাড়ায় পাড়ায় প্রাচীন মন্দিরের ছড়াছড়ি। কোনো মন্দিরেই পোড়া ইঁটের কারুকার্যের অভাব

নেই। সে কারুকার্যে লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনীর বিস্তার। অক্ষরে নয়, চিত্রে। রামায়ণ মহাভারতের পুরাণ থেকে প্রাচীন ও মুসলমান যুগের নরনারীদের ভিড় টেরাকোটার অঙ্গসজ্জায়।

ক্রমেই ঘুরতে ঘুরতে এলাম তামাইয়ের ধারে। ভবেন আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে।

তামাইয়ের তীরে তীরে প্রকৃতির খেয়াল, যেখানে মাটি, সেখানেই আমন ধান কাটা রিক্ত মাঠের পাঁশুটে ছবি। পাথর খুব বেশি নেই। কিন্তু পাথর-কুচি ও বালিমাটি দেখলেই বোঝা যায়।

তামাইয়ের ধারে গাছপালা বেশি। তালগাছ যেন প্রায় লাইনবন্দী নদী সীমানার প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। খেজুরগাছের ভিড়ও কম নয়।

তামাইয়ে এখন হাঁটুজল। কয়েক হাত সরু নির্ঝর। স্বচ্ছ জলের তলায় লাল মাটি দেখা যায়। কোথাও কোথাও ছোটখাটো পাথরও দেখা যায় নদীর বুকে। বর্ষার টানে গড়িয়ে এসেছে। সেইসব পাথরে বাধা পেয়ে, তামাই গান গাইছে কল্‌কল্‌ সুরে।

শালঘেরির মানুষকে শতাব্দী ধরে তামাই অনেকবার ঘরছাড়া করেছে। শালঘেরি অনেকবার রুদ্রাণী তামাইয়ের থাবার তলায় ডুবেছে।

তিন মানুষ সমান উঁচু একটি কালো পাথরের চাঁই, তামাইয়ের ধারে আমাদের আজন্মকালের চেনা। ওর ঘাড়ে পিঠে চড়ে আমাদের শৈশব কেটেছে। ও কখনো হাতীর হাওদা হয়েছে। কখনো বিশ পঁচিশ সওয়ারি পক্ষিরাজ হয়ে উড়েছে আমাদের সবুজ আকাশে। কখনো সবুজ নদীর বুকে ভেসেছে সপ্তডিঙা হয়ে।

পাথরটিকে ঘিরে গুটিতিনেক তালগাছ। দেখলে মনে হয়, তিনটি ছাতা ধরে আছে কেউ পাথরটার মাথায়।

শৈশব কাটিয়ে যৌবনেও এসে আমরা এই পাথরে গা দিয়ে অনেকদিন বসেছি ঘাসের ওপর। আজও এসে দাঁড়ালাম পাথরটির গায়ে। শালঘেরির এই নিরালা কোণটিতে কতদিন এসে বসেছি মনে মনে, সেই প্রেসিডেন্সী জেল থেকে।

ভবেন আমার দিকে তাকাল। আমিও ভবেনের দিকে তাকালাম। তারপর দুজনেই বসলাম সেই পাথরের গা ঘেঁষে। কথা বলতে আমার ভয় হল। অনেকদিন পরের এই নির্জনতা পাছে ভেঙে যায়।

তবু না বলে পারলাম না, সব ঠিক তেমনি আছে।

ভবেন ওপারের দিকে তাকিয়েছিল। সে বলল, না।

আমি ফিরে তাকালাম ওর দিকে। ও আমার দিকে না তাকিয়ে হাসল।

একটু পরে ভবেন জিজ্ঞেস করল, এখন কী করবি ভাবছিস? বাইরে কোনো কলেজে চাকরি-বাকরি নিয়ে চলে যাবি নাকি?

বললাম, গেলে তো আগেই যেতাম। এখন আর একটুও ইচ্ছে নেই।

—কী করাব ?

—যে কাজে হাত দেব ভেবেছিলাম, এবার সেটায় হাত দিয়ে ফেলব।

আমি আমার ভবিষ্যতের কর্মসূচী বললাম ওকে। বললাম, জানিস ভব, জেলে গিয়ে দু একটা এদিককার কাজ হয়েছে। কিছু পড়াশোনা করেছি। দেশী বিদেশী কিছু পণ্ডিতদের বই পড়েছি পুরাতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্বের ওপর। এখুনি আমার আরও কিছু বইয়ের প্রয়োজন। জেলের পড়াটা ঠিক পড়া নয়। অন্তত আমার ক্ষেত্রে তাই দেখলাম। ওখানে আমার মনটাও বন্ধ হয়ে থাকত যেন। তবে, তামাইয়ের ধারে, মাটির তলায় কিছু আছে, এ বিশ্বাস আমার আরও বদ্ধমূল হয়েছে। কিছু মানে, একদিন যে সন্দেহ করেছিলাম, একটি প্রাগৈতিহাসিক সমাজ ও জীবনধারণের চিহ্ন লুকিয়ে আছে তামাইয়ের মাটির তলায়, তাতে আমার আর সন্দেহ নেই। একজন এ্যানথ্রপলজিস্ট রাজবন্দীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তাঁরই কথামত বই পড়েছি আমি। ওঁর কাছেও জেনেছি কিছু। বলেছি তাঁকে আমার অভিজ্ঞতার কথা। কেন আমার সন্দেহ হয়েছে, তামাইয়ের নদীর ধারে ধারে মাটির তলায় কিছু আছে। আমি যখন তাঁকে বললাম, মাটি, পাথর ও তামার কয়েকটি জিনিস আমি বিশেষ বিশেষ জায়গা থেকে পেয়েছি, তামাইয়ের ধারে, তখন তাঁর দু চোখে আমি একটা বিস্ময়ের ছায়া দেখেছিলাম। নাম তাঁর মিহির দস্তিদার। তিনি আগেই রিলিজ হয়েছেন জেল থেকে। বলেছেন, আমি পত্র লিখলে শালঘেরিতে আসবেন। সাহায্য করবেন আমাকে। শুধু তাই নয়, গভর্মেণ্ট আর্কিওলজিকাল সার্ভের সাহায্য যাতে আমি পাই, তার জন্যে তিনি সব রকম চেষ্টা করবেন। তার আগে তিনি আমাকে একটা প্রিলিমিনারি রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছেন, যাতে সাহায্যের ভিত্তি প্রস্তুত করা যায়।

ভবেন যেন আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। জিজ্ঞেস করলাম কিছু বলছিস্ ভব ?

ভবেন বলল, হ্যাঁ। বলছিলাম টোপন, সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে একাজে এইখানে এনে জড়ো করবি ?

—হ্যাঁ।

—তোর সারা জীবন যদি ব্যয় হয়ে যায় ?

—তার পরেও যদি না পাওয়া যায় কিছু ? ভুল হয়েছে বুঝতে হবে তাহলে।

—গোটা জীবন ধরে এমন অন্ধকারে হাতড়ে ফেরা ভুল টোপন ? এ যে ভাবতে পারিনে।

হাসতে গিয়ে ঠোঁট দুটি আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমি ওপারের শালবনের দিকে ফিরে তাকালাম। ভাবলাম, অন্ধকার যেখানে, সেখানে হাতড়ে ফেরা ছাড়া উপায় কি ? সারা জীবন ধরে তো মানুষ হাতড়েই ফিরেছে। কেউ কেউ পেয়েছে, কেউ পায়নি। পেয়ে না-পাওয়ার ভুল করেছে। কেউ না-পেয়ে

ভুল করেছে পাওয়ার।

ভবেন বলল, তবু আমি একটি কথা বলব টোপন।

—বল।

—তুই শালঘেরির স্কুলে একটা কাজ নে। জানি, তোর বাবা তোর জন্যে অনেক রেখে গেছেন। তবু, এমন করে সব শূন্য করিস না। দিনকালের কথা তো বলা যায় না। তোর কথা শুনে বুঝেছি, তুই তোর সর্বস্ব এই কাজে ঢেলে দিবি। কিন্তু হুট্‌ করে কিছু করে বসা ঠিক হবে না। মাস্টারি নিলেই যে তোকে একেবারে দশটা চারটে করতে হবে, তার কোনো মানে নেই। অনেক মাস্টারমশাইরাই তোর কাজ মিটিয়ে দিতে পারবেন, তুইও তোর কাজে বাধা পাবিনে। তামাইয়ের ধারে মাটি খোঁড়ার ফাঁকে ফাঁকেই না হয় স্কুল করবি।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভবেন আবার বলল, তা ছাড়া স্কুলের কাজ, বছরের অনেকগুলো দিনই তো ছুটির মধ্যে পড়ে।

আমি আরও খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললাম, কথাগুলো মন্দ বলিসনি ভব। কিন্তু কি জানিস, একেবারে মন নেই। শুধু মাস্টার সেজে ছেলে-গুলোকে ফাঁকি দেব। বিবেকে লাগছে।

ভবেন বলল, খুব বেশি ভাবলে পেছিয়ে যেতে পারিস। কিন্তু শালঘেরির স্কুল তো জেলখানা নয়। ইচ্ছে করলেই ছেড়ে দিতে পারবি। মোটের ওপর আমি চেষ্টা করব, বলে রাখলাম! এবারে ওঠ্‌। বেলা দেড়টা বেজেছে।

ভবেন আর একবার তার হাতের ঘড়ি দেখল। উঠতে ইচ্ছে করছে না। তবু না উঠলে নয়। ওদিকে পিশী শুধু নয়, কুসুম বেচারী যে-রকম গিন্নী মনোভাবাপন্ন মেয়ে, সেও হয়তো না খেয়ে বসে থাকবে। ভবেনের জন্যও বসে থাকবে একজন।

উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল, ওপারের শালবনে ঝিঁঝিঁর ডাক যেন আরও প্রবল হয়ে উঠল। যেন অনেকদিন পরে দেখাশোনা। আর একটু বসতে বলছে।

মনে মনে বিকেলে আবার আসার ইচ্ছে জানিয়ে চলে এলাম। ওপরে উঠে খানিকটা পশ্চিমে এসে পথ চারদিকে গেছে। মানুষের পায়ে হাঁটা, আর লিক রক্তরেখায় ছড়িয়ে গিয়েছে দিকে দিকে। গরুর গাড়ি এখন তামাই পারাপার করে, বোঝা গেল। ভবেনকে ফের আমার পথের দিকেই ফিরতে দেখে বাধা দিলাম। বললাম, যা তুই, এত বেলায় আর আসিস নে।

ভবেন বলল, চল্‌ না আর একটু যাই।

—না। এখন যা। শুধু শুধু আবার দেরী করবি।

ভবেন দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, তা হলে সন্ধ্যেবেলা আমি তোকে আনতে যাব।

আমি বললাম, কেন? আমি কি পথ চিনিনে নাকি?

ভবেন হেসে বলল, তবু আজকে না হয় আমিই পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতাম?

বললাম, ভবা রাস্কেলের বাড়ির পথ আমি কারুর কাছে চিনতে চাই না। নিজেই যেতে পারব।

ভবেন বলল, তাই তবে যাস। এবার তবে এগো।

তুই আগে যা।

—না, আগে তুই যা।

হেসে ফেললাম দুজনেই। তারপর আমিই আগে পা বাড়ালাম উত্তরে। ভবেন যাবে দক্ষিণে। একটু গিয়ে পিছন ফিরে দেখলাম। ভবেন দাঁড়িয়ে আছে। গলা তুলে বলল, তাড়াতাড়ি আসিস।

বলে হাত নাড়িয়ে পিছন ফিরল।

মনে পড়ল, কবে যেন একদিন ঝিনুককে বলেছিলাম, সকালে পুব পাড়া, বিকেলে পুব পাড়া। ঝিনুক, শালঘেরির লোকে খালি ওই করতে দেখছে টোপন চাটুজ্জেকে।

ঝিনুকের চোখ বেশি বলত। জিভ কম বলত। আমার ধারণা মেয়েদের অধিকাংশেরই তাই। ধারণার কারণ বোধ করি, নারী-চরিত্রের অভিজ্ঞতাটা আমার ঝিনুককে দিয়েই। যেটুকুন বলতো, সেটুকুরও নাম দিয়েছি আমি সন্ধ্যাভাষা। যে-কথার মানে কখনো একটি নয়, একাধিক। এও হতে পারে, তাও হতে পারে। যেদিক দিয়ে তুমি নেবে। বৌদ্ধ চর্যাপদের ভাষাকে তাই সন্ধ্যাভাষা বলা হয়েছে।

সেই সন্ধ্যাভাষার মুন্সীয়ানা যেটা, সেটা তার ধার ও অব্যর্থতা। মানে, বক্তব্যটি ঠিক জায়গায় গিয়ে কেটে বসে।

ঝিনুক কেমন, সেইটি ভাসছে আমার চোখের সামনে। স্বল্পবাক্ ঝিনুক, ধীর, প্রসন্ন, টানা টানা দুটি চোখে বুদ্ধির গভীরতা। কিন্তু সে সত্যি ধীর ছিল না। কাজে ক্ষিপ্র, কিন্তু ব্যস্ততা দেখিনি কোনোদিন। গলা ফাটিয়ে হাসতে শুনিনি কোনোদিন, হাসতে বুঝি কমই দেখেছি ঝিনুককে। তবু তাকে হাস্যময়ী মনে হয়েছে সকল সময়। আবেগ আছে, এমন কথা তার কোথাও লেখা নেই। কিন্তু ঝিনুকের আবেগে প্লাবন হওয়াও বুঝি বিচিত্র ছিল না। ঝিনুককে এক নজরে দেখে সবাই গম্ভীর বলে সামলে যাবে। তার চোখে তখন সে কৌতুকটাই খেলা করবে নানান রং-এ। ওর ঠোঁটের কোণে যে-বাঁকটুকু কঠিন, সেখানেই ওর হাসিটুকুও আবর্তিত।

মনে হবে ঝিনুককে দেখে, ভাবের চেয়ে ওর রাগ বেশি। ব্যাপারটা উল্টো। রাগের চেয়ে ভাব বেশি ওর। কিন্তু ঝিনুক দৃঢ়। জোর দিতে জানে বলে, ওর সবকিছুতে আদায় বেশি।

কিন্তু কেন এসব ভাবছি। শালঘেরির উপীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে ঝিনুকের চরিত্র এটা নাও হতে পারে। বোধহয় নয়। এ শুধু আমার চোখে সাড়ে তিনবছর আগেকার ঝিনুক।

ঝিনুককে কি কোনোদিন কাঁদতে দেখেছি? দেখেছি। ছেলেবেলার কথা

জানিনে। কেননা, তখন ওকে চোখে পড়েনি। জেলা শহরের কলেজে ইণ্টারমিডিয়েটে পড়বার সময়, গাঁয়ে এসে প্রথম চোখে পড়েছিল ঝিনুককে। শালঘেরির বালিকা বিদ্যালয়ে ও তখন ক্লাস এইটে পড়ে। উপীনকাকার মস্ত-বড় উঠোনে, সদর দরজা বন্ধ করে, পাড়ার মেয়েরা হা-ডু ডু খেলছিল। দর্শক ছিলেন উপীনকাকা, কাকীমা, ঝিনুকের ঠাকমা, এক ভাই আর রাখাল ছেলেটা।

আমি আসায় খেলা বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু ঝিনুকের অনিচ্ছায় নয়। সেটা ওর চোখ দেখে বুঝেছিলাম। বাবা মা পাছে রাগ করেন, তাই খেলা বন্ধ হয়েছিল। ঝিনুক বাধা পেয়ে, যেন রাগ করে, ঠোঁটে ঠোঁটে টিপে বসেছিল উঠোনের ধারে নিচু বারান্দায়। গাছকোমর বাধা, আর ঘাড়ে নয়, চুলের ঝুঁটি মাথায় চুড়ো করা ছিল।

আমি যতক্ষণ বসেছিলাম, ততক্ষণই ও একটা অশ্রদ্ধার ভাব নিয়ে, ঠ্যাং ছড়িয়ে বসেছিল। আর বারে বারে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। তখন ওর বন্ধুরাও চলে গিয়েছিল। ওর চাউনি যে আমাকে তাড়াতেই চাইছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজেকে অপরাধী ভেবে, আমিও বারে বারে তাকাচ্ছিলাম ঝিনুকের দিকে। অবাক হয়েছিলাম শুধু এই ভেবে, আমি যে একজন কলেজে প'ড়ো ছেলে গাঁয়ে ফিরেছি, তাতে তো আমার দিকে সশ্রদ্ধ মুগ্ধ চোখে তাকাবার কথা।

কিন্তু ঝিনুক তা তাকায়নি। সেইজন্যই আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনি। বুঝতে পারিনি তখন, ওটা ঝিনুকের মেয়েচরিত্রের স্বাভাবিক শর-যোজনা। শর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তখন, যখন সন্ধ্যেবাতি দেখাবার জন্যে বলেছিলেন কাকীমা। ভবিষ্যতে যারা সন্ধ্যাভাষাময়ী হয়, তারা একটু জিভ ভ্যাংচাতে ভালবাসে। ঝিনুক সরাসরি আমাকে নয়, উঠোনটাকে জিভ ভেংচে উঠে গিয়েছিল।

আঠারোয় সেই তীরটা খেয়ে, উপীনকাকার বাড়িতে সেদিন রাত আটটা অবধি ছিলাম। জীবনে সেইদিন প্রথম চা খেয়েছিলাম।

সেই প্রথম পুবের টান ধরল। কিন্তু ও আবার কেমন নাম? ঝিনুক নাম তো শুনিনি কখনো। ঝিনুককেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা, তোমার নাম ঝিনুক কেন?

ঝিনুক বলেছিল, মা'কে জিজ্ঞেস করো।

কাকীমা, ঝিনুকের নাম ঝিনুক কেন?

কাকীমা বলেছিলেন, সমুদ্রের ধারে অপর্যাপ্ত পড়ে থাকে বলে। তাই বাবা ওর নাম ঝিনুক।

উপীনকাকা বলেছিলেন, অবহেলায় পড়ে থাকে বলে। আমি বলি শোন্।

তোর কাকীমার ছেলেপিলে হ'ত আর মরে যেত। বেচারীর মন গেল ভেঙে। শরীরটাও যায় যায়। এমন সময়ে আবার তোর কাকীমা সন্তানসম্ভবা

হলেন। ডাক্তারের পরামর্শে অনেকদিন গিয়ে রইলাম পুরীতে, আমার এক সরকারি কর্মচারী শ্যালকের বাড়িতে। কিন্তু আমাকে ফিরে আসতে হল। ঝিনুকের মা রইলেন। তারপর ঝিনুক হবার সংবাদ পেয়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, সবাই ঝিনুককে মুক্তো, মুক্তা, মুক্তামণি, চুনিরাণী, এসব বলে আদর করছে। এ নামের কারণ কী? না সমুদ্রের ধারে হয়েছে, নাম তাই ওর মুক্তা। আমি সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করে বললাম, না না, মোটেই ও নাম রাখা চলবে না। ও মুক্তা মানেই আবার চুরি যাবার ভয়। হারিয়ে গেলে মন খারাপ। সমুদ্রে অঢেল ঝিনুক পাওয়া যায়, পড়ে থাকে, কেউ চেয়ে দেখে না, চুরি করে না। ওর নাম থাক ঝিনুক।

ঝিনুককে আমি দুদিন কাঁদতে দেখেছি। ওর একটি পোষা টিয়ে ছিল। সে মরে যেতে কেঁদেছিল। আর একদিন, আমার গ্রেফতার হবার কয়েকদিন আগে, আমাদের বাড়িতে। সেইদিন, সেইদিন—

মনে মনে উচ্চারণ করতেও আমার সমস্ত রক্তধারা থমকে আসছে যেন। কুসুমের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে বিদায় চেয়েছিলাম ঝিনুকের কাছে। কুসুমকে ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন পথে ঝিনুক এসে উপস্থিত হয়েছিল। সেদিনের মত বিচলিত হতে আমি কোনোদিন দেখিনি তাকে। সেদিন ঝিনুক বড় কেঁদেছিল।

আমি ভয় পেয়েছিলাম। সেইদিন ঝিনুক সব লজ্জা শালঘেরির অন্ধকারের বুকে ফেলে দিয়ে এসেছিল। সেইদিন ও প্লাবনের সংহারিণী তামাই নদী। আমি ওকে শান্ত করেছিলাম।

শুধু পুবপাড়া যাতায়াতে কথাটা যখন বলেছিলাম ওকে, যে, শালঘেরির লোকেরা শুধু টোপন চাটুজ্যেকে ওই করতে দেখছে, তখন বলেছিল, শালঘেরির লোক তো তোমার তুকে অন্ধ হয়নি।

তারপরে ওর ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু চেপে, গম্ভীর হয়ে বলেছিল, সত্যেন দত্তর কবিতা পড়েছ?

—কেন বল তো?

—পড়েছ কিনা বল না।

—পড়েছি বৈকি।

—মিথ্যে কথা। তা হলে মনে পড়ত।

—কী ঝিনুক।

—কথাটা তোমার। আমাকে বলতে হবে কেন?

মাঝে মাঝে ঝিনুককে তুই করে বলতাম। বলেছিলাম, একবার বল্, তা হলেই মনে থাকবে।

তখন ও কোনো কথা না বলে শুধু কবিতার ওই লাইন দুটি বলেছিল,

> ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে
> বসন্তে বিকালবেলায় পুবপাড়া যেয়ে।

কেন বলেছিল ঝিনুক সেই কবিতা? সে কেমন ভুল হওয়া? সে কি

সেদিনের সব ভোলা-মুগ্ধতা ? নাকি আজকের শালঘেরিতে ফিরে এসে এই পুরনো খতিয়ানটার পাতা ওল্টানো ?

জানি নে, জানি নে কোনটা সত্য। ঝিনুকের কথার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল ওই কবির কবিতায়। সে তার সন্ধ্যাভাষারই অব্যর্থ প্রয়োগ করেছিল সেইদিন। সেদিনও সত্য, এদিনও সত্য।

তাই হোক। আপত্তি নেই। আজ আমি নতুন করে ফিরে এসেছি শালঘেরিতে। ঝিনুকের কবিতা আবৃত্তি করে, আমি নতুন করে শুরু করব। ভুল হয়েছিল এক ফুলপানে চেয়ে।······

তখনো বাড়ি ঢুকিনি। পথেই থমকে দাঁড়ালাম। দরজায় কুসুম দাঁড়িয়ে। বললাম, কিরে কুসুম, দাঁড়িয়ে কেন ?

কুসুমের ডান হাতখানি চকিতে গেল আঁচলের আড়ালে। কিন্তু চোখে রীতিমত শাসনের তিরস্কার। যদিও ঠোঁটের পাশে আচারের দাগ লেগে গেছে এবং টক মিষ্টি ঝালের স্বাদে মুখের ভিতরে জিভটি কিছুতেই শাসন মানছে না। রসের ধারা সামলাতে গিয়ে জিভ গালের এপাশে ওপাশে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তবু সে যে রাগ করেছে, সেটা ওর চোখের চাউনিতেই বোঝা যাচ্ছে।

আর যদিও কথা বলতে গিয়ে জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে, তবু তাকে বলতে হল, দাঁড়িয়ে কেন ? এই করতে বুঝি শালঘেরিতে আসা হয়েছে ?

সত্যি, এ তিরস্কারের অধিকার কুসুমের আছে।

বললাম, সত্যি, বড় বেলা হয়ে গেছে। তুই খেয়েছিস তো ?

খাবে যদি, তবে কুসুমের রাগ করবার অধিকার থাকে কোথায়। তা ছাড়া ও তো প্রায় গৃহকর্ত্রী। বোম্বা পাহাড়টা দেখালেই হয় আমাকে।

বলল, সারাবেলা কাটিয়ে এসে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'খেয়েছিস ?'' যেন সেইজন্য তোমার ঘুম হচ্ছিল না।

বলতে বলতে দুবার ঝোল টানতে হল কুসুমকে। কিন্তু আমার মনটা চকিত ব্যথায় বিষন্ন হয়ে উঠল। কুসুম খায়নি। পরের বাড়িতে বলেই, এইটুকু মেয়ে খেতে পারেনি। বললাম, সে কি রে, আমার জন্যে বসে আছিস ? ছি ছি, আর কোনোদিন থাকিস না।

—হ্যাঁ, তা হলে তোমার বড় সুবিধে হয় রোজ রোজ বেলা করে ফেরার, না ? জেঠি, ও জেঠি, এই দেখ, এতক্ষণে টোপনদা ফিরেছে। সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তায় পাঁচিলের ছায়া পড়ে গেল, তবু দেখা নেই।

পিশী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। —এইছিস ? বাবারে বাবা, কোথা গেছিলি র‍্যা ? বেলা যে গেল ?

উঠোনে ঢুকে বললাম, গাঁয়ের মধ্যেই পিশী।

কুসুম বলে উঠল, ঝিনুকদি'দের বাড়ি বুঝি ?

আমি চকিতে একবার কুসুমের দিকে ফিরে তাকালাম। ঝিনুকদি'দের

বাড়ি বলাতে কুসুম ভবেনদের বাড়ির কথাই বলেছে। কেমন করে তাকিয়েছিলাম কুসুমের দিকে জানি নে। ও যেন একটু থতিয়ে গেল।

আমি বলিলাম, না, ওদিকে যাইনি।

পিশী বললেন, যা যা, জামাকাপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি একটু তেল মেখে দু'ঘটি জল ঢেলে আয় মাথায়। শীতের এত বেলায় জল ঢাললে শরীরটা ভার লাগবে আবার।

আমি জামাকাপড় ছেড়ে, তেল মাখতে মাখতে বললাম, কিন্তু পিশী, কুসুমটা কেন খায়নি এত বেলা অবধি। ওকে তুমি এবার থেকে খাইয়ে দিও।

পিশী তখন ঘরে। জবাবে কুসুমই দিল, আহা, আমি যেন এর থেকে আগে খাই।

আমি বললাম, এত বেলায় খাস নাকি রোজ?

খুবই অবহেলা ভরে বলল কুসুম, আমি আর জেঠি রোজ এ সময়েই খাই।

আশ্চর্য! এ শুধু বাংলাদেশে কুসুমেরাই পারে। অবশ্য কুসুমের জিভ তখনো নড়ছিল। ঠোঁটও মোছা হয়নি। এবং আমার সামনে হাতটি এখনো মুক্তি পায়নি আঁচলের আড়াল থেকে।

আমি ওর হাতের দিকে বারে বারে তাকাচ্ছি দেখে, এতক্ষণে কুসুমের সন্দেহ হল, আমি একটা কিছু আঁচ করেছি। গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল, কী দেখছ বল তো?

আমি বললাম, কিছু না তো।

বলে আবার তাকাতেই, কুসুম উদ্গত হাসিটাকে আঁচলে চাপল। তার ভীরু দৃষ্ট চাউনি পিশীর ঘরের দিকে পড়ল একবার। তারপরে, চট্ করে একবার আঁচলের বাইরে হাতটি প্রসারিত করে দেখিয়েই আবার লোপাট। চুপি চুপি বলল, আচার।

খুব অবাক এবং গম্ভীর হয়ে বললাম, তাই নাকি?

—হুঁ। ভারী খিদে পেয়েছে যে?

এ করুণ ব্যাপারেও হাসি পেল আমার। বেচারী। আচার খাবার অধিকার ওর আছে। কিন্তু পিশী টের পেলে বকতে পারে, তাই এই গোপনতা। খেয়ে দেয়ে, এ সময়ে আচার নিয়ে কোথায় একটু এ-বাড়ি ও-বাড়ি, বাগানে বাঁশঝাড়ে ঘোরা হবে। তা না ভাত বেড়ে বসে থাকা।

তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে, ঠাঁই করে রাখা জায়গায় বসে পড়লাম। কিন্তু সামনে ভাতের থালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পিশী। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এর পরে পিশীকে যে আবার স্নান করে তবে খেতে বসতে হবে।

বললাম, পিশী, তুমি কেন এত বেলায়। আবার নাইতে হবে তো।

পিশী ভাত দিয়ে বললেন, ওই একদিন বাবা। আজ আমিই রেঁধেছি। কুসিও রেঁধেছে। ও আজ আমার নিরামিষ ঘরে রেঁধেছে।

কুসুম মাছের পাত্রটা যখন এনে দিলে আমার সামনে, আমার চোখ কপালে

উঠল প্রায়। বললাম, কী ব্যাপার পিশী, শ্যাম সরোবরের একটা গোটা রুইমাছ আমাকে রেঁধে দিয়েছ নাকি।

পিসী বললেন, দূর গাধা। ও একটা ছোট মাছের মুড়ো। তুই খাবি বলে বৈকুণ্ঠ দিয়ে গেছে। ফেলবি না কিছুটি, বসে বসে খা।

কুসুম বলল, আমিও পাহারা রইলাম। টুকে টুকে খাবে।

আসলে ওরই এখনো আচার টুকে টুকে খাওয়া হয়নি। কিন্তু এত বড় মাছের মুড়োটা আমার পক্ষে একলা খাওয়া কোনরকমেই সম্ভব নয়। কুসুমের দিকে একবার চকিতে দেখে নিলাম।

কুসুমও প্রায় শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আমার হাসি পেল। তবু খুব গম্ভীর মুখে মুড়োটার কিছু অংশ ভেঙে নিয়ে বাবিটা আলাদা করে রাখলাম। কুসুম আমার থেকেও বেশি মুখ গম্ভীর করে বলল, ওটা কি হচ্ছে টোপনদা। জেঠি।

পিশী ভাত দিয়ে পাশেই বসেছিলেন। বললেন, উ কি করছিস র‍্যা টুপান।

হয়তো কিছুই বলতাম না। কিছু না বললে পাছে পিশী আবার ওটা রাত্রে আমার জন্যই রেখে দেন। তাই খাওয়ায় মগ্ন থেকেই গম্ভীরভাবে বললাম, কুসুম ওটা খাবে পিশী। নইলে তুমি একে বিদেয় করে দিও আজ। কারণ আমার কথার অবাধ্য হলে, আমি ভীষণ রেগে যাই।

বুঝলাম, কুসুম ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আয়ত চোখ দুটিতে বেশ একটি ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণতা। বলল, বটে?

—বটে।

তেমনি গম্ভীরভাবেই বললাম, আমাকে একলা বুড়ো করার মতলব আমি বুঝেছি।

কুসুম অবাক হয়ে, চোখ বড় বড় করে বলল, সে আবার কী?

আমি বললাম, মুড়ো খেলে বুড়ো হয়, আমি জানি না বুঝি?

শুনলে জেঠি।

বলে কুসুম খিলখিল করে হেসে উঠল। পিশীও হাসি চাপতে পারলেন না। চাপতে গিয়ে তাঁর শ্লেষ্মা জড়ানো গলার অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে পড়ল। বললেন, আচ্ছা বাপু, রাখ, কুসি খাবেখুনি।

কুসুম কপট রাগে চোখ পাকিয়ে আমাকে বলল, তুমি একটা হিংসুটে।

বোধহয় ওকেও বুড়ো হবার ভাগ দিয়েছি তাই। তবু কুসুম লজ্জিত হয়ে উঠল।

আমার খাওয়ার শেষে পিশী চান করে এলেন। তারপরে দালানের দুই প্রান্তে দু'জনের পাত পড়ল।

পিশী বললেন, উঠোনে শুতে পারতিস রোদে। তা রোদ ঝাঁকি দিয়েই তুই ফিরেছিস। ঘরে গিয়ে শো। ঘুমুবি?

বললাম, না।

কিন্তু ঘুম এল আমার। জাগলাম যখন, তখন পৌষের সন্ধ্যা নেমেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। আশ্চর্য! এত ঘুম পেয়েছিল! এমন কী সন্ধ্যেবাতি দেখান হয়েছে। গোটা বাড়িটা নিঝুম। ঠিক কালকেরই মত দেখলাম, বাবার হ্যারিকেনটা জ্বলছে। কালকের মত অত টিমটিমে নয়, একটু উজ্জ্বল তার চেয়ে।

হঠাৎ দরজাটা নড়ে উঠল। তারপর খুব ধীরে ধীরে যেন কেউ বাইরে থেকে খুলতে লাগল দরজাটা। খানিকটা ফাঁক হতেই মুখ বাড়াল কুসুম। আমাকে বসে থাকতে দেখে, পুরোপুরি খুলে দিল। বলল, উঠেছ? বাবা, কী ঘুম। বললে ঘুমোবে না, আর আমাদের খাওয়া হতে না হতে এত ঘুম।

আমি যেন অবাক হয়ে বললাম, তাই তো রে। এ যে সন্ধ্যে হয়ে গেছে দেখছি। পিশী কোথায়?

—জপে বসেছে। তুমি চা খাবে টোপনদা।

আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললাম, খাব বৈকি। তাড়াতাড়ি দে।

হাত মুখ ধুয়ে এসে চা খেলাম। জামাকাপড় প'রে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, কেন জানিনে, চোখ দুটি নেমে এল। মনে পড়ল, ভবেনের ওখানে যেতে হবে।

আমি যেন নিজের চোখের দিকে তাকাতে সাহস পেলাম না। এখন বুঝতে পারছি, যত সহজে যাব ভেবেছিলাম, যাওয়াটা তত সহজ নয়। অথচ ভবেনকে যখন কথা দিয়েছিলাম, তখন ভেবে-চিন্তেই দিয়েছিলাম। কিন্তু কী করে যাব! ভয়ে কিংবা রাগে কিংবা ব্যথায়, জানিনে, সহসা আমার ভিতরে যেন কেউ অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠল, যাব না। যেতে পারব না। কেন যাব, কী করে যাব! যাব না।

যেন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই, মুখ তুললাম। নিজের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল আমার। দৃষ্টি সরাতে পারলাম না। আয়নার ওপারের চোখ দুটি যেন আমাকে মোকাবিলা করার ডাক দিল।

আমরা পরস্পরের দিকে চার চোখ মেলে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আর আমার ভিতর থেকে যেন কেউ অস্ফুট চুপি চুপি উচ্চারণে বলে উঠল, যেতে হবে। যে-সাহসের নাম জপ করতে করতে এই শালঘেরিতে এসেছি, সেই সাহসে ভর করে আজ না যেতে পারলে, হয়তো একটা আড়ষ্ট অপমানকর গ্লানিতে চিরকাল ভুগতে হবে। জীব-প্রকৃতির যে-স্বভাব বিদ্বেষ ও ঈর্ষার অন্ধকারে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে, সে অন্ধকারের কালিমা আমার কোনোদিন ঘুচবে না। সে অন্ধকারের কালিমা যেন প্রতিমুহূর্তে আমার বুকের দরজায় এসে কড়া নাড়ছে। আমার আত্মাকে গ্রাস করবে বলে। আমার অবশিষ্ট জীবনের সকল উদ্যম, আমার চোখের আলো নিভিয়ে দেবে বলে। সহজ করে পাব বলে, যে-হাসি হেসেছি, তা মুছে দেবে বলে। আজ তাই আমাকে যেতে হবে। আজই, এই নিমন্ত্রণেই, আমার প্রাণের পাথর সরাবার

লগ্ন। এই দরজাটা পার হতে পারলে আমার সকল দরজা খোলা। আমি যাব।

সিদ্ধান্তের পরমুহূর্তেই, আয়না থেকে চোখ ফেরাতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, আমার চোখে একটি অপার কৌতূহলের ঝিলিক। যে-কৌতূহল মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায়।

এমন সময় কুসুম পিছন থেকে এসে বলল, ওটা কি হচ্ছে টোপনদা ?

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। আমি চমকে কুসুমের দিকে তাকালাম। কেন, ও কি অন্তর্যামী নাকি। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে ?

—রাত করে আয়নায় মুখ দেখছ যে ?

বলে তাড়াতাড়ি একটি ঢাকনা এনে আয়নার বুকে ফেলে দিয়ে বলল, মিথ্যে কলঙ্ক হবে যে ওতে।

তা বটে। রাতে মুখ দেখতে নেই আয়নাতে। তা হলে মিথ্যে কলঙ্ক হয়। পৃথিবীতে অনেক লোকে দেখে। বাংলাদেশেও দেখে অনেক লোকে। কিন্তু কুসুমদের সামনে দাঁড়িয়ে এতবড় অনাচার চলবে না। কারণ, সংস্কার বল, যাই বল, এটা ওদের বিশ্বাস।

জিজ্ঞেস করলাম, সে কেমন কলঙ্ক রে কুসুম।

কুসুম বলল, তা কি জানি। সবাই বলে মিথ্যে কলঙ্ক হয়।

তারপর যেন সহসা মনে পড়েছে, এমনিভাবে বলল, ওই যে রেণুদি আছে না, রেণুদি।

—কোন রেণুদি ?

—এই তো এ পাড়ায় বনমালীকাকার মেয়ে, রেণুদি।

এইবার চিনতে পারলাম। বললাম, হ্যাঁ, বুঝেছি। কি হয়েছে তার ?

কুসুম কাছে এসে গলা নামিয়ে বলল, রেণুদিকে রেণুদির বর নেয় না।

এ দুঃসংবাদ জানা ছিল না আমার। জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

—বলে, মেয়ে খারাপ।

—খারাপ।

—হ্যাঁ। রেণুদি নাকি ভাল নয়। চরিত্র খারাপ।

কথাটা কুসুমের মুখ থেকে শুনতে আমার ভাল লাগল না। মুখ গম্ভীর করে, চুপ করে রইলাম।

কিন্তু কুসুম আমার গাম্ভীর্যের কথা বুঝতে পারল না। বলল, ও তো মিছে কথা। রেণুদি কত ভাল মেয়ে, পাড়ার সবাই জানে। সবাই বলে, রেণুদির মত মেয়ে হয় না। তবু রেণুদিকে নেয় না তার বর। এটা মিথ্যে কলঙ্ক নয় ?

এই যুক্তির পর অবশ্য আমার নীরব থাকা চলে না। খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম, হুঁ।

কুসুম বলল, জান টোপনদা, রেণুদি বোধহয় কোনোদিন রাত ক'রে আরশিতে মুখ দেখে ফেলেছিল।

আমি বললাম, তা হবে।

তারপরেই কুসুমের যেটা বক্তব্য, সেটা হল, রেণুদি খুব ভাল চুল বাঁধতে পারে। অনেক রকম খোঁপা, জান?

—তুই বুঝি তাই যাস রেণুদির কাছে।

—সবাই যায়। আমিও কয়েকবার গেছি। পাটনায় তো রেণুদি মেমেদের স্কুলে পড়েছে। তাই মেমেদের মত চুল বাঁধতে শিখেছে।

যাক্, খানিকটা আঁচ করা গেল। বনমালীকাকার মেয়ে রেণুদি তাহলে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে একটি সংস্কারগত কলঙ্কে আগেই চিহ্নিত হ'য়ে আছেন। আমি বললাম, আর তুই তাই মেমসাহেব সাজতে যাস।

—দূর।

—কিন্তু কুসুম, এইসব নিয়েই থাকিস বুঝি সারাদিন।

কুসুম একটু বিব্রত হল। ভয়ও পেল বোধহয় একটু আমার গম্ভীর গলা শুনে। বলল, কোথায়? আমি তো আজকাল পাড়ায় বেরুই না। জেঠি তা হলে আমাকে খুন করবে বলেছে।

সে শাস্তিটা একটু গুরুতর হয়ে যাবে অবশ্য। আমি ততটা চাইনে। বললাম, ক্লাস সিকস্ অবধি পড়েছিস। ক্লাস সেভেনের বই নিয়ে ঘরে বসে পড়লে পারিস তো।

—জেঠি রাগ করবে না?

—রাগ করবে কেন। পড়লে আবার কেউ রাগ করে নাকি? কাজ করবি, পড়বিও।

বুঝলাম, খুব সহজেই বললাম। কাজ করা আমার নিজের পক্ষেও হয়তো অসাধ্য হত। আর এও বুঝছি, কুসুমের একের ওপরে আর এক অভিভাবক হয়ে কথা বলছি আমি। দু'য়ের চাপে মাঝখান থেকে বেচারীর ভয়ে ও সংকোচে কোন কাজই হবে না।

তাই আবার সহজ গলায় বললাম, যখন একটু আধটু সময় পাবি, তখন দেখবি বই।

কিন্তু কুসুম একটু গুটিয়ে গেছে। তার চোখ দেখে বুঝলাম, আমার রুষ্টতার কারণ অনুসন্ধানে বেচারী আত্মগ্লানি বোধ করছে। খুব অসহায়-ভাবে বলল, আচ্ছা।

একটু থেমে আবার বলল, তোমাকে ডাকতে এসেছিল স্কুলের কয়েকজন ছাত্র আর দুজন মাস্টারমশাই। ঘুমোচ্ছ দেখে চলে গেছে। কাল সকালে আসবে।

সেই সম্বর্ধনা। গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরেছি। তা নিয়ে আবার আনুষ্ঠানিক সমারোহ।

কুসুম প্রায় নিষ্প্রভ গলায় আবার বলল, আরও মেলা লোকজন এসেছিল তোমাকে দেখতে।

—তাই নাকি? কারা?

—গাঁয়েরই সবাই।

জানি, এটা আমারই কর্তব্য, গায়ের সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত করা। আগামী কাল থেকে তার শুরু হবে। কিন্তু কুসুমের নিভে যাওয়াটা টের পেয়ে আমিও সংকুচিত হয়ে উঠলাম। কিছু না বলে, বাইরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বারান্দার অন্ধকার থেকে পিশীর গলা খাঁকারি শুনতে পেলাম।

এ গলা খাঁকারি আমার চেনা। পিশী জপে নিরত। কিন্তু এদিকে নজর আছে। মুখে বলতে পারছেন না, 'দাঁড়া'। তাই খাঁকারি দিয়ে জানানো হ'ল, আমার জপ হয়ে এসেছে, দাঁড়া একটু।

বললাম, আমি আছি পিশী। তোমার হোক, তারপরে বেরুব।

একটু পরেই পিশী উঠলেন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, ভবেনদের বাড়ি যাচ্ছিস তো?

—হ্যাঁ।

পিশী ঘরে গেলেন। বেরিয়ে এসে টর্চ লাইটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা নিয়ে যা। বড় আঁধার বাইরে। বেশি রাত করিস না। চাদর নিয়েছিস?

—হ্যাঁ।

—আয় গা। এ্যাই তুইও যাবি, সি ডাকাটাও আসবে।

—কে পিশী?

—হরলাল।

জিজ্ঞেস করলাম, আমি থাকব পিশী?

—না না, তোকে থাকতে লাগবে না। ওকে আমিই একলা সামলাতে পারব।

—দরজাটা বন্ধ করে দাও না।

—বন্ধ করলেই বা কী হবে। বাইরে থেকে এসে ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ করবে। সে আরও কেলেংকারি। ও তোকে ভাবতে হবে না। তুই আয় গা।

সে আমি বিলক্ষণ জানি, ডাকাটাকে নিয়ে পিশীর কত দুশ্চিন্তা। কালকেই বুঝে নিয়েছি সেটা। সামলানো দূরের কথা, যতক্ষণ ডাকাটা না আসবে, ততক্ষণ পিশীর কান পড়ে থাকবে বাইরের দরজায়। কারণ পিশী জানেন, ওই উড়নচণ্ডী মাতালটাকে তিনিই যা দুটি হাতে করে খেতে দেন। অন্যথায় ওকে উপোস থাকতে হবে।

টর্চ লাইটটা জ্বালিয়ে একবার দেখে নিলাম। ঠিক আছে। বাবার এটা। অনেক দিনের ব্যবহৃত। কিন্তু ব্যাটারিগুলি প্রয়োজনের জন্যে পিশীমা বদলিয়ে রাখেন, সেটা বোঝা গেল। নতুন ব্যাটারি নিশ্চয়। আলোর বেশ চড়া ঝলক।

পাড়ার মোড়ে, দেবদারু তলায় এসে একটু দাঁড়ালাম। শীতের শালঘেরির

ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ। এই সন্ধ্যারাত্রেই নিশুতি বলে মনে হয়। পথঘাটও জনহীন প্রায়। যদিও এখনো সব অন্দরই কর্মচাঞ্চল্যে মুখর। পশ্চিমের বাজার অঞ্চলে লোকজন কিছু আছে নিশ্চয়। হয়তো শেষ মোটর বাসটা আসেনি এখনো। পশ্চিমের বাজার অংশ ধরে, দক্ষিণের স্কুলবাড়ি, বোর্ডিং আর শালঘেরি সাধারণ পাঠাগারের ওদিকটায় মোটামুটি একটু বেশি রাত পর্যন্ত লোকজন জেগে থাকে।

আমি দক্ষিণ দিকে ফিরলাম। মনে নতুন কোনো বাধা উদয় হবার আগেই, পাড়ার মধ্যে এসে পড়লাম। এ পাড়ায় শুধু ভবেনদের বাড়িই দোতলা। ওর ঠাকুর্দা আর বাবা দুজনেই ছিলেন জেলা কোর্টের নামকরা উকীল। সেজন্য ওদের বাড়ির নামই হয়ে গেছে উকীলবাড়ি।

ভবেনের ঠাকুর্দা রোজ যেতেন ঘোড়ায় চেপে আদালতে। আর ওর বাবা যেতেন ঘোড়ার গাড়িতে। শালঘেরিতে আর কারুর গাড়ি ছিল না। যদিও এখন সেসব কিছুই নেই। ঘোড়া এবং গাড়ি বিদেয় হয়েছে। আস্তাবলটা অনেক দিনই জুড়ে দেওয়া হয়েছে গোয়ালের সঙ্গে। উকীলদ্বয় মারা গেছেন। আছে শুধু বুড়ো ইন্দির সহিস। ঘোড়া এবং গাড়ি বেচা হয়ে গেলেও চাবুকটা নাকি ইন্দির ছাড়েনি। শুধু ওই জিনিষটিই ওর নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে রয়ে গেছে। বোধহয় দীর্ঘদিন ঘোড়ার সঙ্গে বিবাদ করে, ওর চরিত্রটাই ঝগড়াটে হয়ে গিয়েছে। প্রায়ই এর তার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ ওর লেগেই আছে। অনেকে মজা পাবার জন্যেও ইন্দিরকে খোঁচায়। আর ইন্দিরের শেষ সাবধানবাণী হ'ল, বেশি চালাকি করো না হে। মনে রেখ কি, চাবুকটো আমার হাত থেকে অখুনও খসে নাই।

পাড়ায় ঢুকলে বোঝা যায় ঘরে ঘরে কাজকর্মের চাঞ্চল্য। কথাবার্তায় মুখর। ভবেনদের বাড়ির বড় দেউড়ির মুখে মস্তবড় কদম গাছ। বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে। দক্ষিণ দিকে, পূবমুখী দুর্গামণ্ডপ। যদিও এখন আর দুর্গোৎসব হয় না। একটু উত্তর ঘেঁষে বসতবাড়ি। সেটাও পূবমুখী।

বৈঠকখানায় ঢুকে দেখলাম কেউ নেই। ওর বাবার আমলের টেবিল চেয়ার দেয়ালবাতি, আর আইনগত রেফারেন্স ও প্রাদেশিক আদালতগুলির ইতিহাসে আলমারি ঠাসা। ভিতরের উঠোনে আলোর আভাস। ছেলেবেলায় অনেকদিন এই ঘরটার পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে লুকিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছি। যা রাশভারি লোক ছিলেন ভবেনের বাবা। দেখলেই ভয় লাগতো। চোখে পড়লেই যে ধমকে উঠতেন, তা নয়। বড় জোর দু একটা কথা জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু তাতেই ঘাম বেরিয়ে যেত।

উঠোনের দিকে মুখ ক'রে ডাকলাম, ভবেন। ভবেন আছিস?

এতক্ষণে হঠাৎ মনে পড়ল, ভবেনের মা এবং ছোট ভায়ের কথা সকালে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। আশ্চর্য। নিজের চিন্তায় এতই বিভোর হয়েছিলাম যে, এ সামান্য কথাটা জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গিয়েছি। কাকীমা কিংবা ভবেনের

ভাই শুভেনের কথা জিজ্ঞেস করাটা সৌজন্য বা লৌকিকতার মধ্যেও পড়ে না। ওকথাই প্রথম জিজ্ঞেস হওয়া উচিত ছিল। মন নিয়ে বিড়ম্বিত এ বিস্মৃতি দেখে, ভবেনও হয় তো অবাক হয়েছে। এমন সময় দেখলাম, একটি আলোর রেশ ক্রমেই এগিয়ে আসছে উঠোনের ওপর দিয়ে। এত গরম লাগছে কেন? হাতের চেটো, কান সব যেন গরম লাগছে।

আলোটা এসে দাঁড়াল বাইরের ঘরের সামনে। হ্যারিকেন হাতে ঝিনুক। চিনতে আমার ভুল হবার কথা নয়। কিন্তু সহসা যেন আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল। গলা শুকিয়ে গেল। সারা দেহে একটি উষ্ণ তরঙ্গ বইতে লাগল। ছন্দপতন ঘটল বুকের স্পন্দনে। একটু বোধহয় হাসল ঝিনুক। বলল, খুব সাধারণ গলায়, যেন আমাকে ও রোজই দেখছে, এমনিভাবে বলল, কে, টোপনদা নয়? বেশ লোক। ও আবার গেল তোমাকে ডাকতে। তোমার নাকি দেরী হচ্ছে। এস।

আমি ঠিক ঝিনুকের দিকে তাকাইনি। আর ঝিনুকই যে বাতি নিয়ে একেবারে বৈঠকখানায় আসবে, ভাবতে পারিনি। কিন্তু বহুদিনের এক অশ্রুত গলার স্বর আমার স্বপ্নের মধ্যে বেজে উঠল যেন। বললাম, না, দেরী কোথায়? ও তো ব্যস্তবাগীশ লোক। শুধু শুধু আবার—।

—এসে পড়বে। তুমি এসে বস।

আমার একটু সংকোচই হল। তবু বলতে পারলাম না যে আমি বাইরের ঘরে বসি। উঠোনে নেমে এলাম। ঝিনুক টুক করে পায়ে একটু হাত বুলিয়ে কপালে ছোঁয়ালে। আর আমি কিছু বলবার আগেই বলল, এস।

সে এগিয়ে গেল। আমিও গেলাম।

ভবেনদের দোতলাটা খুবই সংক্ষিপ্ত। একতলায় দু'খানা বড় বড় ঘর, ওপরেও দু'খানি। কিন্তু নীচে, উঠোনের ওপারে, দক্ষিণ খোলা বেশ বড় বড় পাতার ছাউনি দেওয়া মাটির দেওয়ালের ঘরগুলিই ওদের সাবেকী। সেখানেই ওদের আসল সংসার।

ঝিনুকের পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। বারান্দা পার হয়ে শেষের ঘরে গিয়ে ঢুকল ঝিনুক। ডাকল, এস।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, খাট, বড় আয়না, ছোট টেবিল, খান দুই চেয়ার রয়েছে এ ঘরে। বুঝলাম, এই ঘরেই ভবেন থাকে।

আয়নাটাকে যেন খারাপ লাগছে আমার। এত বড় যে, কোথাও একটু একান্তে সরে বসবার যো নেই। যেখানেই যাব, সেখানেই ছায়া থাকবে সঙ্গে সঙ্গে।

এইমাত্র নীচের বৈঠকখানা ঘরে গরম লাগছিল। এখন হঠাৎ বেশ ঠাণ্ডা লাগছে আমার। অনুভবের ক্ষমতা আমার এত ক্ষীণ হয়ে আসছে কেন।

ঝিনুক পিছন ফিরে কী করছিল, বুঝতে পারছিলাম না। সমস্ত পরিবেশটা এত স্তব্ধ আড়ষ্ট মনে হচ্ছিল, কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়লাম। বলে ফেললাম, বেশ শীত পড়েছে।

ঝিনুক পিছন ফিরে হ্যারিকেনটা আর একটু উস্‌কে দিতে দিতে বলল, ।রজাটা বন্ধ করে দেব ?

গলা ঝিনুকের বেশ পরিষ্কার। এ কথার রহস্য আছে কিনা জানিনে। আগেও এমন কথা এমন সুরে শুনেছি। কিন্তু আজ আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না না, বন্ধ করতে হবে না। ভবেনের মা কোথায় ?

—দিল্লীতে।

—দিল্লীতে ? কেন ?

—ঠাকুরপো ওখানে আছেন।

ঠাকুরপো, অর্থাৎ ভবেনের ভাই। ঝিনুকের মুখে এ সব শব্দগুলি আর কখনো শুনিনি, তাই বোধহয় একটু অদ্ভুত লাগছে।

জিজ্ঞেস করলাম, শুভেন কি এখন দিল্লীতে আছে তাহলে ?

—হঁ্যা।

বলেই সে বাইরে বেরিয়ে গেল। শুনতে পেলাম তার গলা দোতলার ।ারান্দা থেকে, আনিদি।

—অঁ্যা ?

—উনুনের আগুন ঠিক আছে তো ?

—আছে।

—ঘুমিও না যেন উনুনপাড়ে বসে।

—ঘুমাব ক্যানে বড় বউ। কিন্তুন, ইন্দিরটা যে ফিরে আসে না।

—আসবে, এই তো গেল।

ঝিনুক ঢুকল আবার। ববল, চেয়ারে বসলে কেন ? বিছানায় উঠে, পা ঢেকে বস।

টেবিলের ওপর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। ।ললাম, থাক।

—বলছিলে, বড় শীত করছে ? কাল থেকে শীতটা একটু বেশিই পড়েছে।

মনে মনে ভাবলাম, আমি এসেছি বলে নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু এভাবে, এমন আড়ষ্ট হয়ে কতক্ষণ থাকা যায়। কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। আমিই শুধু অস্বাভাবিক। কেন ? সংসারের কোথাও কোনো বিচ্যুতি দেখিনে। কোথাও সোর নেই, গোল নেই, আঁকাবাঁকা নেই। তবে আমার এত সাহসের সাধনা কেন ব্যর্থ হয় ?

আমি ফিরে তাকালাম ঝিনুকের দিকে। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ ঝিনুক।

ঝিনুক খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ভাল।

তারপর মুখ তুলল। দেখলাম, ঝিনুকের সেই টানা টানা চোখ। মাথায় ঘোমটা নেই। কপালে টিপ্ নেই, সিঁথিতে সিঁদুর রেখা। ফর্সা রং বলেই বোধহয় ওর গালের ছোট্ট একটি কাটার দাগ চিরদিনই বেশি করে চোখে পড়ে।

খাটো নয়, লম্বাও নয়, মাঝারি উচ্চতার একহারা ঝিনুক। যদিও এখন ঈষৎ মাংস লেগেছে গায়ে, সেটুকু যেন ওর আগের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করেছে। আগের থেকে তাই একটু যেন বেশি সুন্দর লাগলো। একটি লঘু তীক্ষ্ণতা ওকে ঘিরেছিল বরাবরই। এখন যেন সেটুকু আরও তীব্র হয়েছে। গলায় বুঝি একটি সরু চেন্ হার চিক্‌চিক্ করছে। হাতে কয়েক গাছা করে চুড়ি। গেরুয়া রং-এর লালপাড় শাড়ি আর ছিটের ব্লাউজ ওর গায়ে।

পরিবর্তন সহসা কিছু চোখে পড়ে না। কেবল একটু বড় বড় লাগছে দেখতে ঝিনুককে। লাগবে। ঝিনুক বড় ছিল। আরও বড় হয়েছে।

ঝিনুকের চোখ অন্যদিকে। বলল, বিশ্বাস হ'ল ?

বললাম, কী ?

—আমি ভাল আছি ?

—অবিশ্বাস করব কেন ?

হাসবার চেষ্টা করলাম। ঝিনুক বলল, তুমি কেমন আছ ?

বললাম, এতদিন ভাল ছিলাম না। কাল থেকে খুব ভাল আছি।

ঝিনুক চোখ তুলে তাকালো। ওর ভুরু যেন বেঁকে উঠে, আমার মনের গভীরে বিদ্ধ হল। বলল, ফিরে এসেছ বলে ?

—হ্যাঁ।

ঝিনুক চোখ নামিয়ে, আবার তাকাল আমার দিকে। ও হাসছে। কিন্তু একটি অটুট গাম্ভীর্য যেন থমকে আছে কোথাও। বলল, পরিষ্কার হয়েছ অনেক।

পরিষ্কার ? বললাম, ফর্সা হওয়ার কথা বলছ ? এসে শুনেছি সে কথা।

—কার কাছে ? পিশীর ?

—না। প্রথমে কুসুম বলেছে।

—কুসুম ?

ঝিনুকের ভ্রূ প্রশ্নবোধক চিহ্নে বেঁকে উঠল।—কে কুসুম ?

বললাম, হরলাল কাকার মেয়ে।

ঝিনুক বলল, ও, হ্যাঁ, উত্তরপাড়ার হরোকা'র মেয়ে কুসুম। তোমাদে বাড়িতেই তো থাকে, না ?

শেষ দিনের চিঠিটা কুসুমই নিয়ে গিয়েছিল ঝিনুকের কাছে। বললাম, হ্যাঁ এসে তো তাই দেখছি।

ঝিনুক আরও খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। কিন্তু কুসুমের কথা এ তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে ঝিনুক। কুসুমের হাতে চিঠি পেয়েই তো ঝিনুক ছু এসেছিল। বাড়ির চারদিক পুলিশ বেষ্টিত। আমি বেরোবার জন্যে প্রস্তুত বাবা দারোগার সঙ্গে কথা বলছিলেন দালানে। গ্রামের মেয়ে ঝিনুক। কি আমাদের শালঘেরির, বর্ষার তামাই নদীর মত ও যেন সকল সংকোচ, সক লজ্জা বিসর্জন দিয়ে প্লাবনের বেগে ছুটে এসেছিল। ঝিনুকের আঁচল উথল চুল এলো, চোখে জলের ধারা। পরম ভাগ্য, ঘরে আমি তখন একলা। পিশী

অন্য ঘরে গিয়ে কাঁদছিলেন। সামনে দাঁড়িয়ে বিদায় দিতে পারবেন না বলে।
তবু এক মুহূর্ত আমি সঙ্কোচে সিটিয়ে গিয়েছিলাম বাবার কথা ভেবে।
কারণ বাইরের উঠোন থেকে বাবা নিশ্চয় ঝিনুককে দেখতে পেয়েছিলেন।
কিন্তু ঝিনুক যে-মুহূর্তে আমার পায়ের ওপর এসে আছড়ে পড়েছিল, সেই
মুহূর্তে সকল দ্বিধা, লজ্জা আমারও ঘুচে গিয়েছিল। ঝিনুককে আমি দু-
হাতে টেনে তুলেছিলাম।

ঝিনুক রুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিল, তুমি চলে যাচ্ছ, আমি কী করে থাকব।

ওর যে কতখানি বেজেছিল, কত অসহায় বোধ করেছিল, ওর মত মেয়েকে অমনি করে কেঁদে আছড়ে পড়তে দেখেই বুঝেছিলাম। সহসা কথা বলতে পারিনি। কিন্তু সময় ছিল না? দারোগার গলা ভেসে আসছিল, সীমন্তবাবু, আর দেরী করার উপায় নেই, তাড়াতাড়ি করুন।

আমি ডেকেছিলাম, ঝিনুক!

ঝিনুক সাঁড়াশীর মত শক্ত করে আমাকে ধরেছিল। অচৈতন্য হবার পূর্ব-মুহূর্তের শক্তি সঞ্চয় করে যেন ফিসফিস করে বলেছিল, তোমাকে না দেখে কেমন করে থাকব? আমি যে আর কিছু ভাবতে ভুলে গেছি। টোপনদা, ভীষণ ভয় হচ্ছে, ভীষণ—

—খোকা!

বাবার গলা ভেসে এসেছিল দালান থেকে। আমি কোনরকমে ঝিনুকের কপালে আমার ঠোঁট স্পর্শ করেছিলাম। রুদ্ধস্বরে উচ্চারণ করেছিলাম, আর সময় নেই ঝিনুক।

আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম। মনে মনে বলছিলাম, কিন্তু ভয়? কিসের ভয়ের কথা বলল ঝিনুক?

—কী ভাবছ?

ঝিনুকের গলার স্বরে হঠাৎ চমকে উঠলাম। বিব্রত হয়ে বললাম, না, কিছু না। এই······।

স্বাভাবিক হতে চাইলাম। ঝিনুক বলল, শুনলাম, তোমার সেই তামাই সভ্যতার আবিষ্কারের নেশা এখনো যায়নি।

একটু কি শ্লেষ রয়েছে ঝিনুকের কথায়? বললাম, আবিষ্কারের নেশা? তা বলতে পার। কিন্তু যাবে কেন?

—এতদিন হয়ে গেছে, তাই বলছি।

—এতদিন মনে প্রাণে ওটারই ধ্যান করেছি।

ঝিনুক চকিতে একবার আমার চোখের ভিতরে ওর দৃষ্টি বিদ্ধ করল। বলল, তাই বুঝি?

বলে ঠোঁট টিপেই রইল।

আমার কপালের শিরাগুলি যেন দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল। একটু জোর

দিয়েই বললাম, হ্যাঁ। তামাইয়ের ধারে মাটির ওপরে যে জিনিসগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো যে কেউ ফেলে দিয়ে গেছে কিংবা উড়ে এসেছে, এমন তো মনে হয়নি কোনোদিন।

ঝিনুক বলল, হ্যাঁ, তুমি অনেকবার বলেছ, ওপরে যখন এটুকু দেখা গেছে, ভেতরে তখন আরও কিছু আছে।

আমি দৃঢ় হয়ে বললাম, আমার তাই বিশ্বাস। ধোঁয়া দেখলে আগুনের কথা মনে আসে।

ঝিনুকের চোখের ওপরে যেন একটি বিস্মিত জিজ্ঞাসা চিক্‌চিক্ করতে লাগল। আমার এ বিশ্বাসে যেন তার ভারী সংশয়।

চোখে চোখ পড়তে ঝিনুক চোখ সরালো। বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, কী লোক রে বাবা! কখন গেছে, এখনো ফেরে না।

আমি বলে ফেললাম, ওটা একটা উল্লুক।

ঝিনুক চকিতে ফিরল আমার দিকে। হাসলো বোধহয়। তারপরই আবার মুখ ঘোরালো।

আমি একটু অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি হল?

ঝিনুক মুখ না ফিরিয়েই বলল, কিছু না। গালাগালটা অনেক দিন বাদে শুনলাম কিনা।

—গালাগাল?

—ওই আর কি, তোমাদের ভালবাসার ডাক। উল্লুক আর রাস্কেল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি এমনি স্নেহের গালাগাল মনে পড়ে গেল, 'খরাসনী'। যদিও ঝিনুকের খরতা কোনোদিনই ওর ওপরের নিয়ত স্রোতে দেখা যায়নি। সে চিরদিন অন্তর্স্রোতেই বহমান। কিন্তু ঝিনুক রাগ করলেই ওকে খরাসনী বলে ডাকতাম।

ঝিনুক বলল আবার, বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে না?

বললাম, উপীনকাকার সংবাদ আমি জেলে বসেই পেয়েছি। পিশীর চিঠিতে শালঘেরির প্রায় কোনো সংবাদই বাদ পড়ত না।

—আমার বিয়ের সংবাদ?

কথাটি যেন আল্‌তো করে, অনায়াসে ছুঁড়ে দিল ঝিনুক। আর আমার সমস্ত মুখটা পুড়ে যেন ছাই হয়ে গেল। কিন্তু ঝিনুক জিজ্ঞেস করতে পারে, আমি জবাব দিতে পারিনে?

বললাম, তাও পেয়েছি।

ঝিনুক পিছন ফিরে দু' পা বাইরে গেল। যেন অনেক দূর থেকে জিজ্ঞেস করল, পেয়ে?

যত দূরে যায় ঝিনুক, তত যেন একটা ফাঁসের দড়ি কষে কষে যায় আমার গলায়। দৃষ্টি যত অন্ধ, তত দূরনিরীক্ষ্যের জন্য আমার চোখের ব্যাকুলতা। নিজেকে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকা একটি দূর অন্ধকার কোণে আবিষ্কার করে,

তাকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে এলাম। যেন কী একটি খুশি চলকে উঠল আমার গলায়। বললাম, খুব খুশি হয়েছি ঝিনুক।

ঝিনুক মুখ ফেরাল। ঝিনুকের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। হাসি গাম্ভীর্য কিছুই নেই যেন। তার পরেই আমাকে জিজ্ঞেস করল, একটু চা খাবে?

কথার কোনো পরস্পর সম্পর্ক খুঁজে পেলাম না। বললাম, খাব।

ঝিনুক চলে গেল। কিন্তু আমার যেন মনে হতে লাগল, আমি একজন আসামী। অপর পক্ষের উকীল এসে আমাকে উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে তার নিজের তথ্য জেনে গেল।

চোখে পড়ল ঝিনুকের আর ভবেনের ছবি। বোধহয় জেলা শহর থেকে বাঁধিয়ে এনেছে ভবেন। ঝিনুক যেন মুখটি একটু বেশি উঁচু করে তুলে ধরেছে। তুলনায় ভবেনের মুখ একটু বেশি নীচু। তখনো গোঁফ রাখেনি।

নীচে শক্ত উঠোনে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। তারপরেই ভবেনের ঈষৎ উঁচু গলা, ঝিনুক।

বোঝা গেল, সে রান্নাঘরের দিকেই গেল। আবার শোনা গেল, এসে গেছে? ওপরের ঘরে?

বলতে বলতেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল। বারান্দা পেরিয়ে ঘরে এল ভবেন। বলল, বেশ। বাড়ি গিয়ে শুনি এই যাচ্ছে। আর আমি বিকেল থেকে হা করে বসে আছি।

বললাম, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুইও তো অনেকক্ষণ গেছিস।

—অনেকক্ষণ? আমি তো পথে আর কোথাও যাইনি, দাঁড়াইনি। অনেকক্ষণ কী করে হবে?

—কী জানি। আমার তো মনে হচ্ছিল, এক ঘণ্টা হয়ে গেছে।

—একলা বসে আছিস নাকি?

—না, ঝিনুক ছিল। চা করতে গেল বোধহয়।

—চা করতে? কিন্তু ও তো রান্নাঘরে নেই।

বলতে বলতে ভবেন বাইরের বারান্দায় গেল। ডাকল, আনিদি, ও আনিদি!

—কী বুইলছ!

—তোমাদের বড় বউ কোথায় গেলেন?

জবাব এল নীচের কোনো ঘর থেকে, আমি নীচে এসেছি। যাচ্ছি। আনিদিকে চায়ের জল চাপাতে বলে এসেছি।

বাইরের বারান্দা থেকে ভবেন আবার যখন ঘরে ঢুকল, তখন তার মুখে যেন একটি অস্পষ্ট ছায়া নেমে এসেছে। অন্যমনস্ক আর চিন্তিত মনে হল ওকে।

আমাকে বলল, বিছানায় এসে বস টোপন।

বললাম, ঠিক আছে, এখানেই বেশ আছি।

ভবেন বাইরের দিকে তাকাল। ঝিনুক ঢুকল এসে ঘরে। ভবেনকে জিজ্ঞেস করল, কিছু বলছ?

ভবেন যেন কেমন অসহায়ভাবে হেসে বলল, না, মানে তুমি নেই, টোপন একলা বসে আছে, তাই বলছিলাম।

দেখলাম, ঝিনুক পান খাচ্ছে। একটু একটু করে পানের রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তার ঠোঁটে। দু-একবার পান খেতে দেখেছি এর আগে ঝিনুককে। কখনো সখনো দু-একটা ঠাট্টাও বুঝি করেছি ওর পান খাওয়া নিয়ে। কিন্তু সে কথা আজ স্মরণ করলে আপন মনের বিড়ম্বনা বাড়বে। তাড়াতাড়ি বললাম, একলা কোথায়। এই তো সব নীচে গেল।

ঝিনুক বলল, আমি ওষুধ খেতে গেছলাম।

ভবেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, বিকেলে খাওনি ওষুধ?

—না, ভুলে গেছলাম।

লক্ষ্য করলাম, ভবেনের চোখের বিস্ময়ের ঘোরটা কাটল না। সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তার ছায়া। একটু যেন ভয়ে ভয়েই বলল, অসময়ে না হয় না-ই খেতে ওষুধ। ওতে উপকারের চেয়ে অপকারই করে বেশি।

ঝিনুক খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু হবে না।

এই সময়ে ভবেন চকিতে একবার আমার দিকে আড়চোখে তাকালো। লক্ষ্য করলাম, আর দেখলাম, আমার সামনে আমার দুই পুরনো বন্ধু। ঝিনুক আর ভবেন, স্বামী ও স্ত্রী। আমার সকল প্রতিজ্ঞা বুঝি বা ব্যর্থ হয়। বুকের মধ্যে একটি তীব্র যন্ত্রণা আমাকে আড়ষ্ট করে তুলতে লাগল। গলার স্বর টুটি টিপে ধরতে এল। শেষে বুঝি তীরে এসে আমার তরী ডুবল। অসুখের কথা শুনে, কিছু না জিজ্ঞেস করাটা অশোভনীয়। ভবেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, অসুখ করেছে নাকি?

ভবেন বলল, হ্যাঁ, নরেন বোস্ একটা ওষুধ দিয়েছে খেতে। ভেতরটা নাকি ওর খুব দুর্বল। মাঝে মাঝে—

ঝিনুক বাধা দিয়ে বলে উঠল, থাক না। রোগ ব্যাধির কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

ভবেন যেন সংকুচিত হয়ে গেল। আমার দিকে একবার দেখল।

আমি বললাম, ভাল লাগার জন্যে কে আর অসুখের কথা বলে। কিন্তু অসুখটা কী?

ঝিনুক বলল, কিছুই না। আমার শরীর কি খারাপ দেখছ? দিব্যি খাই দাই ঘুমোই। মাঝে মধ্যে একটু মাথা ঘোরা দুর্বলতা সকলেরই থাকে। কিন্তু তোমার বন্ধুর ধারণা, মারা গেলাম বলে।

দেখলাম ভবেন মুগ্ধ এবং অসহায় বিস্ময়ে ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে মনে অবাক হলাম। বললাম, দুশ্চিন্তা তো হয়।

ভবেন যেন কী বলবার চেষ্টা করল। ঝিনুক বলে উঠল, লাভ কী মানুষের দুশ্চিন্তা ক'রে? শুনি তো, ইয়ৎ সৎ তৎক্ষণিকম্।

ঝিনুকের মুখে সংস্কৃত শুনে মনে পড়ল, ও বিষয়ে সে ছেলেবেলা থেকেই

সিদ্ধহস্ত। অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারত, নিষ্ঠাও ছিল। গুরু ছিলেন স্বয়ং উপীনকাকা। কিন্তু ওর মুখে, ইহকালের সবই ক্ষণকালের জন্যে, কথাটা কানে সহসা বিঁধল। সংশয় ও সন্দেহের বিষে কালো হয়ে উঠল মন। ক্ষুব্ধ কুটিল প্রশ্ন উদ্যত হয়ে উঠল, এই কি ঝিনুকের জীবনের সর্বাঙ্গীণ আদর্শ নাকি? এই আদর্শের মন্ত্র নিয়ে কি সে একদা আমার সঙ্গে—তারপর ভবেনের—? পরমুহূর্তেই ভাবলাম, না, ঝিনুক হয়তো জীবন-মৃত্যুর সম্পর্কেই কথাটা বলেছে। বললাম, হয়তো সত্যি। মানুষ যদি মনে রাখতে পারত।...

ভবেন বলে উঠল, তা হলে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হত। সংসারটা মুনি ঋষিদের আড্ডা হয়ে উঠত।

আমি হেসে উঠলাম। ঝিনুক বলল, তাই বলছি রোগের কথা থাক।

কথার মাঝ পথেই, বুক অবধি ঘোমটা টানা প্রায় একটি ভৌতিক মূর্তি এসে দাঁড়াল দরজায়। তার হাতে এক কাপ ধূমায়িত চা।

ভবেন বলে উঠল, ভেতরে এস আনিদি, এ আমাদের টোপন।

আনিদি ওখান থেকেই ঘোমটাসহ মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। তার-পর ফিসফিস করে বলল, বড় বউ, চা-টা লিয়ে যাও।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। বাল-বিধবা আনিদি। এখন বয়স ঝুঁকেছে বার্ধক্যের দিকে। মেয়ে ছিলেন দরিদ্রের ঘরের। যেখানে বিয়ে হয়েছিল, সেটাও মোটেই সচ্ছলতার ডেরা ছিল না। বিধবা হয়ে পরের বাড়ির হেঁসেল নিয়ে তাই চিরদিন কাটাচ্ছে। কিন্তু লজ্জাবতী লতা সেই গাঁয়ের কলাবৌয়ের মনটি মরেনি। এ শুধু লজ্জাই নয়। এর মধ্যে অনেকটাই শালীনতাবোধ।

আনিদি কোনোদিনই কথা বলেনি। ভবেনদের স্নেহ করত মা'য়ের মত। আমাদের প্রতিও তার সেই স্নেহ। তবে কোনোদিনই সামনে আসবার প্রয়োজন হয়নি। সেইজন্য আজ সামনে আসতে অপরিচয়ের এই শালীন বেড়া।

ঝিনুক চা এনে দিল। বললাম, কেউ খাবে না? একলাই খাব?

ভবেন বলল, আমি তো চায়ের ভক্ত কোনোকালেই নই। ও তো ওষুধ খেয়ে এসেছে।

দেখলাম, আনিদি তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে। এবং ঘোমটার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখার কৌতূহল মেটাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, ভাল আছ আনিদি।

ঘোমটার ভিতর থেকে জবাব এল, আছি বাবা। তুমাকে আর দেখব আশা ছিল না। সব্বাই বুইলছে, তুমার ফাঁসি হয়্যা যেইছে।

ভবেন যেন দোষ স্খালনের মত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, সেই সব্বাইটা কে আনিদি? আমাকে তো তুমি কোনোদিন কিছু জিজ্ঞেস কর নাই।

আনিদি বলল, গাঁয়ের লোকে যে বুলে!

আমি হাসলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম, ঝিনুক তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

বললাম, কিন্তু আনিদি, বিশ্বাস কর, ফাঁসি হয়নি। ওই দেখ, আমার ছায়া পড়েছে দেয়ালে।

আমার আর ভবেনের হাসি উচ্চকিত হয়ে উঠল। কেবল ঝিনুক হাসেনি। আনিদির শরীর তখন হাসিতে কাঁপছিল। বলল, সি কথা বলি নাই বাবা। ও ডাকারা তুমাকে ফাঁসি দিতে পারবে ক্যানে?

ছায়ার কথায় হাসির কারণ আর কিছুই নয়। এ এক সংস্কার গ্রাম্য মানুষের. ছদ্মবেশী প্রেতমূর্তির ছায়া পড়ে না। কারণ, আসলে তো সে বাতাস। ওর কোনো কায়া নেই।

আনিদি আবার বলল, বস, আমি যাই।

চলে গেল আনিদি। তবু একটু সময় যেন আমরা সবাই স্বাভাবিক হতে পেরেছিলাম। ভবেনের কথানুযায়ী আমরা অনেককাল পরে তিনজনে একত্র হয়েছি বটে। ঝিনুকের ভাষ্য অনুযায়ী, ইহকালের সবই ক্ষণকালের জন্য। না হয় তাই হলো। আজ এই ক্ষণটিতে আমরা একটু নতুন করে হাসতে পারিনে? আমরা তো শালঘেরির তিন সন্তান।

পরমুহূর্তেই আমার আবার মনে কুটিল অন্ধকার ঘিরে আসতে চাইল। সত্যি কি বিদ্রূপ করেছে ঝিনুক। হয়তো বিদ্রূপই করেছে। সবই যে ক্ষণকালের, এই উপদেশ সে আমাকে দিয়েছে। যা ছিল, তা নেই।

থাকবে না? কিন্তু জোর ক'রে তাকে ধরে রাখব বলে শালঘেরিতে ফিরিনি। যা আছে তার সঙ্গে আছি। সেই ক্ষণিক যদি শুধু রং ফেরানো হয়, তবে আকাশে কত সময় কত রং-এর খেলা। তাকে আমি মুছতে পারিনে। নিজের হাতের তুলি দিয়ে বদলাতে পারিনে তার রং। সে যা, তাই দেখে আমার সুখ, আমার দুঃখ।

আকাশ আকাশের মত থাকুক। আমি ঘুড়ে বেড়াব তার তলায়। ভবেন আমার বন্ধু। ঝিনুক আমার বন্ধু-পত্নী। এই সত্যের কাছে কোনো ঠাঁই নেই নির্দেশ উপদেশ ইঙ্গিতের।

আমি বললাম, কি রে ভব। তোরা যে সব চুপ করে রইলি?

ভবেন বলল, আজ তোর পালা টোপন।

এবার যেন ঝিনুক একটু স্বাভাবিক ভাবে বলল, জেলের কথা বল টোপনদা।

বললাম, জেলের কথা বলার কিছু নেই ঝিনুক। এক ঘর, এক দেয়াল। একই জায়গার মধ্যে সারাদিনের ঘোরাফেরা। গুনে চলার দরকার ছিল না, ডাইনে বাঁয়ে সবশুদ্ধ কত পা' চলব, তা আর গুনে রাখতে হ'ত না, সেটাও রপ্ত হয়ে গেছল। আর প্রতিদিন, প্রতি মাসে বছরে বছরে একই মানুষের মুখ দেখা।

ব'লে হেসে ফেললাম। বললাম, সন্দেহ হ'ত, জেলে আমাদের সীমানায় একই কাক শালিকেরা রোজ আসত। টের পেতাম একটা কাকের নাকে ছিল

লোহার তারের নোলক। তাকে নানান জনে নানান নাম দিয়েছিল। তবে অধিকাংশের কাছে সে ছিল কাকের বউ কাকিনী? সে মেয়ে ছিল কি পুরুষ ছিল, সেটা আমরা জানতাম না। তার ওই তারের নোলক দেখে আমরা মনে করতাম, সে মেয়ে। খাবার কুড়োবার দরকার না থাকলেই দেখতাম, একটা নিমগাছের ডালে ব'সে সে তার চোখা ঠোঁটখানি বাড়িয়ে ধরত, আর তার সঙ্গীটি খুঁটে খুঁটে নোলক খোলার চেষ্টা করত। যেন মানুষের পড়িয়ে দেওয়া লোহার বেড়ি থেকে কাকটা তাকে মুক্ত করতে চাইত। কিন্তু পারত না।

বলে আমি হাসলাম। ভবেন হাসল উচ্চ গলায়। ঝিনুকের ঠোঁটের কোণে যে হাসিটুকু কুঁকড়ে রয়েছে, তাতে হাসির চেয়ে দুর্বোধ্য বার্তার লক্ষণই বেশি।

ভবেন বলল, বাংলাতে তোর দখল আমার চেয়ে বেশি দেখছি। কাক-কাকিনীর ভাল উপাখ্যান বলেছিস।

ঝিনুক বলল, কিন্তু কাকের ঠোঁট তো খুব চোখা আর ধারালো। তাও কাটতে পারল না?

কথাটা বলেছিলাম পরিষ্কার মন নিয়েই। সন্দেহ হল ঝিনুকের কথা শুনে। এ কি সেই তার আলো-আঁধারির ভাষা!

কিছু না ভেবেই ভবেন বলল, সেটি পারবে না। এদিকে তুমি জানালায় তারের জাল দাও; ঠিক খুঁটে খুঁটে ছিঁড়ে ফেলবে। তবে আমাদের শাল-ঘেরিতে কাকের উৎপাত কম। জেলা শহরে দেখেছি কুটোগাছটি খোলা রাখবার যো নেই।

আমি বললাম, হিসেব নিলে বোধহয় দেখা যাবে, কাকেরা শহরেরই বাসিন্দা। গ্রাম ওদের খুব পছন্দ নয়।

ঝিনুক বলল, আর কী করতে জেলে সারাদিন?

—জেলে কিছু করা যায় বলে আমার মনে হয় না। কেন না, জেলে আছি, এ কথাটা কখনো ভুলতে পারতাম না। করতাম যা, তা একটু পড়াশুনা।

—তোমার ওই আবিষ্কারের তত্ত্ব?

—তা বলতে পার। একটা মূলধন না হলে মানুষের চলে কেমন করে?

ঝিনুক আমার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে, চুপ করল।

আমি বললাম, সে কথা যাক। শালঘেরির কথা শুনি।

ঝিনুক বলল, আমাকে বলছ?

—তুমিই বল।

ঠোঁট উল্টে একটু হেসে বলল, শালঘেরির কোন্ রাস্তা কোন্‌দিকে তাই বোধহয় ভুলে গেছি। মাঝে মাঝে পুবপাড়ায় মায়ের কাছে যাই। আর কিছুই জানি না।

আমি বললাম, তা' তো হবেই। সেদিন ছিলে গাঁয়ের মেয়ে, এখন বউ।

ভবেন বলল, তা' নয় টোপন। শালঘেরির বউয়েরাও ঝিনুকের চেয়ে

আজকাল বেশি সংবাদ রাখে গাঁয়ের।

ঝিনুক জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকাল। আর আমার মনে হল, কোথায় যেন একটা বেসুর বাজছে। ভেবেছিলাম, ঝিনুক ভবেনের মাঝখানে, আমি মূর্তিমান বেসুর হয়ে বাজব হয়তো। হয়তো তাই বেজেছি। কিন্তু আরও একটা বেসুর যেন ফাঁকে ফাঁকে ধ্বনিত হয়ে উঠছিল, যা আমার অগোচরে রয়েছে। যা আমি আগে ভাবিনি। এখনও সংশয়ে ভুগছি। আর এ সংশয় একবার যেন আমার অবচেতনে খচখচিয়ে উঠেছিল, গতকাল প্রথম ভবেনের সঙ্গে কথা বলে।

আমি প্রসঙ্গ বদলে বললাম, কাকীমা কেমন আছেন?

ঝিনুক বলল, মা আছে এক রকম। মা'র অনেক দোষ। বাবাকে একটুও ভুলে থাকতে পারে না। সংসারটা তাই গোল্লায় যাচ্ছে।

ঝিনুকের মুখ গম্ভীর দেখাল। বুঝতে পারি, কাকীমার যে দোষের কথা বলছে ঝিনুক, সেকথা বলতে আসলে তার কষ্টই হচ্ছে। উপীনকাকাকে ওঁর বন্ধুরা অনেক সময় ঠাট্টা ক'রে স্ত্রৈণ বলেছেন। যদিও প্রায় জীবনের প্রান্তসীমায় দেখেছিলাম উপীনকাকা আর তাঁর স্ত্রীকে, তবু দুজনকে চিরদিনই আমাদের নতুন প্রেমিক প্রেমিকা বলে মনে হয়েছে।

অনেক সমারোহ আর আড়ম্বরের মধ্যে আদর্শের বিজ্ঞাপন দেওয়া স্বামী-স্ত্রী দেখেছি। কিংবা অনাড়ম্বরের মধ্যেও যাদের অভ্যাসের বশে চিরদিন নিস্তরঙ্গ জীবন কাটাতে দেখেছি, তাদের সঙ্গে উপীনকাকাদের কোনো মিল নেই। প্রৌঢ় বয়সেও দেখেছি. উপীনকাকার চোখের দিকে তাকাতে গেলে, কাকীমার চোখে একটি সলজ্জ হাসি ফুটে উঠেছে।

কাকীমা বুঝি আজ তাই আর সংসারে মন দিতে পারেন না। যে সংসারের কুটোগাছটি নিজের হাতে সরাতেন, আজ সে সংসার গোল্লায় গেলেও বুঝি তাই আর কাকীমার চোখে পড়ে না।

কই, একবারও তো ভাবিনি, কাকীমার কাছে যেতে হবে। এমনি করেই বুঝি মানুষের নিজের বিচার নিজের কাছে হয়। মনের ছোট বড় দেখা যায় এমনি করে। নইলে, সকালবেলা একবারও কেন ভাবিনি, উপীনকাকা মারা গেছেন। কাকীমার কাছে একবার যেতে হবে।

অনুশোচনার ভোগান্তিটুকু তোলা রইল কাল সকাল পর্যন্ত। আমি এসেছি, তবুও যাইনি। কাকীমা কী না জানি ভাবছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ভাই অমু, সে কী করছে আজকাল?

ঝিনুক বলল, শহরে আছে। এবার আই-এ দেবে।

অমু উপীনকাকা আর কাকীমার একটি মিলিত ছবি। কিন্তু ঝিনুককে আমার চিরদিন তার প্রতিবাদ ব'লে মনে হয়েছে। বোধহয় উপীনকাকার মধ্যে কোথায় ঝিনুকের জড় লুকানো ছিল। যা ছিল তাঁর মধ্যে চাপা, তাই নিয়ে প্রকাশিত ঝিনুক। ঝিনুকের এই চরিত্রও।

এর পরে এল ভবেনদের প্রসঙ্গ। বোঝা গেল, ঝিনুককে পুত্রবধূ হিসেবে মন থেকে নিতে পারেননি ভবেনের মা। তাই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে শুভেনের কাছে দিল্লীতেই। কথাটা ভবেন হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল। ঝিনুক তা দিল না। তার কথা থেকে বোঝা গেল, ভবেনের মা'য়ের অসন্তুষ্টির কারণ, তাঁর বিশ্বাস, ভবেন তার স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীর সম্মান ও শ্রদ্ধা পায় না। শাশুড়ি হিসেবেও তিনি তাঁর কল্পিত পুত্রবধূকে পাননি ঝিনুকের মধ্যে।

ভবেন হয়তো প্রতিবাদ করতে চাইল। সংকোচে দ্বিধায় অস্বস্তিতে হাসল। কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা যেন খুঁজে পেল না।

ইতিমধ্যে আনিদি ঘোষণা করল, রান্না শেষ। বড় বউ বললে সব ওপরে নিয়ে আসতে পারে।

আমি বললাম, ওপরে কেন কষ্ট করে বয়ে নিয়ে আসা? নীচেই যাই।

ঝিনুক বলল, খাবারগুলোই শুধু ওপরে বয়ে নিয়ে আসতে হবে। আর সব ব্যবস্থাই এখানে আছে।

ভবেন বলল, নিতান্ত খেতেই বসব না? একটু জমিয়ে বসতে হবে তো।

ঝিনুক উঠে রান্নাঘরে যেতে যেতে ভবেনকে বলল, চেয়ারগুলো একপাশে সরিয়ে দাও।

আমাকে উঠতেই হল এবার খাটে। খাবার বোধহয় ইতিমধ্যেই পাশের ঘরে পৌঁছানো হয়ে গিয়েছিল। মেঝেতে আসন পেতে জল দিয়ে ঠাঁই করে দিয়ে গেল আনিদি। পরিবেশন করল ঝিনুক। খাবার আয়োজনের কথা না তোলাই ভাল। কোনো নিয়মকানুনের ধার না ধেরে ওটা বেহিসেবী হ'য়ে গেছে। মাছ মাংস নিয়ে সপ্ত ব্যঞ্জনেরও বেশি। পায়েস পিঠেও বাদ যায়নি। সবকিছু শিল্পসম্ভারের মতই চারপাশে সাজিয়ে দিল ঝিনুক। নইলে বুঝি মানায় না।

এ বাড়িতে এ আমার নতুন খাওয়া নয়। রান্নাঘরে বসেও খেয়ে গেছি, কিন্তু এমন নিখুঁত সাজানো গোছানো আয়োজনের মধ্যে নিমন্ত্রণের মত খেতে হয়নি।

ভবেনের চেয়ে আমার যেটুকু বাড়তি ছিল, সেটুকু হ'ল একটি কাঁচালংকা আর বাটিতে একটু বড়ির ঝাল। বিদ্যুৎ চমকের মত একটা ঝিলিক হানল যেন কোনো এক দূরের অন্ধকারে।

না, তা নয়। যেন অনেকদিন আগের একটি ছোট কথার স্মৃতি কেউ বেড়ে দিয়েছে সামনে। লংকা কোনোদিন দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। বড়ির ঝালটা অত্যন্ত প্রিয়।

চকিতে একবার ঝিনুকের দিকে তাকালাম। কিন্তু ঝিনুক যেন খাবার বেড়ে দেবার ব্যাপারেই ব্যস্ত। থাক, সে কথা আজ ভাবব না। বড়ির ঝালের বাটিতে হাত দিয়ে, তবু আর একবার চোখ তুলে দেখি, আমার দিকে নয়,

ঝিনুক বাটিটার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাকালাম বলে সে ভবেনের দিকে তাকাল।

ভবেন হেসে বলল, ওই অকিঞ্চিৎকর জিনিসটা ঝিনুক তোর জন্যে স্পেশাল করেছে।

বলেও ভবেনের হাসিটা থামল না। হাসতে হাসতেই বলল, তার সঙ্গে একটা পরীক্ষাও হ'য়ে গেল।

—পরীক্ষা?

—হ্যাঁ। জানা গেল, এখনো রান্নার ঝাল ছেড়ে শুধু লঙ্কা ধরিসনি।

বলে আরও হাসল ভবেন। ঝিনুক গিয়ে একটি চেয়ারে বসল। সেও হাসছিল। কথাগুলি আমার এমন কিছু খারাপ লাগল না।

কিন্তু ভবেনের উচ্চ গলার হাসির মধ্যে সেই বেসুর যেন বড় বেশি চড়া সুরে বেজে উঠল।

আমাদের পিছনে সেই বড় আয়না। চেয়ারের ওপর সামনে ঝিনুক। পায়ে তার আলতা লক্ষ্য করেছিলাম। এখন শালীন হওয়ার জন্যে লাল পাড় দিয়ে ঢাকা দিয়েছে। যদিও সে মাটিতে বসেনি। এই দরবারের দুই বশংবদ প্রজার সামনে সে চেয়ারে বসেছে যেন মহারাণীর মত।

ঝিনুক মাটিতে না বসায় মনে মনে অবাক হলাম। রীতি সহবতের দিক থেকে সেটাই শোভনীয় ছিল। কিন্তু ঝিনুককে তাতে কতখানি মানাতো জানি-নে। সে যেন ঠিক মানানসই জায়গাতেই বসেছিল।

আমি খাবার মুখে দেবার আগে বললাম, কিন্তু ভব, এ যে একেবারে সপ্তকান্ড রামায়ণ করে ফেলেছিস্। এ কি বলি দিবি ব'লে শেষ খাওয়া খাওয়াচ্ছিস্ নাকি।

ভবেন ভাত মাখতে গিয়ে থেমে বলল, রাস্কেল তুই একটা।

ঝিনুকের আঁচল খসল। তুলে নিল না। এক হাত ওর হাতলে, আর এক হাত কোলে। ফর্সার ওপরে যেন সুবর্ণচ্ছটার একটি ঝংকার ছিল। কিশোরী ঝিনুককে যখন দেখেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল, কাঁচ পাতায় ঝলক ওঠা রোদ সেটা। তারপরে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, আমাদের এই শালঘেরির রক্তমৃত্তিকায় রোদের ঝিলিকের মত।

জেল থেকে নতুন কিছু হয়তো দেখতে শিখিনি। অনেক দিনের কারা-বাসী বঞ্চিত চোখ আমার অবাধ্য হয়ে উঠল। যা আমি সোজাসুজি তাকিয়ে দেখতে কুণ্ঠিত, আজ আমাকে চুরি করেই দেখতে হচ্ছে রোদের খেলা। এই শীতের রাতে, শালঘেরির এই দোতলা ঘরটায় আমার মনে হ'ল, ঝিনুকের অনাবৃত শরীরের অংশে রোদ লুকোচুরি করছে। সেই রোদ মিটিমিটি হাসছে যেন আমারই দিকে চেয়ে।

ঝিনুক বলল, জেলে কখন খেতে?

—যখনই হোক, রাত নটার মধ্যে।

—ভাগ্যিস্ সেখানে নিয়মকানুনের বালাই ছিল।

—না থাকলে?

—প্রাণ খুলে অনিয়ম করতে।

ভবেন বলল, এইবার তার শোধ নেবে টোপন। মতলব যা করে এসেছে, তাতে নিয়মকানুনই ভূতের মত তাকিয়ে থাকবে ওর দিকে। হ্যাঁ, মাছ কেমন খাচ্ছিস্ টোপন?

—খুব ভাল।

—ওঃ, সে এক মজার গল্প! আজ মাছের জন্য টক্কর লেগে গেছল তোর পিশীর সঙ্গে। সামনা সামনি নয়। ফ্যাসাদে পড়েছিল বৈকুণ্ঠ।

—কী রকম?

—বৈকুণ্ঠ একটি মাছ ধরেছে ওই বেলায়। সেটি গিয়ে দাবী করেছে আমাদের ইন্দির। আর জানিস তো, আমাদের ইন্দিরের গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই, চাবুকখানি আছে। ছাড়বে না কিছুতেই। বৈকুণ্ঠর মহা মুশকিল। বলেছে, 'অই টোপন ঠাকুর আইস্‌ছে এত বছর বাদে ফাঁসি থিকে ছাড়া পেয়্যা, ওয়াঁকে দিতে লাগবে যে?' ইন্দির তারে বাড়া। বলেছে, 'আরে রাখ্ তোর টোপন ঠাকুর। তার চেয়ে অনেক বড় মানুষ আসবে আমার কত্তার বাড়িতে। হয় একটি ধর, না হয় ওটাই দে বৈকুণ্ঠ।' বেচারীর মহা মুশকিল। বাজারও তখন কানা। অতবড় সরোবর, আবার জাল ফেলাও চাট্টিখানি কথা নয়। শেষে, ইন্দিরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করে, সারা দুপুর বেচারী পরিশ্রম করেছে। আমাদের পুকুরে এসে জাল ফেলে এই মাছ ধরে দিয়ে গেছে। যাবার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমার বাড়িতে আবার কে আসবে গ' ঠাকুর?'

খুবে গম্ভীর হয়ে বললাম, 'সীমন্ত চাটুজ্যে।' বৈকুণ্ঠ বললে, 'তিনিটি আবার কে?' বললাম, 'সে তুমি চিনবে না। আমাদের আসল লোক।'

বলে ভবেন ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে হাসল। ঝিনুক তাকাল আমার দিকে।

আমি বললাম, আমিও তোকে তাই বলছি। কেন, এ খাওয়াটা আমাকে দুদিন বাদে খাওয়ালে কি হত? পালিয়ে যাচ্ছিলাম নাকি শালঘেরি থেকে?

ঝিনুক বলল, ও দোষটা তুমি আমাকে দাও। আমিই আসতে বলেছিলাম।

অতএব এর ওপরে আর কথা চলে না। ঝিনুকের গলায় মেঠো গানের সুর নেই। কিন্তু সুর আছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলাপের মত সেই সুর, সবসময় ভবিষ্যতের অর্থ বহন করে। সহজ করে বললে বোঝায়, ঝিনুক যা বলছে, ওতে সে কোনো তাল মানের ভুল রাখেনি। যা শোনা গেছে, তারপরে নীরব থাকাই শ্রেয়।

ভবেন বলল, আর দুদিন বাদে খাওয়ালে হতো মানে কী? তা তো তোকে খেতেই হবে?

অবাক হলাম। কোনো উৎসবের কথা ভেবে বললাম, কেন, কী আছে?

ভবেন বলল, কী আবার থাকবে, কিছুই না। আসতে হবে তোকে রোজই।

তাই ভাল। বললাম, কাজকর্ম ছেড়ে ভবেন ঘোষালের অন্ন ধ্বংসাব বসে বসে।

—কাজকর্ম ছেড়ে কেন? কাজকর্ম করেই।

এ ক্ষেত্রে ঝিনুক নীরব। আর ভবেনকে বুঝতে পারছি। ওর সেই অপরাধবোধটা ওকে ছাড়ছে না। মনের ফাঁপরটা কাটাবার জন্যে এত তালবেতালের কথা।

খাওয়া হল। বাইরের বারান্দায় আচাবার জল ঢেলে দিল ঝিনুক। আপত্তি শুনল না। গামছা তুলে দিল হাতে। কিন্তু অস্বস্তি হল, ভবেনকে নিজে নিজে সব করতে দেখে। যদিও নিজের বাড়ি, তবু ঝিনুকের একটা কর্তব্য আছে নিশ্চয়ই। আমার মনে হল, ভবেন যে আছে, সেটাও যেন ওর মনে নেই। এ নির্বিকার তার স্বামীর প্রতি অবহেলা, না, আমি সামনে আছি বলে সংকোচ? কিংবা, এ আমারই দেখার ভুল মাত্র হবে। তবু ভবেনের মুখে যে একটি অসহায় আড়ষ্টতা রয়েছে, সেও কি আমার দেখার ভুল!

ঝিনুক পান দিতে এল। বললাম, ওটা আমি কখনও খাইনে ঝিনুক। ভবকে দাও।

ঝিনুক বলল, খাও না জানি। আজ খাও। ওকে দিচ্ছি।

ঝিনুকের বাক্যটা সম্পূর্ণ করলে বলতে হয়, আজ তোমাকে ওটা কষ্ট করে খেতেই হবে। কেন? ঝিনুক নিজের হাতে সেজেছে বলে! তা ছাড়া ঝিনুকের এসব 'গিন্নীত্বের গুণ কোনোদিনই দেখিনি। বসে খাওয়ানো, আচানো, মোছানো, পান দেওয়া। উপীনকাকার বাড়িতে ওসব চিরদিন কাকীমাই করেছেন। বরং শুনতে পেয়েছি, কাকীমা বলতেন, এ মেয়ে যে-বাড়িতে যাবে, সেই বাড়ির কপালে কী আছে ভগবান জানেন।

যদিও তিনি এবং আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত ছিলাম, সে বাড়ির শুভই হবে। কারণ, ঝিনুক সম্পর্কে সকলের একটি বিশ্বাস ছিল।

ভবেন বলল, গড়গড়া টানবি টোপন? ভাল তামাক আছে।

—তুই কি তামাক ধরেছিস্ নাকি?

—মাঝে মাঝে খাই, যেদিন ইচ্ছে যায়। ইন্দির সাজেও ভাল।

বললাম, বেশ স্কুল মাস্টার হয়েছিস। কিন্তু আজ নয়, আর একদিন খাব। এবার যাই।

ভবেন বলল, দাঁড়া, ওঘর থেকে চাদরটা নিয়ে আসি। বাইরে এই জামা দিয়ে আর চলছে না।

ঝিনুক পা দোলাচ্ছে খাটে বসে। ধীরে ধীরে দোলাচ্ছে। হাতের ভর দিয়ে পিছন দিকে হেলে বসেছে সে। আমি জানি ও এখন তাকিয়ে আছে

আমার দিকে। আমি ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম।

এই পা দোলানো ভঙ্গিটা অনেক দিনের চেনা। মনে আছে, কাকীমা দেখতে পেলেই বলতেন, পা দোলাস্‌নি ঝিনুক। মেয়েদের পা দোলাতে নেই।

কখনও কখনও ধমক খেতে হত। কিন্তু ঝিনুকের মনে থাকত না। বিব্রত লজ্জায় হেসে উঠত। আর কোপ কটাক্ষে পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখত। যেন, যত দোষ পায়েরই। অথচ ঝিনুক যখন হাসত, কথা বলত, তখন স্থির হয়েই থাকত। তাই আমার জানা ছিল, কোনো কারণে চিন্তিত থাকলে, রাগ হলে, কিংবা মনের মধ্যে উত্তেজনা অস্বস্তি থাকলে, ও নীরব হয়ে যেত। পা দুলিয়ে যেত সমানে, নিজেরই অজান্তে। আর সেই সঙ্গেই, চুল খোলা থাকলে, পাকের পর পাক চলত আঙুলে, গলায় জড়াতো ফাঁসের মত। যেন খোলা চুলগুলি নিয়ে কী করবে, ভেবে পেত না।

এখন ঝিনুকের চুল খোঁপা বাঁধা। তবু কী আশ্চর্য বিচিত্র মানুষের মন! মনে মনে যেন একটু সান্ত্বনা পেলাম এই ভেবে, ঝিনুকের এই এত সাবলীল সচ্ছন্দ ব্যবহারের মধ্যেও তার অসহজতা ধরা পড়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ পা দোলানিটা থামল। শুনলাম, ঝিনুক ডাকল, টোপনদা।

আমি সহজভাবেই ফিরলাম।

দেখলাম, ঝিনুক আলোর দিকে তাকিয়ে আছে। সেইদিকে চোখ রেখেই বলল. না আসার পণ করনি তো মনে মনে?

—এই তো এসেছি।

—আজকের দিনটা বাদ। ও পণ যেন রেখ না মনে।

সুর শুনে বোঝবার উপায় নেই, ঝিনুক আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে, না অনুরোধ করছে। হয়তো এ ওর শঙ্কা। নাকি জেদের অগ্রিম বার্তা, জানিনে। কিন্তু অমন পণ করে অকারণ আমি কোথাও কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি করতে চাইনি।

বললাম, কাজের পণ ছাড়া আর কোনো পণ নিয়ে ফিরিনি ঝিনুক।

—তাই বুঝি?

ঝিনুক চোখ ফিরিয়ে তাকালো। সহসা যেন আমার বুকের রক্তে একটা দোলা লেগে গেল। ঝিনুককে দেখে, ওর দেহের যে বর্ণনা মনে মনেও উচ্চারণ করিনি, তা-ই যেন আমার দীর্ঘকালের পুরুষ-প্রাণের মৌনতাকে মুখর করে তুলল। ও তিলোত্তমা নয়। কিন্তু ওর দেহের মধ্যাংশ থেকে, ঊর্ধ্বাংগের বক্ষ গ্রীবা, নিম্নাংশের কটি ঊরু ও জংঘা সব কিছুতেই একটি যেন মাপ করা ছন্দেব বিন্যাস। যে বিন্যাসের মধ্যে একটি অনায়াস, তীব্র আকর্ষণের দ্যুতি। ঝিনুকের বসার ভঙ্গিতেই কি না জানিনে, নতুন করে চোখে পড়ল যেন।

ওর কথার জবাবে 'হুঁ্যা' বলে, তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাতে গেলাম। হঠাৎ ঝিনুক খাট থেকে উঠে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। অত্যন্ত

ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখি, এটা কিসের দাগ, এই ঠোঁটের নীচে, চিবুকের কাছে? এটা তো ছিল না?

আমি চমকে উঠলাম। নিশ্বাস ফেলতে পারলাম না। একটি অস্পষ্ট গন্ধ আমার বুকের মধ্যে আবর্তিত হতে লাগল। মুখ তুলে, দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। বললাম, কোথায়?

ঝিনুক বলল, এই যে, এখানে। দেখিনি তো আগে?

মনে পড়ল আমার। বললাম, ও, হ্যাঁ, দাড়ি কামাতে গিয়ে ব্রণ কেটে ফেলেছিলাম। সেফ্‌টিক হয়ে গেছল।

কথা শেষ করবার আগেই আমার চোখে পড়ল, বাইরের বারান্দার অন্ধকারে একটি অস্পষ্ট মূর্তি যেন থমকে দাঁড়াল। কিংবা ভুল দেখলাম। ভয় উত্তেজনা অস্বস্তি, এসব কিছু ঢাকবার জন্যেই যেন আমি বিমূঢ়ভাবে হেসে উঠলাম। ডাকলাম, ভব, ভব।

এবং সত্যি ভবেন ঢুকল ঘরের মধ্যে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে, চাদরের ভাঁজ খুলতে খুলতে, পান চিবুতে চিবুতে, আর হাসতে হাসতে। বলল, কী হয়েছে চিবুকে?

বলে সে আমার আর এক পাশে এসে দাঁড়াল। ঝিনুক কিন্তু একটুও সরল না। ভবেনকে বলল, নতুন দাগ।

ভবেন বলল, জেলের দাগ।

দু পা পেছিয়ে আমি বললাম, দাগের বিচার থাক। এবার চলি। কিন্তু ভব, তুই আর এই রাত করে, ঠাণ্ডায় বেরুতে যাচ্ছিস কেন?

ভবেন বলল, বারবার যা করেছি, তাই করব। চল্‌, এই পাড়াটা পার করে দিয়ে আসি।

বারবার ভবেন তা-ই করেছে বটে। রাত করে ওদের বাড়ি এলে পাড়ার বাইরে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। আমিও আমাদের দেবদারুতলা পার করে দিয়ে যেতাম ওকে। ভবেন সেই পুরনো দিনের নিয়মগুলিই আজও বজায় রাখতে চায়। কিন্তু এই নতুন পরিবেশে, পুরনো নিয়ম কি চলবে!

ভবেন যেন অনুমতি নিচ্ছে, এমনি করে ঝিনুককে বলল, আমি তা হলে টোপনকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

ঝিনুক কোনো জবাব না দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাতিটা তুলে নিল। ভবেন এগিয়ে গেল দরজার দিকে। তখন ঝিনুকের গলা শোনা গেল, রাস্তার মাঝখানে গল্প করে রাত কাবার করে এস না যেন।

ভবেন দরজার বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, না, না।

তারপরে হঠাৎ হেসে উঠল। হাসতে হাসতে, পা বাড়িয়ে বলল, আয় টোপন।

ভবেনের চড়া গলার হাসিতে একটা অস্বস্তিকর বিস্ময় ঘিরে ঘিরে এল আমার মনে। কিন্তু ঝিনুককে না বলে পারলাম না, গল্প করে রাত কাবার

তো দূরের কথা, আমি ওকে দু পা গিয়েই ফিরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঝিনুক চকিতে একবার চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। একটি চিকুরহানা ঝিলিক যেন দেখলাম ওর ঠোঁটের কোণে। বলল, কথাটা তোমাকেও বলেছি। বাইরে দাঁড়িয়ে হিমে গল্প করলে তোমারও শরীর খারাপ হবে।

ও বাতি নিয়ে এগিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল আমার আগে আগে।

দালান পার হয়ে উঠোনে এলাম। ঝিনুক আমার পিছনে পড়ল। বাইরে যাবার পথে, একটি মূর্তি দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম, কালো একটি গোটা পুরনো কম্বল মানুষের অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁক দিয়ে মুখ দেখা যায়। কালো রেখাবহুল মুখ। চোখ দুটি যেন হলুদ বর্ণ। গুটিকয় অবশিষ্ট বড় বড় দাঁতের হাসি দেখতে পেলাম। পায়ের কাছে প্রায় ঝুঁকে পড়ে নমস্কার করতে এল।

চিনতে পারলাম। বললাম, ইন্দির যে। থাক থাক। কেমন আছ?

কালো লোল চামড়া হাতখানি কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে, ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, ভাল মন্দ বুঝি না। বেঁচে রয়েছি, তাই আছি। তুমি ফিরে এসেছ তাহলে?

—কেন, ফিরব না ভেবেছিলে নাকি?

—হুঁ গ' দাদা, শুনেছি, আর তুমি ফিরে আইসবে না। তুমি নিকি পুলিশ খুন করেছ, তাই গরমেণ্ট তুমাকে ফাঁসি দিবে।

অবাক হয়ে বললাম, পুলিশ খুন করেছি? কে বললে?

ইন্দির বলল, সবাই বুলছে। গড়াইয়ের 'অনিরুদ্' দাদাকে যেমন গুলি করে মেরেছে, তোমাকে তেমনি ফাঁসি দিয়ে মারবে, সবাই বুলছে।

হাসতে গেলাম। কিন্তু তেমন যেন প্রাণ খুলে হাসতে পারলাম না। এ কি শুধু জনতার গুজব যে, আমি পুলিশ হত্যা করেছি, আমার ফাঁসি হবে। জনসাধারণ তো বীরত্বের জয়গান করতেই ভালবাসে। দেশপ্রেমিকদের শ্রদ্ধা করতেই অভ্যস্ত। অথচ এই পুলিশ হত্যা ও ফাঁসির গুজবের পিছনে যেন তেমন সুরটা বাজে না।

ইন্দির আবার বলল, আর দ্যাখ ক্যানে দাদা, ছোটো গাঁ-খানি যেন তুমার নাম বিস্মরণ হয়ে যেইছে।

কথাটা নিষ্ঠুর চাবুকের মত ঘা দিল আমার মুখে। যেন সকল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, আমার মুখের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিতে চাইল। জানিনে, মুখের চেহারা কেমন হল। আমি হেসে উঠলাম। ঝিনুক আমার পিছনে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে। ইন্দিরের কথা ওর ওপরে কী ক্রিয়া করল, মুখের ছবিতে তা দেখতে ইচ্ছে করল। সাহস পেলাম না। কিন্তু জানি, ইন্দিরের মত মানুষেরা ও কথা বিশ্বাস করেছিল। আমার অস্তিত্বকে তারা সাড়ে তিন বছরের মধ্যে ভুলে গিয়েছিল প্রায়। কিছুটা হয়তো, অশিক্ষা কুসংস্কার থেকেই হয়েছিল। তবু যা তাদের বিশ্বাস, সে কথা বলতে বাধে না।

বললাম, চোখে দেখলে আবার হয়তো স্মরণ পড়বে ইন্দির।

ইন্দির বলল, নিচ্চয়। দেখলে কি গ', শুনেই সবাই বলতে নেগেছে। এই ধরে নিয়ে যাবার পর ছ মাস যে তুমার কুন খবর পাওয়া যায় নাই, তাইতেই অমন হল। তা' কি রকম কী বুঝলে?

অবাক হয়ে বললাম, কিসের কী বুঝব ইন্দির?

— এই তুমার গা, যি জন্যে গেছেলে? স্বাধীনতা গ' স্বাধীনতা।

এতবড় প্রশ্নটা আমাকে এ পর্যন্ত আর কেউ করেনি। সত্যিই তো! সাড়ে তিন বছর যে-মানুষ রাজনৈতিক কারণে জেল খেটে আসে, ইন্দিরের মত মানুষেরা তাকেই সে কথা জিজ্ঞেস করবে বৈ কি। আমার আত্মবিস্মৃত অবস্থাটাকে যেন খুঁচিয়ে সজাগ করে দিলে ইন্দির। পঁয়তাল্লিশ সালের শেষ দিকে কলকাতা ও বম্বের বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের কথা আমার মনে পড়ল। তখন জেলে আমরা খবরের কাগজ পড়তে পেতাম না। পূর্ণ স্বাধীনতা দাবীর ঘোষণার কথাও এখন যেন মনে পড়ল। তবু কতটুকুই বা ভেবেছি। কথা বলার যোগ্যতায় সত্যি মিথ্যে কিছু বলা যায় ইন্দিরকে। মুশকিল হ'চ্ছে ইন্দির রাজনীতি করে না, খবরের কাগজও পড়ে না। আমার কথাটাকে সে ধ্রুব বলে বিশ্বাস ক'রে নিতে পারে।

তাই একটু সংশয় রেখেই বললাম, খুব বেশি কিছু বুঝিনি ইন্দির। তবে, লোকের ধৈর্যের বাঁধ বোধহয় ভাঙছে। ইংরেজদের এবার পাত্‌তাড়ি গুটোতে হতে পারে।

ইন্দির 'স্বাধীনতা' বলতে কী বোঝে জানিনে। জানিনে, ইংরেজ, থাকায় সে যা আছে, না থাকলে কী হবে। কপালের কাছে হাত তুলে বলল দ্যাখ, অখন মা শালেশ্বরীর কী ইচ্ছা। তবে এত কষ্ট করেছ, তা কি বিফলে যাবে? তা যাবে না। এবার নিচ্চয় দেশখানি স্বাধীন হবে।

দেখলাম, ইন্দিরের হলদে কোল-ঢোকা চোখ দৃষ্টি সমুখের কোণ কিছুতে আবদ্ধ নেই। বহু দূরে, উদ্দীপ্ত চোখে যেন সে তার স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখছে। তখনও তার ঘাড় দুলছে।

দেশপ্রেমিক মুক্ত রাজবন্দী আমি। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, এই স্বপ্নে দেখা, ইন্দিরদের সেই স্বাধীন দেশটি কেমন। তার চোখ দুটি দেখে তো মনে হয় না যে এ দেশে ইংরেজরা থাকবে না, শুধু সেইটুকুই তার স্বপ্ন। আরও কিছু, আরও অনেক মহৎ, আশ্চর্য, বিচিত্র, সুন্দর। ইন্দিরের কপালের সর্পিল রেখা, মুখের লোল চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে যেন বহুকালের ধ্যানের একটি প্রসন্ন উত্তেজনা। সেই দেশের অনাগত মূর্তিকে যেন সে চেনে।

লজ্জা পাব না, সঙ্কুচিত হব না, দ্বিধা করব না বলতে, ইন্দিরের মত সেই দেশের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা যেন আমারও নেই। আর অবাক হয়ে ভাবলাম, যে-বিদেশীরা দেশকে অনেক অহঙ্কার নিয়ে শাসন করে, তারা কি এই ভারতবর্ষের দূর গ্রামের ইন্দিরদের কথা একটুও জানে? এই কালো উলঙ্গ অশিক্ষিত অসহায় মানুষদের স্বপ্নের কথা! যারা চিরকাল মাথা নুয়ে, কপালে হাত

ঠেকিয়ে তাদের সম্মান দেখিয়েছে, অথচ অশ্রদ্ধা অভিশাপ উপচে পড়েছে প্রাণ থেকে।

ইন্দিরের দিক থেকে চোখ ফেরাতে গিয়ে আর একবার যেন মনে মনে চমকে উঠে তার দিকে তাকালাম। আমার যে কষ্টের কথা সে বলেছে, সে মর্যাদার দাবী সহসা তুচ্ছ বোধ হল। আমি জেল খেটে যে কষ্ট পেয়েছি, ইন্দিরের জন্মগত অভিশাপে, সেই কষ্ট এই মানুষের সমাজে অনেক অপমানের গ্লানির মধ্যে ভোগ করেছে সে।

বললাম, ইন্দির, আমার জেল খাটায় এদেশের স্বাধীনতা আসবে না। যদি আসে, তোমাদের পাওয়ানার তাগিদেই আসবে।

ইন্দির কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, উ বাবা, তুমাদিগে না হলে, আমরা কে?

বৈঠকখানার কাছ থেকে ভবেনের গলা ভেসে এল, ইন্দিরদা, আজ ছেড়ে দে, পরে সময় পাবি। ইন্দির বলে উঠল, হুঁ হুঁ, অখন আস গা।

আমি চকিতে একবার পিছন ফিরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। ঝিনুক আমার দিকেই তাকিয়েছিল।

বৈঠকখানার এবং অনেকখানি চত্বর পেরিয়ে গেটের কাছে আসতে আসতেও দেখলাম, হারিকেনের আলোটা পিছন ছাড়েনি। কদমতলায় এসে ঝিনুক দাঁড়াল। ভবেন কয়েক পা আগে এগিয়ে চলেছে।

ফিরে বলতে হল, চলি ঝিনুক।

ঝিনুক বলল, আবার এস।

কোনো জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেলাম। আলো নিয়ে ঝিনুক দাঁড়িয়ে আছে বুঝলাম।

পশ্চিমা শুকনো ঠাণ্ডা বাতাস বেশ জোরেই বইছে। অন্ধকার যেন আরও গাঢ়। দূরে, তামাইয়ের ধারেই হয়তো শেয়ালের ডাক শোনা গেল একবার। কুকুর ডেকে উঠল কয়েকটা। শুকনো পাতা উড়ছে সড়সড় ক'রে। গোটা শালঘেরিতে যেন একটি মানুষও জেগে নেই আর।

টর্চলাইটের বোতাম টিপতেই শীতার্ত রাতের অন্ধকার যেন বিরক্ত হ'য়ে একটু পথ ছেড়ে দিল। অন্ধকার এত গভীর যে, সহজে তার নড়বার ইচ্ছে নেই। কিন্তু ভবেন তেমনি আগে আগে এগিয়েই চলেছে। কথা বলছে না। বিমর্ষ বিস্ময়ে, খানিকটা দুঃখে মনে মনে না হেসে পারলাম না। ভবেন কি সত্যি অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, এবং মনে মনে কিছু ভেবে নিল? তা হলে এত সহজে হাসতে হাসতে আসা যে আমার ব্যর্থ হল। যে অন্ধকারকে চাবুক কষে সরিয়ে রেখেছি, সে আর এক দিক দিয়ে এসে কি আমাকে কালিমা লেপে দিয়ে গেল।

ডাকলাম, ভব, দাঁড়া।

ও দাঁড়াল পিছন ফিরে। ঠিক আমার দিকে ওর চোখ নেই, অথচ আমারই দিকে যেন। এবং ঠোঁটের কোণে একটি দুর্বোধ হাসি। টর্চের আলোয় সহসা

চোখে পড়ল, ভবেনের হাতে একটি লোহার ডান্ডা। আবার ওর মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম না কিছু। শুধু অস্পষ্ট আলোয়, কোলে-ঢোকা লাল চোখ দুটি চকচক্ করছে।

জিজ্ঞেস করলাম, ওটা কী?

—লোহার রড।

—কী হবে?

—নিয়ে এলাম।

তাচ্ছিল্যভরে বলে, ভবেন আমার দিকে চোখ তুলল। বলল, ঝিনুক এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

সেটা আমিও আন্দাজ করেছিলাম। কেন, তা জানিনে। আমরা দুজনেই ফিরে তাকালাম। দূরে, ঝিনুকের হাতে একটি বিন্দুর মত হ্যারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছিল। খুবই অস্পষ্ট হলেও ঝিনুকের অবয়বের একটু ইশারাও ফুটে উঠেছিল। সহসা এক ঝলক তীক্ষ্ম শীতার্ত বাতাস আমাদের যেন আঁচড়ে দিল। কাছেই একটা তালগাছের শুকনো পাতা সড়সড়িয়ে উঠল। আমি ভবেনের দিকে তাকালাম। ভবেন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পিছন ফিরে আবার চলতে লাগল।

এবার আমরা ডাইনে মোড় নিলাম। ঝিনুককে আর দেখা যাবে না। পাড়াটাও ছেড়ে গেল আমাদের। সামনে খোলা বিস্তীর্ণ কাঁকর বালিমাটি প্রান্তর। মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত শাল আর তাল গাছ।

বললাম, এবার তুই যা ভব।

ভবেন বলল, চল্, এই ফাঁকা জায়গাটা পার ক'রে দিয়ে আসি।

ভবেন যেন কী ভাবছে, গলার স্বরটা ওর খুব স্বাভাবিক মনে হল না। আমি টর্চের আলোটা ফেলে ফেলেই চলছিলাম। সেই আলোয় মনে হচ্ছিল, ওর দৃষ্টি পথের দিকে নয়। শূন্য দৃষ্টি, শুধু আলো দেখে আন্দাজে চলছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁকা জায়গাটা পার হ'য়ে এসে, আমি দাঁড়ালাম। কাছেই আমাদের পাড়ার মুখের দেবদারু গাছটা পশ্চিমা বাতাসের দাপটে সা সা করছে।

বললাম, ভব, অনেক রাত হয়েছে, এবার তুই যা। তোর টর্চ আছে?

—না।

—তবে এইটা নিয়ে যা।

ভবেন বলল, ছেড়ে দেব তোকে?

—তবে কি এত রাতে তুই আমাকে বাড়ি অবধি পেঁছুবি নাকি?

ভবেন বলল, তাই দিয়ে আসি চল টোপন। আমিও আলো ছাড়া ফিরব না। কিছুদিন ধ'রে বাঘের উৎপাত গেছে, তামাইয়ের ওপারে শালবনে। এপারেও হানা দিয়েছে কয়েকবার। তাই ডান্ডাটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম।

চমকে উঠে বললাম, সে কি, একথা তো বলিস্নি। তুই বা তা হলে

একলা যাবি কেমন করে?

ভবেন বলল, আমি যেতে পারব, সে জন্য ভাবিস না। তোকে বাড়ি পর্যন্ত পেঁছে, তোরই আলো নিয়ে আমি ফিরব।

বলে সে ডাণ্ডাটা দেবদারু গাছের গোড়ায় রেখে বলল, ফেরবার সময় নিয়ে যাব, চল্।

উৎকণ্ঠায় বিমর্ষ হয়ে উঠলাম। পথ চলতে চলতেই বললাম, তেমন যদি জানতিস, তবে ইন্দিরকে সঙ্গে করে বেরুলেই হত।

ভবেন বলল, তার দরকার হবে না। রাত বিরেতে এ গাঁয়ে আমার চলা ফেরা অভ্যেস আছে। তুই অনেকদিন চলিসনি।

বাড়ির কাছাকাছি যখন এসেছি, তখন ভবেন তার একটি হাত তুলে দিল আমার কাঁধের ওপর। বুঝলাম না, ওর সেই হাতটি কাঁপছে কি না। আমি ফিরে দাঁড়ালাম। আমিও ওর কাঁধে হাত তুলে দিলাম। টর্চের মুখ মাটির দিকে। অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম, ওর কালো মুখ ও লাল চোখ দুটিতে কী একটা অসহায় ব্যাকুলতা যেন মাথা কুটছে।

বললাম, কিছু বলছিস ভব?

বুঝি রাত্রি বলেই ভবেনের গলা চুপি চুপি শোনাল। বলল, টোপন, যেন রেগে উঠিসনে, একটা কথা বলব।

বললাম, বল্।

ভবেন বলল, জেলে যাবার আগে যেমন উপীনকাকার বাড়ি যেতিস, তেমনি আমাদের বাড়ি যাস।

কী বলতে চায় ভবেন। আমি তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করলাম। নিজের দিকে ফিরে দেখলাম, সেখানে সব অনুভূতিটুকু কখন প্রশ্নহীন শূন্যতায় পেঁছেছে। কী বলব আমি সহসা ভেবে পেলাম না।

ভবেন আবার বলল, যাবি তো টোপন।

বললাম, ভব, যাব না একথা তো একবারও বলিনি। কিন্তু যা সত্য, তাকে এমন বেঁকেচুরে অনাসৃষ্টি করে লাভ কি? উপীনকাকার বাড়িতে যেমন যেতাম, তোর ওখানেও তেমন করে যাব, একথা বললে আমার যাওয়া হয় কেমন করে? সে কি আর সম্ভব। আমি তোর বাড়িতেই যাব ভব।

ভবেন চকিতে একবার আমার চোখের দিকে তাকাল। বলল, ও, বেশ। তবে তাই যাস্। কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলি নাই টোপন। সত্যকে একটুও বাঁকাচোরা করিনি। দে, টর্চটা দে, যাই। কাল আসব।

আলো নিয়ে ভবেন চলে যাচ্ছিল। আমার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন সবই এলোমেলো হয়ে একটা অর্থহীন আবর্তের জট পাকিয়ে গেল। ভবেন মিথ্যে বলেনি, সত্যকে একটুও বাঁকাচোরা করেনি, এ সব কথার মানে কী? আমি মনে করি, ভবেন ঝিনুক বিবাহিত দম্পতি। একদা ঝিনুকের একটিই মাত্র পরিচয় ছিল। সে উপীনকাকার মেয়ে। তখন আমি যে-ঝিনুকের

কাছে যেতাম, আজ সে-ঝিনুক নেই। এই তো সত্যি। এর মধ্যে আর কোন্ সত্য লুকিয়ে আছে, যাকে ভবেন মিথ্যে দিয়ে বাঁকিয়ে চুরিয়ে তোলেনি।

আমি ফিরে তাকালাম। আর অন্ধকারে ভবেনের সেই মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে সহসা একটি দুর্বোধ তীক্ষ্ন যন্ত্রণা অনুভব করলাম। আমি যেন দেখলাম, সর্বনাশের শেষ ধাপে মুখ গুঁজে পড়ে আছে একটা মানুষ। সেই মুহূর্তেই বোধহয় অর্থহীন, তবু আমার শূন্য মস্তিষ্কে অদ্ভুত দু-একটা কথা ঝিলিক হেনে গেল। আমি তাড়াতাড়ি ডাকলাম, ভব!

ভবেন দাঁড়াল। আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম, একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করব?

ভবেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বল্।

চকিতে একটা বাধা আমার জিভ আড়ষ্ট করে দিল। তবু জিজ্ঞেস করলাম, —তোদের এখনো ছেলেপিলে হয়নি কেন? ঝিনুকের দৈহিক—?

—কোন বাধা নাই টোপন। নগেন ডাক্তার বলেছে। মা জেদ করে একবার জেলা হাসপাতালের লেডী ডাক্তারকেও দেখিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু হয়নি।

ভবেনের মুখের ওপর অনেকগুলি রেখা গভীর হয়ে উঠল। সে আমার চোখের দিকেই তাকিয়েছিল। আমি যেন ঠিক বুঝতে পারলাম না, সে কী বলতে চাইল। তবু আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। ওর চোখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করল।

ভবেন মোটা গলায় থেমে থেমে আবার বলল, আর আমার কথাও জিজ্ঞেস করতে পারিস টোপন। আসলে তার কোন প্রয়োজন নাই। চলি—।

ও চলে গেল তাড়াতাড়ি।

আর আমি যেন দেখলাম, রাতারাতি যে-মাটি কেটে ভবেন ফুলের আশায় বাগান করেছিল, সে মাটি নয়, বালিয়াড়ির স্তূপ। সেখানে ফুল ফোটেনি, পাখী ডাকেনি। ভ্রমরটার গেছে পাখা গুটিয়ে। প্রজাপতিরা উড়ে এসে কোনো রংবাহার সৃষ্টি করেনি।

সেই বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে ভবেন কাঁটা ঝোপের মাঝখানে ভীত বিস্মিত ক্লান্ত চোখে যেন তাকিয়ে আছে।

আমিও যেন ভয় পেলাম। আমার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। শালঘেরির অরণ্য যেন আকাশ ছাড়াল। তারা চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে লাগল আমাকে। আমি তাদের কাউকে চিনি না। পৃথিবীর আদিম রহস্যের মত তারা ছায়া ফেলে ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল আমাকে ঘিরে।

মহাকালের যে সেতুর কাছে আমার আশ্রয় প্রার্থনা ছিল, সে কোথায় গেল।

মনে হল, আমি বুঝি শালঘেরিতে ফিরে আসিনি। এক মায়া-অরণ্যের অলৌকিক ভয়াল ছায়ার ঘেরাও-এ বন্দী হয়ে পড়েছি।

ফিরে এসে বন্ধ দরজায় ঘা দিতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। অন্ধকার হলেও, বুঝলাম কুসুম।

বললাম, কি রে কুসুম, ঘুমোসনি ?

কুসুম সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, না।

বললাম, তুই কি সন্ধ্যে থেকে দরজায় দাঁড়িয়ে আছিস্ নাকি ?

কুসুম বলল, তা কেন ? মনে হল, কারা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, তাই এসেছি দরজা খুলতে।

দালানের বারান্দার দিকে যেতে যেতে বললাম, পিশী ঘুমোচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

কৃতজ্ঞতার চেয়ে অস্বস্তি বেশি হল আমার কুসুমের জন্য। কিন্তু ও এত চুপচাপ কেন ? পিশীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে ? না কি ঘুম পেয়েছে। পাওয়াটাই স্বাভাবিক।

বললাম, যা শুয়ে পড়গে।

কুসুম বারান্দা থেকে দালানে গিয়ে ঢুকল। আমি কয়েক মুহূর্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ভবেন এখন মাঠের ওপরে নিশ্চয়। শীতার্ত ঝোড়ো বাতাস রাত্রিটাকে নখে নখে ছিঁড়ছে। একবার চকিতে মনে হল, দখিনপাড়ার অন্ধকারে এখনও কি সেই আলোর বিন্দুটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মুহূর্ত পরেই বিস্ময় সংশয় ও একটি বিচিত্র জিজ্ঞাসা আমাকে কাঁপিয়ে দিল।

দালানে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। ঘরের দিকে যেতে গিয়ে মনে হ'ল, দেওয়ালের আবছায়ায় যেন কেউ লেপটে রয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কে ?

—আমি।

—কুসুম ! কী করছিস ওখানে ?

—খোঁপার কাঁটাগুলো খুলে নিচ্ছি, নইলে বড় বেঁধে। জেঠি বিশ্বাস করতে চায় না।

ঘুমার্ত বলে মনে হল না কুসুমের গলা। বললাম, যা যা শুয়ে পড়গে, অনেক রাত হয়েছে। বাতিগুলো সব নিভিয়ে ফেলেছিস নাকি ?

—না, তোমার ঘরে কমান আছে।

আমি ঘরে গিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এল না অনেকক্ষণ। কখন এক সময় যেন শব্দ পেলাম, পিশীর ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার। কোন্ এক ছায়ালোক থেকে ফিরে এলাম যেন। উৎকর্ণ হলাম। আর কোনো শব্দ নেই। কুসুম বুঝি শুতে গেল এতক্ষণে। এতক্ষণ অন্ধকার দালানে ভূতের মত কী করছিল একলা একলা। মেয়েটা বড় অবাধ্য।

ঘুম ভেঙে চা পাবার আগেই গাঁয়ের কয়েকজন ছেলে এবং স্কুলের একজন মাস্টারমশাই এলেন? তাঁদের কাছে আমায় স্বীকার করতে হল, আজ খেলার মাঠে সম্বর্ধনা সভায় আমি যাব।

তারা চলে যাবার পর চা খাওয়ার সময় পিশী জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি এখন বার হবি টুপান?

—হ্যাঁ, পিশী। একবার উপীনকাকার বাড়ি যাব।

—তাহলে আজ দুপুরে আমার একটু কাজ আছে।

—কী কাজ পিশী।

—সীতানাথ যে সব কাগজপত্তর রেখে গেছে সেগুলোন তোকে দিতে লাগবে না?

সীতানাথ আমার বাবার নাম। কাগজপত্র মানে, বাবা তাঁর সঞ্চয়ের যে-সব বিলি ব্যবস্থা করে গেছেন, তারই হিসেব-নিকেশ। বিলি ব্যবস্থা বলা ভুল। আমার জন্য কী সঞ্চয় তিনি রেখে গেছেন, তারই হিসেব আসলে। কী আছে না আছে, আমি কিছুই জানি না। জমির একটি মোটামুটি হিসেব জানি। জেলে বসে চিঠিপত্রে যতটুকু জানতে পেরেছি, দু-একটি মামলা মোকদ্দমা এখনো বোধহয় ঝুলছে। কিংবা ডিসমিস্‌ হয়ে গেছে এর মধ্যে। এখন অঘোর জ্যাঠাই প্রায় সব দেখাশোনা করেন। এবার সব দায়িত্ব হয়তো তিনি আমার ওপর চাপাতে চাইবেন।

কুসুম রান্নাঘর থেকে জিজ্ঞেস করল, কাল কেমন খেলে টোপনদা?

বললাম, খুব ভাল।

কিন্তু আশ্চর্য। পিশী আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

জামাকাপড় পরে বেরুতে যাচ্ছি। দেখলাম, কুসুম বারান্দায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। কুসুমের বড় বড় চোখ দুটিতে এখনো শিশুর বিস্ময়। কিন্তু করুণ।

জিজ্ঞেস করলাম, কি রে?

কুসুম হেসে চুপি চুপি বলল, আজ একটু চা খেয়েছি।

—ও, তাই এখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ? কিন্তু অমন খালি গায়ে রয়েছিস্‌ কেন শীতের মধ্যে? জামা নেই?

—আছে। ধুয়ে দিয়েছি।

তার মানে একটিই আছে। পিশী বোধহয় প্রাণ ধরে, আমারই ফিরে আসার ভয়ে দিতে পারেননি। এখনও পারবেন না হয়তো।

আমি বেরিয়ে গেলাম। পুবপাড়ায় অনেকের সঙ্গে দেখা হল উপীনকাকার বাড়ি যাবার পথে। সকলের সঙ্গেই কথা বলতে হল।

সামনেই তামাইয়ের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আমার মাথার উপরে পুবপাড়ার সেই হেঁতাল গাছ। জলা বিল অঞ্চলের হেঁতাল গাছটি কী করে এই পাথুরে মাটিতে জীবনধারণ করে বেঁচে রয়েছে জানিনে। সাধারণত উঁচু দেশের কঠিন মৃত্তিকায় এ গাছ দেখা যায় না। গ্রামের লোকে বলে, মা-মনসার থান। দেবী এখানে অধিষ্ঠিত আছেন। আছেন কিনা, সে খবর জানিনে। তবে ছোট একটি পাথর আছে। কেউ কেউ জল দেয়। সাপে কামড়ালে অব্যর্থ

মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এই হেঁতাল গাছের গোড়ায় তাকে আনতে দেখেছি। কিন্তু কোনোদিন মৃত্যুরোধ হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সাপ ধরা যাদের কাজ, সেই সাপুড়েরা হেঁতাল গাছটিকে নমস্কার না করে যায় না। শুধু শালঘেরির সাপুড়ে নয়, বাইরে থেকে যারা আসে, তারাও। অনেক সময় দেখেছি, হেঁতালের সরু সরু ডাল কেটে নিয়ে যায় সাপুড়ে বেদেরা। বলে, এ ডাল হাতে থাকলে, যত বিষাক্ত ভয়ংকর সাপই হোক, দূরে পালিয়ে যাবে। অতএব, সাপুড়ে মাত্রেই হেঁতালের ডাল কাছে রাখে। তা ছাড়া হেঁতালের ফুলের গর্ভে যে ছোট একটি ফল ধরে, তাকে সাপুড়েরা বলে শিবফল। ফলটির বিশেষত্ব হল, দেখায় যেন একটি ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গের মত। সাপুড়েরা সেই ফুলের বড় কাঙাল। কেন জানিনে।

আশে পাশে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শিব-মন্দির। ছোট একটি কাঁকুরে মাঠ পেরোলেই উপীনকাকার বাড়ি। এই হেঁতালের তলায় দাঁড়িয়ে তামাইয়ের ওপারে শালবনের আকাশে অনেক সূর্য ওঠা, চাঁদ ওঠা দেখেছি। তখন আমার মন জুড়ে, মহাকালের ধ্বনিতে শুধু রক্ত ছিটিয়ে দেবার কলকলোচ্ছল আমন্ত্রণের বাণী বেজেছে! অথিরবিজুরি ঝলক আমার প্রাণের শিরায় উপশিরায়। গোপন রাখতে পারি কি না পারি, সেই আনন্দে, সেই ভয়ে, আমার সব কথাকে আমি এক স্ফুটোন্মুখ ফুলের পাপড়িতে চেপে দিয়েছি।

তখন ওই শালবনের দুর্নিরীক্ষ্য জটলায় অরণ্যের কি মন্ত্রণাসভা বসেছিল, আমি জানিনে।

কিন্তু এটা জানি, আমার চোখের তৃষ্ণা বুক অবধি গিয়ে পৌঁছেছিল তখন। আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে আমার চোখ ফেরাতে সময় চলে যেত। বুকের মধ্যে দারুণ দহন, পরম তৃষ্ণা, আমার স্বাভাবিক আচরণকে বদলিয়ে দিত। খেয়াল করিনি, উপীনকাকা কিংবা কাকীমার চোখে কখনও অজান্তে বে-আবরু হয়ে পড়েছি কি না। যদিও তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন্ন যাত্রার কাল পর্যন্ত আমার প্রাণের আবরু রেখেছি ঢাকা খুলে বারে বারে দাঁড়িয়েছি ঝিনুকের সামনে। তখন যেন এক অদৃশ্য ঘর-কাটা দাগের মধ্যে ঘুরে মরছি আমি আর ঝিনুক। অচেনা সুরে সুরে, ভাগ্যের কড়ি চালায়, কাছে আসি, দূরে যাই, চোখে চোখে দেখি। কিন্তু সেই দাগ কাটা ঘর আমাদের মনে মনে বনত।

তারপরেই তো হেঁতাল তলার আহ্বান পেলাম একদিন। সন্ধ্যাবেলা, বোধ হয় চৈত্র মাস। উপীনকাকা বাইরে বেরিয়েছিলেন একটু কাজে। কাকীমা রান্নাঘরে। আমি ঠাকুমার কাছে বসেছিলাম দাওয়ায়। ঝিনুক শোবার ঘর থেকে রান্নাঘর, রান্নাঘর থেকে উঠোনে, কাজে কিংবা অকাজেই ঘুরে ফিরছিল। ও চকিত হয়ে বারে বারে ঝিনুককেই খুঁজে ফিরছিল আমার চোখ। অথচ ঝিনুক যেন আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না। সে যেন ঘরকন্নাতেই ব্যস্ত হয়ে ছিল।

সহসা এক সময় আমার চোখে পড়েছিল, তামাইয়ের ওপারে শালবনের মাথায় চাঁদ। জ্যোৎস্না পড়েছে উঠোনে। আর উঠোনের ওপারে বাইরের কোল আঁধারে যেন কে দাঁড়িয়ে। আমি চোখ বিস্ফারিত করে দেখবার চেষ্টা করলাম, কে?

বুঝে ওঠবার আগেই, দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল সেই মূর্তি। আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন রক্ত চলকে উঠল। কী মনে হল, জানিনে। মুহূর্তে আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঠাকমার হয়তো বসে বসে চোখ বুজে এসেছিল। আমি নিঃশব্দ পায়ে বাড়ির বাইরে চলে গেলাম। চিনতে ভুল করিনি। দেখলাম, ঝিনুক মন্থর পায়ে হেঁতাল তলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখলাম, হেঁতালের ছায়ান্ধকারে ঝিনুক অদৃশ্য হয়ে গেল। স্থির হয়ে, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। আমি সেইদিকেই এগিয়ে গেলাম পায়ে পায়ে। কাছে গিয়ে দেখলাম, হেঁতালের গায়ে হেলান দিয়ে, ঝিনুক শালবনের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার দিকে সে ফিরে তাকাল না। ঠোঁট দুটি যেন আবহমানকাল ধরে অনড়, আবদ্ধ। চুল বাঁধা, গা ধোয়া পরিচ্ছন্নতার ওপরে, জ্যোৎস্না ও হেঁতালের ছায়ায় ঝিনুককে যেন কেমন সুদূর অবাস্তব মনে হল সহসা।

একটা তীব্র আবেগে আমার স্বর কেঁপে গেল। আমি ডাকলাম, ঝিনুক।

ঝিনুক চকিতে একবার চোখের পাতা তুলে আমার দিকে দেখল। মনে হল, একবার যেন ওর ঠোঁটের কোণ কাঁপল। আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর ঝিনুক নিজেই সহসা আমার একটি হাত ধরল। আমি দু-হাত দিয়ে ঝিনুকের সেই হাতটি তুলে নিলাম। কিন্তু স্থির হতে পারলাম না। হাতটি আমার বুকের ওপর টেনে নিলাম।

ঝিনুক আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। আমি ডাকতে চাইলাম। গলায় স্বর ফুটল না। ভাবলাম ঝিনুক কিছু বলবে। কিন্তু কিছুই বলল না ও। কেবল ওর একটি হাতের আঙুল দিয়ে আমার গাল স্পর্শ করল। আমি ওকে দু-হাতে বেষ্টন করলাম।

হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠলাম। প্রায় দিগম্বর, কালো কুচকুচে একটি বৃদ্ধ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমি যেন শিউরে উঠলাম। একটা সাপ যেন আমার সারা গায়ে কিলবিলিয়ে উঠল। বললাম, কে?

—এজ্ঞে, আমি জগা বাউরি। আপনাকে চিনতে লারলাম।

যেন সেই মুহূর্তেই আবিষ্কার করলাম, আমি হেঁতাল তলায় দাঁড়িয়ে। স্বপ্নাচ্ছন্নতা কেটে গেল। উপীনকাকার বাড়ি যেতে হবে আমাকে। কিন্তু জগা বাউরিকে আমিও চিনতেপারলাম না। বললাম, চিনবে না, নতুন এসেছি।

—অ। তাই মনে হল বটে, শালবেরিতে নতুন মুখ। কুথা যাবেন ?

—কাছেই।

—অ। আচ্ছা, নমস্কার বাবু।

চলে গেল সে।

আর শালবনের দিকে তাকিয়ে সহসা মনে হল, আজ সেই নিমন্ত্রণের ডাক নেই। আমার চোখের কাজল কে মুছিয়ে দিয়ে গেছে। ঘুম ভাঙা চমকে দেখছি, এ অরণ্য আমার সেই সৃষ্টি নয়। ও আমার খেলার ঘরের সাধ মেটাতে প্রান্তর জুড়ে নেই। শিকড় ওর অনেক গভীরে। অনেক বয়সের আদিম রেখা ও জটিলতার রহস্য ওর অন্ধকারে। যা আমার দৃষ্টি-সীমার বাইরে।

আজ তবু শালবনের ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে, এই হেঁতাল গাছের তলায় আমার রক্তের কপাটে ধাক্কা শুনি। সামনেই ওই বিস্তীর্ণ পাথুরে প্রান্তরে আমার কথারা সব বুঝি বীজ হয়েছিল। সুর্যোদয়ে যেন বিষাক্ত ফল আর কাঁটা ঝোপে অংকুরিত হয়ে উঠছে।

আমি ফিরে গেলাম হেঁতালগাছের তলা থেকে। উপীনকাকার বাড়ির দরজা খোলা। ঢুকেই দেখলাম, মাটির দাওয়ায়, চৌকির ওপরে গালে হাত দিয়ে রমু বই পড়ছে। বছর চোদ্দ বয়স। সে অমুর পরেই। উপীনকাকার মা বুড়ি ঠাকমা বসে আছেন উঠোনের এক পাশে রোদে। চোখে দেখতে পান না ভাল। কোলের ওপর একটি লাঠি। সামনে বড়ি শুকোচ্ছে। ঠাকমার উদ্দেশ্য, রোদ পোহানো এবং বড়ি পাহারা দেওয়া।

রমু আমার দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। চোখে ওর চেনা অচেনার আলোছায়া। তারপরেই তড়াং করে লাফিয়ে উঠে বলল, টোপনদা না ?

বললাম, চিনতে পারছিস ?

শিখিয়ে দিতে হয় না। রমু এসে পায়ে হাত দিল। কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ও অমুর মত ঠিক শান্ত প্রকৃতির নয়। হাতে পায়েও অমুর চেয়ে শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে। দু-চোখে চঞ্চল দৃষ্টি।

বলল, জানি, আপনি এসেছেন। আজ তো আপনি বক্তৃতা করবেন মাঠে।

বললাম, বক্তৃতা করব না। বাড়ি বাড়ি যেতে পারিনে, তাই সকলের সঙ্গে মাঠেই দেখা করব।

রমু বলল, তা কেন ? আজ যে মিটিং হবে।

হেসে বললাম, ওই হল আর কি।

ঠাকমা ইতিমধ্যে বার দুয়েক কে, কে, করেছেন। ফিরে বললাম, আমি টোপন, ঠাকমা।

—টোপন ? উত্তরপাড়ার সীতুর ছেলে টোপান ?

সীতু মানে সীতানাথ, আমার বাবা।

ঠাকমার পায়ে হাত দিয়ে বললাম, হ্যাঁ ঠাকমা, চিনতে পারছ না?

ঠাকমা মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ছাড়া পেয়েছিস্? যমেরা ছেড়েছে তোকে? জয় মা কালী, জয় মা শালেশ্বরী। ফিরে এসেছিস ভাই? সীতুটা থাকতে থাকতে যদি আসতিস। বউমা, অ বউ মা।

রমুও ততক্ষণ কাকীমাকে ডাকতে গেছে। আমি নিজেই ঘরের দিকে গেলাম। কাকীমা বেরিয়ে আসছিলেন। শাদা থানটা যেন আমার দু-চোখে ছুঁচের মত বিঁধল। একেবারে নিরাভরণা কাকীমা। আমাকে দেখে তাঁর খুব উচ্ছ্বাস নেই। বিরূপতাও নেই।

বললেন, এসেছিস টোপন, আয়।

আমি প্রণাম করলাম। মাথায় হাত দিয়ে, আঙুলটি ঠোঁটে ছোঁয়ালেন কাকীমা। আমার হাত ধরে চৌকিতে বসিয়ে দিয়ে বললেন, বস।

কাকীমার রং কালো হয়ে গেছে। ঘোমটার পাশ থেকে বেরিয়ে-পড়া চুলে শাদার লক্ষণ টের পাওয়া যায় না। তবে জট পাকিয়েছে। বললেন ঝিনুকের বাবা—

—শুনেছি কাকীমা। জেলেই শুনেছি। উপীনকাকা—

কথার মাঝখানেই কাকীমা বলে উঠলেন, ওই, বলে কে বাবা? যিনি চলে যান সংসার থেকে, তিনি মনে করেন, খুব একটা কাজের কাজ করেছি তা মনে করুন, আমি আর কি করব।

আমার বাকরুদ্ধ হল। মৃত স্বামীর প্রতি এমন অভিমান আমি আর কোনোদিন দেখিনি। চুপ করে রইলাম।

কাকীমা জেবড়ে বসলেন মাটিতে। জেলে থাকা, শরীর-গতিকের কথা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। চা খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু রান্নার জন্যে কাকীমাকে উঠতে হবে, সেই ভেবে বললাম, খাব না।

তবু তিনি নিরস্ত হলেন না। রমুকে বললেন একটু জল গরম করতে। বুঝলাম, রমু কাকীমাকে রান্নাবান্নায়ও সাহায্য করে।

কাকীমা হঠাৎ বললেন, ভবেন ঝিনুককে বিয়ে করেছে, জানিস টোপন?

—জানি কাকীমা।

—তোর কাকার কিন্তু বাবা খুবই অস্বস্তি ছিল। তা উনি কী করবেন মেয়েও মত দিল। মেয়ের মত ছাড়া কোনোদিন তো উনি কিছু করতে চাননি।

বলবার আগেই আমি আন্দাজ করেছিলাম, ঝিনুকের আপত্তি উপেক্ষা করে, কোনো কাজ তাকে দিয়ে করানো সম্ভব নয়। উপীনকাকার দ্বারা তো একেবারেই তা অসম্ভব ছিল। কিন্তু কাকীমার মুখ থেকে সোজাসুজি কথাটা শুনে, আবার নতুন করে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্ধ কষ্ট ও বিস্ময়ে হঠাৎ কথা বলতে পারলাম না। কী ভাবে সম্মতি দিয়েছিল ঝিনুক? কথা বলে, না, নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে? তার মনের মধ্যে কী ছিল তখন? অতীতের

সেই দিনগুলি, সেই বছরগুলি, ওর মনের কোথায়, কী ভাবে অবস্থান করছিল ?

নিঃশব্দ প্রশ্নগুলি যেন অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেতে লাগল। একটা কঠিন পাথরে গিয়ে আঘাত খেয়ে, মুখ থুবড়ে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃতের মত নিশ্চুপ হয়ে গেল।

তারপরেই কাল রাত্রের সেই ঝিনুক, ঝিনুক আর ভবেনের কথা মনে পড়ল। আমার দু-চোখের সামনে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি বললাম, ভালই হয়েছে কাকীমা।

—তা জানি না বাবা। সংসারে কত কি ঘটে। সব কি বুঝি, না জানি ? কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল সব তখন। আমি বলেছিলাম, 'একি শুনছি ঝিনুক। ভবেন নাকি তোকে বিয়ে করতে চায় ? তোর বাবাও নাকি রাজী হয়ে গেছে ?' বললে, 'হ্যাঁ।' আমি বললাম, 'কি রকম ?' ঝিনুক বললে, 'তা জানি না মা। বাবা বললে, "একজনের কোনো খবর নেই, কি করব, বুঝি না। তোর যদি অমত না থাকে—" আমি বললাম, তোমার যা ইচ্ছা। তা ছাড়া আমার আর কী হবে মা ?' বোঝ, আমি কি তা বলেছি ? কি জানি বাবা।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, এসব থাক কাকীমা। ওরা দুজনেই আমার আপন। কাল রাতে ঝিনুকের বাড়িতে খেয়েও এসেছি। আপনি উপীন-কাকার কথা বলুন। কী হয়েছিল ওঁর ?

কাকীমা বললেন, সেই তো বলছি টোপন। আমি কি কিছু বুঝি ? গত বছর এমন সময়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগল। বুকে সর্দি বসে গেল। এক সপ্তাহের মধ্যেই, দৌড়, দৌড়, দে দৌড় করে পালাল। কি বুঝব, কি জানব, বল্। এদের সবই এরকম।

এদের বলতে বুঝি কাকীমা ঝিনুকের কথাও বললেন। যাদের কোনো কিছুই তিনি বুঝতে পারেননি। কারণ, কোন ব্যাপারটাই কাকীমাকে নোটিশ দিয়ে আসেনি। যাদের কাছে এসেছিল, তারাই কি নোটিশ পেয়েছিল ? কে জানে!

রমু ডাকল, মা, জল গরম করেছি।

—যাই।

কাকীমা উঠে বললেন, বস টোপন, চা করে নিয়ে আসি।

বলে চলে গেলেন। আমি ঘরের দিকে চোখ তুললাম। অবস্থা এমন কিছু ভাল ছিল না উপীনকাকার। কিন্তু রুচি ছিল। দুটি আলমারি ভরতি বই। টেবিলেও থরে থরে বই সাজানো। মাটির দেয়ালে গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ আর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছবি। তামাই সভ্যতা আবিষ্কারের বীজ উপীনকাকাই প্রথম আমার মধ্যে রোপণ করেছিলেন।

এ ঘর একসময়ে ঝিনুকের খবরদারীতেই থাকত। যদিও ও খুব

গোছালো নয়। তবু উপীনকাকার প্রয়োজনে যখন যেটার খোঁজ পড়ত, ঝিনুকই এগিয়ে দিতে পারত।

উঠে টেবিলের কাছে যেতে গিয়ে, পাশের ঘরের দিকে নজর পড়ল। ওটা ঝিনুকের এক্তিয়ারে ছিল। ওই ঘরটিই বড়। কাকীমা ঝিনুকদের নিয়ে ও-ঘরে শুতেন। উপীনকাকা এ ঘরে। উপীনকাকার ঘরের সংলগ্ন, বারান্দার পাশের ঘরটি ঠাকমার। বসে আড্ডা দেবার জায়গা ছিল, মাটির বারান্দায় চৌকির ওপর। যেটা আজও ঠিক পাতা আছে।

আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। অধিকাংশ দেশী-বিদেশী ইতিহাসের বই। কিছু নৃ-প্রত্ন-স্থপতি বিদ্যার বইও আছে।

কাকীমা রান্নাঘর থেকে বললেন, মিষ্টি খেয়ে তো চা ভাল লাগবে না টোপন। ঝাল দিয়ে মুড়ি খাবি ?

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, বাড়ি থেকে এইমাত্র খেয়ে এসেছি কাকীমা। আজ একটু চা দিন শুধু।

চা নিয়ে এসে আবার বসলেন। আমি অমু-রমুর পড়াশোনার কথা জিজ্ঞেস করলাম। চা খাওয়ার পর কাকীমা হঠাৎ বললেন, টোপন, ফিরে যখন এসেছিস, একটা কাজ করিস তো বাবা।

—বলুন।

—মাঝে মাঝে এসে, আলমারির বইগুলোন একটু পড়িস। ওগুলোন আলমারিতে যে একেবারে দম চাপা হয়ে রইল।

যেন উপীনকাকাকেই সেখানে রুদ্ধ থাকতে দেখেন কাকীমা। প্রয়োজনে কেউ এসে একটু মুক্তি দিলে তিনিও বোধহয় একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

বললাম, আসব কাকীমা। আমার নিজের দরকারেই আসব।

কিন্তু এ কাকীমা সে কাকীমা নন। সেই শান্ত পরিশ্রমী, উপীনকাকার আওতার বাতাসে তাল দিয়ে ফেরা চিরকালের লজ্জাবতী প্রেমিকা নন। ইনি উদাসিনী, বিবাগিণী। তবু রুদ্ধ অভিমান বয়ে বেড়াচ্ছেন যেন।

আমার ভবিষ্যৎ কাজের কথা শুনে বললেন কাকীমা, উনি-ই তোর মাথাটা খারাপ করে গেছেন। এখন কি খালি শাবল কোদাল নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরবি নাকি ?

বললাম, উপীনকাকার সে ইচ্ছে ছিল। আমার নিজেরও সেই ইচ্ছে।

এমন সময় বাইরে ইন্দিরের গলা শোনা গেল, কখন আসব তা'লে বড় বউদিদি ?

ঝিনুকের গলা শোনা গেল, দুপুরে খেয়ে দেয়ে এস।

তারপরেই উঠোনে ঠাকমার গলা শোনা গেল, ঝিনু কি এলি নাকি লো ?

—হ্যাঁ ঠাকমা। তোমার কোমর ব্যথা কেমন আছে ?

আর ভাই কোমর ব্যথা। খালি কনকনাচ্ছে। ভ:বেন কোথা ?

—এই স্কুলে বেরিয়ে গেল।

বোঝা যায়, ঝিনুক প্রায়ই আসে। প্রায়ই আসার বাধা যেটুকু, সেটুকুও দিল্লী গিয়ে বসে আছে। শাশুড়ি থাকলে বাড়ির বউয়ের যখন তখন বাপের বাড়ি আসা চলে না। ভবেনের দিক থেকে কোনো প্রশ্নই নেই নিশ্চয়।

ঠাকমা বললেন, ঘরে দেখগে যা আজ কে এসেছে। নতুন মানুষ এসেছে বাড়িতে।

তার জবাবে কোনো প্রশ্ন শোনা গেল না ঝিনুকের গলায়। কয়েকটা মুহূর্ত যেন মূর্ছাপ্রাপ্ত নিঝুমতায় কেটে গেল।

কিন্তু আজ এমন সময়েই ঠিক এল ঝিনুক? এ কি শুধু দৈবের যোগাযোগ? কাকীমাও কান পেতে ছিলেন বাইরের কথাবার্তায়।

ঝিনুক আসায় যেন কোথায় একটি আপত্তির ইঙ্গিত পাওয়া গেল কাকীমার উৎকর্ণ মুখের ভাবে। তিনি ডাকলেন, ঝিনুক!

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার ডাকলেন, ও ঝিনুক!

ঠিক পাশের ঘর থেকেই ঝিনুকের গলা পাওয়া গেল, কী বলছ মা।

ঝিনুক রান্নাঘরের পাশ দিয়ে, অন্য দরজা দিয়ে এসে পাশের ঘরে ঢুকেছে।

কাকীমা বললেন, আবার এলি কি করতে শুধু শুধু?

ঝিনুকের কোনো জবাব নেই।

কাকীমা আমার দিকে ফিরে বললেন, দেখ দিকি টোপন, ওর শাশুড়ি এরকম বাপের বাড়ি আসা পছন্দ করে না, তবু আসবে। সে এখানে না থাকলে কী হবে, দিল্লীতে বসে সব সংবাদ পায়। ভাবে, মা-ই মেয়েকে ডেকে ডেকে পাঠায়। এ বাড়িতে আর আমি কি করতে ডাকব। বাপ থাকতে আসতিস, সে একটা কথা ছিল। আমার কাছে আর এসে কি হবে।

আশ্চর্য! কাকীমা আগে এত কথা বলতেন না। আর এখন যা-ই বলেন, সব কথার নদী উপনদী শেষ পর্যন্ত একই সাগরে গিয়ে পড়ে। উপীনকাকা প্রসঙ্গ ছাড়া কথা শেষ হয় না।

আর কিনুককেও আসতে বারণ যতটা শ্বশুরবাড়ির আপত্তিতে, ততটা নিজের জন্য নয়। আসলে সেটাও তাঁর মান অভিমানের বিষয়।

এ বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই। কিন্তু আমি বুঝি নির্লজ্জ। যেমন আমার ছিল দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন, চিররহস্যের দরজায় মাথা নত করে দাঁড়িয়ে, আমার সেই মনে রক্তধারা সহসা নাচের ছন্দ পেল। আশ্চর্য, সব যেন এমনি অবুঝ। সে নাচে যে শুধু ত্রাসের কলরোল! মনে হল, পুবপাড়ার আকাশের রং গেল বদলে। তবু তামাইয়ের ওপারে, এখন এই প্রাক্ দুপুরের স্তব্ধ শালবীথির ছায়া যেন হঠাৎ ডাক দিয়ে উঠল আমাকে। স্তব্ধ প্রাণ উঠল থরথরিয়ে। কিন্তু তাতে সেই হাসির ঝঙ্কার যে বাজে না। মরণ যেন চুপি চুপি, নিঃশব্দে ফিরছে সেখানে। পরাজয় আর অপমানের গ্লানি এখুনি গ্রাস করবে আমাকে। পালাই, পালিয়ে যাই।

আমি বিদায় নিয়ে উঠতে চাইলাম। পারলাম না। ঝিনুক এসে এ ঘরে ঢুকল। এসে দাঁড়াল বইয়ের আলমারির কাছে। সহজভাবেই জিজ্ঞেস করল, কখন এলে টোপনদা।

বললাম, এই খানিকক্ষণ আগে।

স্নান করেনি ঝিনুক। কাল রাতের খোঁপার বাঁধন এখন বেণী হয়ে লুটোচ্ছে। শুধু কালকের শাড়িটি বদলে একটি লালপাড় শাদা শাড়ি পরে এসেছে। জামাটিও শাদা। আলমারির কাছে ওর ছায়া প'ড়ে ঘরের রংও যেন একটু শাদা দেখাচ্ছে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ভব কাল ঠিকমত বাড়ি ফিরেছিল?

ঝিনুক বলল, হ্যাঁ।

আমিই আবার কাকীমার দিকে ফিরে বললাম, ওপারের শালবনে নাকি বাঘের উৎপাত হচ্ছে। এপারেও পা বাড়িয়েছিল। কাল তাই ভব একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে বেরিয়েছিল।

কাকীমা বললেন, হ্যাঁ, বাঘ শালঘেরিতেও কয়েক দিন ঢুকেছিল শুনেছি। শালেশ্বরীতলার ওখানে মুচীপাড়ায় হামলা করে গেছে। তোদের পাড়াতেও তো ঢুকেছিল, না ঝিনুক?

ঝিনুক বলল, হ্যাঁ। কিন্তু সে তো অনেকদিন হল। আর তো কিছু শুনিনি।

আমি বললাম, তবু সাবধান থাকা উচিত। একবার যখন হামলা করে গেছে, খিদে পেলে আবার আসতে কতক্ষণ।

ঝিনুক বলল, তা বটে, বিশ্বাস নেই। কিন্তু লোহার ডাণ্ডাটা ও কখন নিয়েছিল, দেখতে পাইনি তো।

কাকীমা উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, চান করে এসেছিস নাকি ঝিনুক?

—না।

—কথা বল্ টোপনের সঙ্গে। তারপরে চান করতে যাবি। জেলেপাড়ার বউটা আজ আর একটু মাছ দিয়ে গেল না এখনো। কী দিয়ে যে খাবি।

বলতে বলতে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ডাকলেন, রমু, ও রমু।

ঝিনুক বলল, রমু যে স্কুলে চলে গেল এখুনি। ওর সঙ্গে আমার পথে দেখা হয়েছে।

—চলে গেল? ধান বেচার টাকাগুলোন আটকে রেখে দিল বিশু। ওর স্কুলের মাইনে দেয়া হল না আজ। ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করছিল সকাল থেকে।

কাকীমা চুপ করলেন। বোধহয় রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ঝিনুক আলমারির দিক থেকে মুখ ফেরাল। কোনো ভূমিকা না করেই বলল, তুমি আজ এখানে আসতে পার, সেই ভেবেই এসেছি টোপনদা।

কখনও কখনও সত্যি কথা সোজা করে বললে চমক লাগে। মনে হয়, তাতে সত্যের মর্যাদা যতটুকু থাকে, তার থেকে বেশি দুর্বিনয় বে-আবরু হয়ে

পড়ে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

—আসতে নেই?

—প্রায়ই তো সংসার ফেলে চলে আস শুনছি।

ঝিনুক চুপ করে রইল। ওর মুখ কোনোদিনই ভাবলেশহীন নয়। কিন্তু ভাব চাপতে পারে খুব। দেখলাম, মুখ গম্ভীর হচ্ছে ক্রমেই। মুখের ছায়ার সঙ্গে তাল রেখেই যেন কানের সোনার ফুলে রক্তাভ পাথরে দ্যুতি আরও বেশি ঝলকাচ্ছে। ওর দেহের অনাবৃত অংশে সেই রক্তমৃত্তিকায় চলকে যাওয়া রোদের বেলা বাড়ছে যেন। তাতে চোখ রাখা যায় না।

ঝিনুক বলল, কাল রাতে দুই বন্ধুতে কী কথা হল?

আমি বললাম, বন্ধুরা যেমন বলে। অর্থহীন, অনেক কথা।

হেসে হাল্‌কাভাবেই বললাম আমি। কিন্তু ঝিনুকের গাম্ভীর্য তাতে টললো না। বলল, শুনতে পারি একটু?

ঝিনুকের মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু সন্দেহ হল, গতকাল রাত্রে ওর সঙ্গে ভবেনের কিছু কথা হয়ে থাকবে বা। অথচ আমি তো এ সবের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাইনি। ভিতরে ভিতরে একটি দ্বিধাযুক্ত পীড়া অনুভূত হলেও, প্রায় হেসেই জিজ্ঞেস করলাম, কেন, ভব কিছু বলেছে নাকি?

—না। তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

—কোন্ বিষয়ে?

ঝিনুক চোখ তুলল। সেই চোখে অবিশ্বাসের ছায়া। বলল, ভেঙে বলতে হবে?

হয়তো মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়লাম। তাই মনের দ্বিধা এবং পীড়া আমাকে রুষ্ট ও বিমুখ করে তুলল। আমি শক্ত হবার চেষ্টা করলাম। বললাম, যে-কথা বলাবলির কোন মানে হয় না, তাই নিয়ে আর আলোচনা করতে আমার ইচ্ছে হয় না ঝিনুক।

—কী তোমার ইচ্ছে হয় টোপনদা।

বিচিত্র প্রশ্ন। কী আমার ইচ্ছে হয়, তা কি সব নিজেই জানি। যদি জানতে পারি, তা কি ঝিনুককে বলা যায়?

বললাম, ইচ্ছে হয়, তোমাকে আর ভবেনকে সুখী দেখতে।

—যদি তা না দেখতে পাও?

—তাহলে কষ্ট পাব। কারণ, ভবেনের তো কোনো দোষ নেই।

—আমার দোষ আছে, এই তো?

—না, তোমারই বা দোষ কী। দোষ কারুরই নেই।

ঝিনুক ওর সেই টানা চোখের দূরবিসারী কটাক্ষচ্ছটায় আমার প্রতি রন্ধ্র খুঁজে দেখতে লাগল পুরনো দিনের মত। ওর চেনা ঠোঁটে সেই চেনা হাসিটি দেখতে পেলাম, যে আমার সকল অন্ধকারের মধ্যে দূর আকাশের নিঃশব্দ হাউয়ের মত জ্বলে উঠেছে।

বলল, টোপনদা, জেলে বসে একটি কাজ ভাল শিখেছ।

—কী?

—মনে কুলুপকাটি আঁটতে শিখেছ খুব।

ঠোঁটের ডগায় তীক্ষ্ন তিক্ত বিদ্রুপ উপচে পড়তে চাইল, আমার এই হাট করে খোলা মনে আমি কুলুপ আঁটিনি। যে এঁটেছে সে-ই জানে, আমার অজান্তে সে এঁটে দিয়ে গেছে। চাবির খোঁজটুকুও আমার অজানা।

কিন্তু সে বিদ্রুপের বিষক্রিয়া আমার দেখতে ইচ্ছে করে না। শুধু ভাবলাম, মনে কুলুপ আঁটতে পারছি কোথায়? যে-কপাটের প্রতি রন্ধ্রে নিষ্টেপিষ্টে আগল বন্ধ করেছি, তার সব বাঁধন মড়মড়িয়ে ঝরঝরিয়ে যাচ্ছে।

ঝিনুক আবার বলল, কিন্তু আমি তো অন্ধ হইনি এখনো। আমি যে তোমার সবই দেখতে পেলাম।

আমি গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললাম, কী দেখতে পেলে ঝিনুক?

ঝিনুক বলল, দেখতে পাচ্ছি, তুমি রাগ করেছ, মান করেছ, ভুলতে চাইছ। ঘেন্নাও বুঝি করতে চাও। করতে পারলে তুমি বেঁচে যাও।

ঝিনুকের কথার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বিচার করতে পারলাম না। এখন আবার মনে হল, সহজ কথা খুব সহজ করে বললে বোধহয় অসত্য বলে মনে হয়। কিন্তু এই এক তরফা বিচারে, যুগপৎ একটি নিঃশ্বাস ও হাসি চাপতে পারলাম না।

প্রতিবাদ করে বললাম, এই কি সব সত্য দেখতে পেলে?

ঝিনুক আলমারির গা থেকে একটু সরে এল। দূরের ঝোড়ো শালবন থেকে যেন বাতাসে ভেসে এল ওর গলা, আর তোমার কষ্ট? টোপনদা, ঝিনুকের বড় সাহস তুমি জান। কিন্তু ও-কথাটা বলতে আমার সাহস হয় না।

আমার যেন নিঃশ্বাস আটকে গেল। ঝিনুক নিচের দিকে তাকিয়ে, বাসি আলতা-পরা পায়ের আঙুলে মাটি খুঁটতে লাগল। ওর এত ভয় আমি কখনো দেখিনি। তার স্বরে আমি এমন শালবনের বাতাসের হাহাকার কখনো পাইনি। আমারও যেন ভয় করতে লাগল।

তাড়াতাড়ি বললাম, এসব কথা থাক ঝিনুক।

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে ঝিনুক কয়েক মুহূর্ত নীচু মুখে নিশ্চুপ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বলল, ওঘরে যাবে টোপনদা?

চমকে উঠলাম। ও-ঘরটায় যাবার সাহস আমার প্রথম থেকেই কম ছিল। সহসা জবাব দিতে পারলাম না।

একটা সময় এসেছিল, যখন প্রাণে প্রাণে, রক্তে রক্তে একটা অন্ধ বেগের দাপাদাপি হুড়োহুড়ি লেগেছিল। একদা জ্যোৎস্না-বিধৃত সন্ধ্যায় হেঁতালের তলায় তার শুরু হয়েছিল। তারপর থেকে এই লোক-সংসারের সঙ্গে একটা লুকোচুরির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমার আর ঝিনুকের। সেটা কতখানি

গর্হিত হয়েছিল, এখনও তার সঠিক বিচারে আমি অনভাবী।

তখন সন্ধ্যাবেলা এ ঘরে আলো জ্বলত, উপীনকাকা পড়াশোনা আলোচনা করতেন। কাকীমা থাকতেন রান্নাঘরে। বারান্দায় থাকতেন ঠাকমা, অমুঝুমুকে নিয়ে। এঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার এক দেওয়াল, এক দরজা নয়। খড়ের ছাউনি, মাটির দেওয়ালের এই দুটি ঘরের মাঝখানে সরু একটি গলি আছে।

সন্ধ্যাবেলায় সবখানে যখন আলো, তখন পাশের ঘরটা থাকত অন্ধকার। সে সময়ে ঝিনুকের থাকার কথা, হয় বারান্দায়, না হয় কাকীমার সাহায্যার্থে রান্নাঘরে। তাই ও থাকত। ওর সাড়া পাওয়া যেত। কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ ঝিনুকের কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যেত না। হয়তো তখন, উপীনকাকার মহেঞ্জোদারোর ধ্বনিত স্বপ্ন গুঞ্জরিত হত। আর আমি সহসা উৎকর্ণ হয়ে উঠতাম। পাঁচ হাজার বছর আগের সিন্ধু উপত্যকা থেকে, তামাই উপত্যকার শালঘেরির এই কুটিরে আসতাম ফিরে। বাইরে সাড়া শব্দহীন ঝিনুকের অস্তিত্ব সহসা যেন অতি নিকটে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত। স্তব্ধতার মধ্য থেকে একটি শব্দহীন আহ্বানে আমার বুকের রক্ত চলকে উঠত। পাশের ঘরের খোলা দরজার অন্ধকার যেন দুটি আয়ত চোখ মেলে তাকাত আমার দিকে। আমি পায়ে পায়ে যেতাম সেই অন্ধকার ঘরে। দ্রুত নিঃশ্বাসের স্খলিত শব্দ, একটি পরিচিত অস্পষ্ট গন্ধ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতাম। তারপর দুটি থরোথরো হাত, আরও দুটি থরোথরো হাত আঁকড়ে ধরত। দুরন্ত কিন্তু ভীরু ইচ্ছাগুলি, পৃথিবীর সময় থেকে চুরি করা কয়েকটি মুহূর্তে, হাতের স্পর্শে ঝংকৃত হত। অস্থির চঞ্চলতায় তখন একটি বোবা অপূর্ণতাই আসলে কণ্ঠ হয়ে বাজত। ডাকতে চাইলেও ঠোঁট উচ্চারণে অসমর্থ হত। কিন্তু চুরি করার সময় আমাদের ভীরু আড়ষ্টতার মুখ চেয়ে থাকত না।

সে-সব প্রাত্যহিক না হলেও, এই লুকোচুরি প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপরে দিনের বেলা যখন আমরা দুজনে এঘরে যেতাম, রাত্রের কথা মনে করে একটি হাসি উদ্বেল হয়ে উঠত আমাদের।

আজ ঝিনুক কেন ডাকে। ও-ঘরে কেমন করে যাই। স্মৃতিচারণে ইচ্ছে নেই। সে অপ্রতিরোধ্য বেগে আসে। ভয়কে যে দূর করতে পারিনে।

ঝিনুক এসে হাত ধরল আমার। বলল, এস।

মহাকালের অট্টহাসি শুনতে পেলাম আমি। তার চক্রপিষ্ট তারার আর্তনাদ আমার বুকে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় বিদ্ধ হল। ঝিনুক যেন একটি ভয়ঙ্কর পরীক্ষায় হাত দিল। আমার সমস্ত সত্তা, সমাজবোধ, বন্ধুত্ব, অত্যন্ত অসহায় বিস্ময়ে, ব্যথায় ও ভয়ে চমকে উঠল। আমি ঝিনুকের হাত সরাবার জন্য হাত তুলতে উদ্যত হয়ে ডাকলাম, ঝিনুক!

ঝিনুক যেন অত্যন্ত সহজে আমাকে আকর্ষণ করল। বলল, এস টোপনদা, মা আসবে এ ঘরে।

ঝিনুকের হাতে নিয়তির অমোঘ নির্দেশ ছিল কিনা জানিনে। আমি সভয়ে বলে উঠলাম, ঝিনুক, কী একটা শুরু হবার ভয় লাগছে আমার।

ঝিনুক বলল, শুরুর কথা বলছ কেন? সে কি আজ হয়েছে? এস টোপনদা।

এমন ভয়ংকর অসম্ভব কথা এত সহজে কেমন করে বলছে ঝিনুক? আমি উঠে দাঁড়াতে ঝিনুক আমার হাত ছাড়ল। পাশের ঘরে গেলাম। কাছে দাঁড়িয়ে ঝিনুক তাকাল আমার দিকে। দেখলাম, শালঘেরির রাত্রির আকাশে, কোন অতীত যুগে খসে পড়া দুটি রহস্যময়ী তারা আমার সামনে। তার রোদ-রং শরীরে লালপাড় শাড়ির রক্তবন্ধনী ঢেউ দিয়ে ফিরছে। রৌদ্রাভা তার শাদা জামার আলোকোচ্ছ্বাসে।

আমি বললাম, ঝিনুক, সন্দেহ হয়, আমরা নিজেদের অপমান করছি।

ঝিনুক তার এলানো আঁচল তুলে, সোজা হয়ে দাঁড়াল। নিজেকে দেখিয়ে বলল, দেখতো টোপনদা, অপমান কোথায়? আমার কোথায় অপমান বল? সে অপমান কী?

এ আহবানে আমাকে নতুন করে দেখতে হল ঝিনুককে। কে জানে এ শুধু আমার সেই সুখ-দুঃখের সেতু স্রষ্টা জীবনদেবতারই দেখাবার ভুল কিনা। দেখলাম, সামনে আমার উদার আকাশ, নীচে অরণ্যতল। সেখানে কয়েক কথা; পাথর চাপা মাটিতে কত কালের লিখন আঁকা, অনেক দাহনের অজানা ইতিহাস। যা প্রচ্ছন্ন রেখেছে মহাকাল, সে তো একজনের অগোচরে, আর একজনের আদিম গভীরে ঢাকা পড়ে থাকা অসমাপ্ত সৃষ্টির ব্যাকুলতা। কালের দাগে তত্ত্ব খুঁজতে গিয়ে আকাশ অরণ্যের এ অসীমকে আড়াল করা যায় কেমন করে? কারণ, এ দেখাটা তো শুধু দৃষ্টিকর্তা হয়ে দেখা নয়, সৃষ্টিকর্তা হয়ে দেখতে হয়।

কিন্তু আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ভয়েই বুঝি স্বর রুদ্ধপ্রায়। দেখলাম, ঝিনুক মুখ তুলে দাঁড়িয়ে। ওর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। আবদ্ধ ঠোঁট জোর করে টিপে রেখেছে। আর ওর চোখ দুটি যেন প্রাণের সকল পরিচয় প্রকাশ করে হাট করে খোলা দরজার মত।

ঝিনুক বলল, তাহলে আমি কী করব টোপনদা?

আমি রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওকে থামবার জন্যে ডাকলাম, ঝিনুক।

ঝিনুক থামল না। বলল, আমি তো জানি টোপনদা, তোমার ভেতরটা কেন কেন করে মরে যাচ্ছে। আমারও মরেছে, এখনও মরছে। কিন্তু কী বলতে হবে জানিনা। মাঝে মাঝে কেবল মনে হয়, তুমি চলে গেলে, আমি যেন তোমার পিছু পিছু দৌড়চ্ছিলুম। তারপর তোমাকে যখন আর দেখতে পেলাম না, তখন যেদিকে পা গেল, সেদিকেই ছুটতে লাগলাম। টোপনদা তখন মনে হল, কে যেন আমার সঙ্গ নিল। আমাকে ডাকল, আমাকে—

বলতে বলতে ঝিনুকের চোখ মুখ, গলার স্বর বদলে গেল। দ্রুত নিঃশ্বাস,

অস্বাভাবিক চকিত চোখ, গলায় যেন জ্বর বিকার। আমি ওকে আবার থামাতে গেলাম। পারলাম না। কারণ, আমিও যেন উৎকর্ণ বিস্ময়ে ঝিনুকের কথাগুলি শুনছিলাম।

ঝিনুক বলল, তারপরে হঠাৎ, একেবারে আচমকা তোমাকে দেখতে পেলাম। তোমার মনে আছে টোপনদা, তুমি চলে যাবার সময় বলেছিলাম, আমার ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে। ভয়টা আসলে তোমাকে ছেড়ে থাকার ভয়, যে জন্যে ছুটেছিলাম। তারপরে কে যেন আমাকে ধরে ফেলল, সে ঠিক তোমার মত করে আমাকে আদর করল। যেই করল, সেই আমি তোমাকে দেখতে পেলাম। দেখলাম, এখন তোমার যেমন চোখ মুখের ভাব, এমনি ভাব করে তুমি আমার দিকে শিকের আড়াল থেকে তাকিয়ে রয়েছ। দেখতে পেলাম, আমি কোথায়! তৎক্ষণাৎ ছিটকে গেলাম। কিন্তু টোপনদা, স্বপ্নের কথা কি কখনো সত্যি হয়? এ যেন উদ্ভট স্বপ্নের মত, কিন্তু এ কোনো জবাব নয়। বিশ্বাস অবিশ্বাসেরও কিছু নেই। তবে, এইটুকুই আমার জানা, এর বেশি কিছু জানি না।

আমি সভয় বিস্ময়ে বলে উঠলাম, আর থাক, থাক ঝিনুক, তুমি চুপ কর।

ঝিনুক চুপ করল। চুপ করে শান্ত স্বাভাবিক হতে চাইল। মুখ ফিরিয়ে নল, কিন্তু চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, আমি কী বলছি, আমি জানি না। আমাকে কেটে কেটে দেখ, আমি কিছুই জানি না। তুমি আবার শ্বশুর কথা বললে, মান অপমানের কথা বললে, তাই হঠাৎ এত কথা বললাম। টোপনদা, আর একজনও কেন কেন করে মরেছে অনেকদিন। রাগ করেছে, কেঁদেছে, পাগলের মত ব্যবহার করেছে, শেষ পর্যন্ত ভয় দেখিয়েছে, শাসন করেছে, কিন্তু তাকেও বলতে পারিনি, কী করে কী হয়েছে। তারপরে সে যেন ধুঁকতে লাগল, আমিও ধুকতে লাগলাম। আর তুমি এসে পড়লে।

ঝিনুকের গলায় উত্তেজনা ফুটতে দেখেছি কম। আজ ও যেন উত্তেজনায় থরথর করছে। বললাম, ঝিনুক, আর কিছু বলো না। চুপ কর।

ঝিনুক আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, চুপ করব?

—হ্যাঁ।

আমি জানি, ঝিনুকের দুর্বোধ স্বপ্নবিকারের কথাগুলি থেকে একটি দুর্বিসহ অর্থ প্রকট হয়ে উঠেছে। ও যদি কেঁদে ভাসাত, তবে সমস্ত ব্যাপারটা একটি নিম্ন স্তরের স্তোক হয়ে উঠত। দেখছি, ওর চোখে জল নেই। স্বগতোক্তি ও আত্মধিক্কারের উত্তেজনায় সহসা স্ফুরিত হয়ে উঠেছে। তাতে, পরের সর্বনাশের যন্ত্রণা কতখানি আছে জানিনে। ওর নিজের সর্বনাশের কথাটা চেপে রাখতে পারছে না। সহ্য করতেও পারছে না। দেখছি, মানুষ তার নিজের কাছে কত অপরিচিত, দুর্জ্ঞেয়, আর তার জন্যে কী অপরিসীম যাতনা। খোলা মাঠে, সোজা পথ ভেঙে, অনেক রৌদ্রে বৃষ্টিতে কষ্ট করে চলাটা জীবন নয়। আরও দুর্নিরীক্ষ্য, গভীর, কুটিল, ওই শাল অরণ্যের মত

জটিল, ছায়ান্ধকারে পরিপূর্ণ। গতকাল রাত্রে ভবেনকে দেখে সেই গানের ভাষায় মনে হয়েছিল, মাটি আছে, কিন্তু ফুলের বাহার নেই, ফসল ফললো না, কান্নাকে ঢেকে রেখেছে হাসি দিয়ে। আজ এখন ঝিনুককে দেখে, সেই গানেরই আর এক কলি মনে হল, ঘরে গেল না, পারে ফিরল না। মাঝখানে ও কিসের প্রতীক্ষায় যে বসে। কার ডাকে ও কোথায় যাবে। কে ওকে ডাকবে।

আর সভয়ে দেখছি, এই বিড়ম্বনা ও সর্বনাশের মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। এর পরে আর ঝিনুকের কথা শুনতে আমার সাহস হয় না।

ঝিনুক বলে উঠল, সেই কি আমার সান্ত্বনা টোপনদা।

বললাম, না ঝিনুক, এটা সান্ত্বনা নয়। সান্ত্বনা হল একটা পরিণতিকে মেনে নেওয়া।

পরিণতি ?

ঝিনুক আমার দিকে তাকিয়ে, কী বলতে গেল। পারল না। ঠোঁট নড়ে গেল, এবং পরমুহূর্তেই ওর চোখের গভীরে একটি ছায়া দেখে আমি যেন শিউরে উঠলাম। আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, আমি তোমার আর ভবেনের কথা বলেছি। কষ্ট করে হলেও তোমরা দুজনে একটা পরিণতিকে মানবে, আঁকড়ে ধরবে। তা ছাড়া কোনো সান্ত্বনা নেই ঝিনুক। নইলে—।

—জানি কী বলবে। শালঘেরি ছেড়ে চলে যাবে তুমি।

অসহায় বিস্ময়ে ঝিনুকের দিকে তাকালাম। অস্বীকার করতে পারলাম না।

ঝিনুক বলল, তুমি তো দুদিন এসেছ। চলে গেলে নতুন কী হবে? তার চেয়ে, টোপনদা, পরিণতি থাক। তোমার কাছে একটা সান্ত্বনা চাই। আর কোনোদিন চোখের আড়াল হতে পাবে না।

কথা বলতে চাইলাম। ঝিনুকের সঙ্গে চোখাচোখি করে থমকে গেলাম। ওর এক চোখে যেন একটি অমোঘ নিষ্ঠুর নির্দেশ এবং আর এক চোখে করুণ ব্যথিত প্রার্থনা ফুটে উঠতে দেখলাম। কথা যোগালো না আর।

ঝিনুক আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে উঠল। ওর সেই ওপরে নিস্তরঙ্গ, অন্তস্রোতে দুরন্ত প্রবাহ, সেই স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে নিয়ে এল। কয়েক মুহূর্তের জন্য ওর ওপরে গভীরে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

ও গিয়ে দাঁড়াল বাইরের জানালার কাছে। পুবপাড়ার সেই ফুল, যাকে দেখে ভুলেছিলাম।

সত্য কখনো মিথ্যা হয় না। তার রূপান্তর হয়। সেই রূপান্তরিত সত্য আমার চারপাশে কোমরে হাত দিয়ে, হেসে, তবু ভ্রূতে একটি রহস্যের কুঞ্চন নিয়ে ঘিরে রইল।

শালঘেরির অরণ্য কি এতদিন আমাকে এইজন্যই ডেকেছে হাতছানি দিয়ে? তার ধুলায় বসে আমি হাসতে পারলাম না। বনের আড়ালে গিয়ে কাঁদতেও

পারলাম না। দূরের মাঝে এক ভয়ংকর আড়ষ্টতা নিয়ে, ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ঝিনুক ডাকল, টোপনদা।

যেন অনেক দূর থেকে জবাব দিলাম, বল।

—এখানে এস।

ওর কাছে গেলাম।

ভেবেছিলাম, ঝিনুক হাসছে। কিন্তু ও হাসছে না। আমার দিকে তাকিয়ে, তামাইয়ের ওপারে শালবনের দিকে তাকাল। বলল না, 'ওই দেখ তামাইয়ের ওপারে শালবন।' নীরবে শুধু তাকাল।

তার সংকেতে আমি শালবনের দিকে তাকালাম।

কাল রাত্রের মত বাতাস নেই। বন স্তব্ধ। বিস্তীর্ণ বালি কাঁকরের প্রান্তরটা রোদ পোহাচ্ছে। তবু ওই দূর বনের গন্ধটাকে আমি চিনতে পারছিলাম আমার পাশের বাসি বেণীর গন্ধে।

কাকীমা এলেন। বললেন, খেয়ে যাবি টোপন?

—না, কাকীমা। পিশী বসে থাকবে।

—তবে যখন যেদিন ইচ্ছে হয়, খেয়ে যাস। তুই সেধে খাস বলে তোকে আমার যেচে খাওয়াতে লজ্জা করে।

ঝিনুকের সঙ্গে চোখাচোখি করে হেসে বললাম, সেই ভাল কাকীমা।

কাকীমা ঝিনুককে বললেন, ঝিনুক, নাইতে যা, বেলা করিস না।

আমি বললাম, চলি কাকীমা।

কাকীমা বললেন, আয়গে।

আমার আগে ঝিনুক বেরিয়ে গেল বাইরে। আমি উঠোনে এসে ঠাকমার কাছে গিয়ে বললাম, চলি ঠাকমা।

—যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—আবার এস। কী আর বলব বল। কানা বাড়িটায় এখনো পড়ে আছি।

ঝিনুক দরজার কাছে পাঁচিলে লেপটে দাঁড়িয়ে আছে। দরজাটা খোলা। দরজাটা পার হবার আগে বললাম, চান করতে গেলে না ঝিনুক।

ঝিনুক বলল, এবার যাব।

—চলি।

ঝিনুক ঘাড় কাৎ করল। বাইরে গিয়ে হেঁতালগাছটার তলা পর্যন্ত পেঁছে, একবার ফিরে না তাকিয়ে পারলাম না। দেখলাম, অর্ধেক পথ এসে দাঁড়িয়ে আছে ঝিনুক।

বললাম, আবার কোথায়?

ঝিনুক বলল, কোথাও নয়।

বলে ঝিনুক ছোট একটি ঘোমটা তুলে তাকিয়ে রইল। আমি একবার

গাছটার দিকে তাকিয়ে, আর একবার পিছন ফিরে তাকালাম। তারপর উত্তরের পথে চলে গেলাম।

প্রায় পাড়ার কাছাকাছি এসে মনে পড়ল কুসুমের কথা। আবার পশ্চিমে বাঁক নিলাম।

শালঘেরির বাজার বড়। দোকানপাটও কম নয়। যুদ্ধের সময়ে দেখছি, ব্যবসা-বাণিজ্য না কমে বরং অনেক বেড়েছে। জেলা-শহরের সঙ্গে মোটরবাসের যোগাযোগের জন্যেই শালঘেরির পসার ভাল। গড়াইয়ের ওদিককার লোকেরা অনেকেই শালঘেরিতে দোকান বাজার করতে আসে। যতদূর জানি, গড়াই থেকে এখনো জেলা শহরে যাবার কোন মোটর রাস্তা তৈরী হয়নি। যদিও গরুর গাড়ির পথে সারা জেলায় ঘোরা যায়।

কাপড়ের দোকানে ঢুকতেই মালিক শ্রীশ পাল চীৎকার করে আমন্ত্রণ করল। সেটা সওদার জন্যে নয়, গ্রামবাসী বলে। দু'-চার কথার পর দু'খানি তৈরী ব্লাউজ কিনে নিলাম। একটি ছিটের আর একটি সাধারণ ফ্লানেলের।

পিশীর আশার চেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফেরায় তিনি খুব খুশি। কুসুম তখনো আমিষ ঘরের রান্নায় ব্যস্ত।

পিশীকে জামা দুটি দেখিয়ে বললাম, দেখ তো পিশী, কেমন?

—কার জন্যে রে?

—কুসুমের জন্যে।

পিশীর দাঁতহীন মুখে একটি অনির্বচনীয় হাসি দেখলাম। চুপি চুপি বললেন, খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু অনেক দামের জিনিস এনেছিস নাকি?

—না, দাম বেশি নয়।

সঙ্গে সঙ্গে পিশী মুখখানি কালো করে বলল, কার জন্যেই বা এনেছিস ও দস্যি কি এসব রাখতে পারবে নাকি? দুদিনে ছিঁড়বে, কুটিকুটি করবে।

ও আসরে আর আমার ঠাঁই নেই। ওটা কুসুম আর পিশীর খেলা দেখলাম, কুসুম গুটি গুটি বেরিয়ে এসেছে। মুখে একটু সলজ্জ হাসি।

বলল, জেঠি, আমার?

পিশী বললেন, হলে কি হবে। তুই তো এর মর্যাদা দিতে পারবি না।

কুসুম ও-কথায় কান না দিয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, আমার জন্যে এনেছ টোপনদা?

বড় বড় চোখ দুটিতে কুসুমের বিস্মিত খুশিটা যেন থমকে আছে।

বললাম, হ্যাঁ

কুসুম বলল, দাও না জেঠি, ছুঁড়ে দাও না দেখি।

ছোঁবার উপায় নেই পিশীকে। পিশী জামা দুটি ছুঁড়ে দিলেন। কুসুম নীল ফ্লানেলের জামাটা হাতে নিয়ে বলল, মা গো! এ যে গরম জামা টোপনদা।

—শীতে গায়ে দিবি বলেই তো এনেছি।

কুসুম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জামাটি দেখতে লাগল। তার কৃতজ্ঞ খুশির হাসি-টুকু ফ্লানেলের নীলে ঝিকমিকিয়ে উঠল।

পিশী বললেন, যা, রান্না শেষ করগা। এখুনি নেয়ে এসে খেতে চাইবে।

সারাদিনে আর বিশ্রাম পেলাম না। দুপুরে পিশী দলিল দস্তাবেজ বার করলেন। অঘোর জ্যাঠাকেও আগেই নিশ্চয় খবর দেওয়া ছিল। তিনিও এসে বসলেন। কোথায় কোন্ গ্রামে কতখানি জমি আছে, ভাগ বর্গা কাদের ওপর দেওয়া আছে, তাদের নামধাম সবিস্তারে ব্যক্ত করলেন। চাষের খরচ, ফসলের পরিমাণ, বাৎসরিক মোট আয়ের একটা গড়পড়তা হিসেব, কিছুই বাদ দিলেন না। এত বিস্তৃত হিসেব আমার কোনোকালেই জানা ছিল না। যদিও শ'দুই বিঘা জমি ছাড়াও বসতবাটি; ওটা আমার জানাই ছিল। কিন্তু নগদের পরিমাণটা একটু অবাক করেছে আমাকে। বাবার যে এত পুঁজি ছিল, তা জানতাম না। প্রায় বিশ হাজার টাকা রেখে গেছেন পোস্ট অফিসে। ইন্সিওরেন্সের একটি চেক আমার নামে জমা আছে। তাছাড়া মায়ের গহনা।

আমার সমূহ কাজটা যেন হেসে হাত বাড়িয়ে দিল আমাকে। কাজের উত্তেজনাটা আমাকে আর একবার ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল। মিহিরবাবু আমাকে জানিয়েছিলেন, কাজের অনুমতি পেলেও গভর্ণমেণ্ট ব্যয়ে পরাঙমুখ হতে পারে। তখন নিজের অর্থ প্রয়োজন। তামাইয়ের মাটির তলার আবিষ্কার হিসাবে এ টাকা সামান্যই। তবু কিছু কাজ হবে। নিজের জন্য ভবিষ্যৎ তো দেখতেই পাচ্ছি। আমার আর পিশীর ভরণপোষণ। কুসুমের একটি বিয়ে। এইটুকু হাতে রেখে, বাকীটুকু নিয়ে, তামাইয়ের গর্তে আমার যাত্রা।

অঘোর জ্যাঠা আমাকে নানানভাবে বোঝালেন, যেন আমি বিদেশে চাকরি নিয়ে চলে না যাই। গ্রামেই থাকতে হবে, সব দেখা শোনা করতে হবে। লেখাপড়া শিখলেই যে শহরে চাকরি করতে যেতে হবে, এমন কোনো কথা নেই, ভূ-সম্পত্তি রক্ষা করা, তা থেকে আয় করাটাও একটা কাজ। বসে থাকবার তো কোনো প্রশ্নই নেই। বিয়ে-থাওয়া আছে, ভবিষ্যতে সংসার বড় হবে। এমন কি, অঘোর জ্যাঠা ইঙ্গিতও করলেন, সামনের ফাল্গুনেই যদি বিয়েটা চুকিয়ে ফেলা যায়, তবে ভাল হয়। সেই চেষ্টাই উনি দেখবেন। সে কথা শুনে, পিশীর চোখে আবার জল এসে পড়ল। কারণ, বাবা জীবিত নেই, আমার বিয়েতে তিনি উপস্থিত থাকবেন না।

শুনে যাওয়া ছাড়া আমার কিছু করবার নেই। লাভ নেই প্রতিবাদ করে। কেবল একটি অনুরোধ আমি অঘোর জ্যাঠাকে না করে পারলাম না। যে কটা মামলা মোকদ্দমা চলছে, সেগুলি যেন ডিসমিস করে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এ প্রস্তাব অঘোর জ্যাঠার তেমন ভাল লাগল না। বললেন, তা দিতে বল, দেব। কিন্তু ভবিষ্যতে মামলা-মোকদ্দমা তো তুমি এড়িয়ে চলতে পারবে

না বাবা। জমি থাকলেই মামলা। সোনা থাকলেই যেমন তোরঙ, তেমনি।

তা ঠিক। কিন্তু অঘোর জ্যাঠাকে এখন জানাতে পারলাম না, জমি জমা এভাবে রক্ষা করা আমার আয়ত্তে থাকবে না। যাবার আগে অঘোর জ্যাঠা জানিয়ে গেলেন, শীঘ্রই আবার কথা হবে।

বিকেলে গেলাম স্কুলের মাঠে। বুঝলাম, রাজনীতি আজ উপর থেকে নেমে, সদরের চৌহদ্দিময় হয়েছে। দেখলাম, বিয়াল্লিশের চেয়েও ব্যাপক এবং গভীর চেতনা স্তব্ধ হয়ে আছে সর্বত্র। যে কথা বলতে পারে, সে তীব্রভাবে বলছে। যারা পারে না, সেই সকল মানুষেরাও অস্থির।

আমার সম্বর্ধনাটা উপলক্ষ্য মাত্র। গ্রামের মানুষের ভিতরের বাইরের প্রতীক্ষার উম্মাদনা দেখে এলাম।

হয়তো স্বাধীনতা আসবে। আর সেই ভবিষ্যতের জন্য, প্রাণের এই প্রচণ্ড বেগটুকুই বোধহয় আমাদের একমাত্র সম্বল। কারণ, সেই কথাগুলি কিছুতেই ভুলতে পারিনে যে, ইংরেজরা হয়তো একদিন চলে যাবে, কিন্তু কী ভয়ংকর নিঃস্ব দুর্ভাগা ভারতবর্ষকে সে পিছনে ফেলে যাবে।

হয়তো আমি সংশয়বাদী। জানিনে, পলায়নী মনোবৃত্তি আমার মধ্যে আছে কিনা। কিন্তু রাজনীতি আমার কাজ নয়। করবও না কোনোদিন। তবু ইন্দিরের কথা বারবার মনে হয়। দেখলাম, সভায় এসে বসেছে সে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চাবুক মারার ভঙ্গিতে চুপ করাচ্ছিল। তার বুড়ো চোখে যে স্বপ্নের ছায়া আমি দেখেছি, সেই স্বাধীন, বুভুক্ষাহীন সুখী ভারতের কোনো চিহ্ন আমি দেখতে পাইনে। আমাদের শেষ সম্বল, শতাব্দীর চাপা পড়ে থাকা প্রাণের বেগ দিয়ে হয়তো নতুন ভারত গড়ে তুলতে পারব।

সভার শেষে ভবেন ছাড়ল না। ওর সঙ্গে ওদের বাড়ি গেলাম। আর এই যাওয়াটা কোনোদিন থামল না। কারণ, ওই যাওয়াটাই সত্য, ফিরে আসাটাই বোধহয় আত্মপ্রবঞ্চনা।

শালঘেরিতে বসন্ত এসেছে ॥

এখন শেষ বসন্ত। যাবার আগে এখন সে পূর্ণ বিরাজিত। ফুটতে না ফুটতেই পরম লগ্ন এসে যায়। পরম লগ্নের অবকাশের আগেই দিন শেষ হয়ে আসে। যদিও কালবৈশাখীর কিছু দেরী আছে, মনে হয় ঈশানে তার আয়োজন থেমে নেই।

এখন সেই দিনশেষের পরম লগ্ন। শালঘেরির গেরুয়া ধুলো বিবাগের মন্ত্র নিয়েছে। মাটি ছেড়ে সে আকাশে উঠেছে। এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় ধাবিত। গাছ মানে না, পাতা মানে না, জীব মানে না। সবাইকে সে ছুপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

শালঘেরির আকাশ জুড়ে শিমুল পলাশের উচ্ছৃঙ্খল মাতামাতি। মাটির গভীরের সব লজ্জা তাদের রক্তঠোঁটে আকাশমুখী হয়েছে। শিমুল পলাশের

রক্তোচ্ছ্বাসে শালের শ্বেত কণিকারা পেয়েছে উজ্জ্বলতা।

ইতিমধ্যে তামাইয়ের ধারে আমার চিহ্নিত স্থানের জমি চেয়ে পাইনি। পাওয়া যাবে না তা জানতাম। তাই কিছু কিছু জমি আমাকে কিনতে হয়েছে। কারণ, কলকাতায় চিঠি দিয়ে মিহিরবাবুর কথায় জানা গেছে, গভর্ণমেণ্ট এখন এ ধরনের কোনো কাজেই অগ্রসর হবে না। মূলতঃ রাজনৈতিক আবহাওয়াই তার জন্যে দায়ী। তবে, আমার লিখিত রিপোর্টটা আর্কিওলজি বিভাগের সবাইকেই খুব কৌতূহলিত এবং উৎসাহিত করেছে। সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলাম, 'সম্ভাবনাময় তামাই' নাম দিয়ে। যে সব ছোটখাটো জিনিস-গুলি পেয়েছিলাম তামাইয়ের ধারে, তার ফটোও তুলে দিয়েছিলাম। তাতে কলকাতার কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে উৎসাহিত এবং নিরুৎসাহিত দুই-ই করেছেন।

শালঘেরি, এবং শালঘেরির আশেপাশে যারা রাজনীতি করে, আমার বিষয়ে হতাশাজনিত কারণে তারা বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হল। বিয়াল্লিশের রাজ-নৈতিক কারাবাসী আমি। এ সময়ে আমার নীরবতা তাদের ভাল লাগল না। তামাই সম্পর্কে উৎসাহ তাদের কাছে এক ধরনের ভীরুতা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কারণ হয়ে উঠল। বিলাসিতাও বলা যায়। কিন্তু উপায় নেই। তাদের দরজায় দরজায় গিয়ে আমার বোঝাবার কিছু নেই। জানি, যে প্রত্যক্ষ কাজের সঙ্গে আমার নাড়ির টান নেই, সেই কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে গেলে, অকারণ ভেজাল বাড়াবো। সাহায্য না করে ক্ষতিই করে ফেলব। পরকে দিয়ে নিজের মূল্য যাচাই করাতে পারি, কিন্তু সেটা পরের দেওয়া পোষাক পরে নয়। একান্ত আত্মপরিচয়েই তা সম্ভব।

সব থেকে অবাক করল ইন্দির। প্রথমে লক্ষ্য করে দেখিনি, সে আমাকে এড়িয়ে চলেছে। ভেবেছিলাম, বুড়ো মানুষ, সব সময় আমাকে ঠাহর করে উঠতে পারে না। কয়েকদিন সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখেছি, সে যেন অন্য-মনস্ক হয়ে চলে যায়।

তারপরে একদিন হঠাৎ ভবেনদের বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে, মুখোমুখী দেখা হয়ে গেল। আমি স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, ভাল আছ ইন্দির।

ইন্দির খাপছাড়াভাবে বলল, আজ্ঞা, আমাদিগের আবার ভাল মন্দ। আপুনি ভাল তো?

দেখলাম, ইন্দিরের দাঁড়াবার ইচ্ছে নেই। তার গলাতেও যেন তেমন আন্তরিকতার সুর বাজে না। আমার মুখের দিকে তাকাবারও তার একটি ভঙ্গি ছিল। সেদিন দেখলাম, তার চোখ অনিচ্ছুক। ভাবলাম, কোনো কারণে ইন্দিরের মন বিব্রত আছে। তবু কেমন যেন একটু খটকা লাগল। চকিতে মনে হল, ইদানিং ইন্দির আর তেমন করে কথা বলে না। এবং একটি সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসায় মন বিদ্ধ হল, ভবেনদের বাড়িতে আসা নিয়ে, ঝিনুকের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে, এ বাড়ির পুরনো বুড়ো সহিসের মনে কোন নৈতিক প্রশ্ন জেগেছে

কি না।

জিজ্ঞেস করলাম, শরীরটা কি ভাল নেই ইন্দির ?

—আজ্ঞা, বুড়ো মানুষের শরীল, উয়ার আর ভাল মন্দ কী।

সন্দেহ আমার ঘনীভূত হল। কিন্তু ওকে আর বিরক্ত না করে পা বাড়ালাম।

ইন্দির বলে উঠল, মরবার আগে এ্যাটটা সাধ ছিল কি, এই দেশটাকে আপনারা স্বাধীন করবেন, দেখে যাব। শালঘেরিতে তো আপুনিই ছিলেন, আমাদিগের কত আশা, স্বরাজ লিয়ে আসবেন। তা, গরজ বড় বালাই দাদাবাবু। ক্যানে, আপনকার ধন দৌলুতের অভাব কী ? আপুনি দুধেভাতে ছিলেন, থাকবেনও বটে।

অপমানে ও ক্ষোভে আমার ভিতর বাহির কালো হয়ে উঠল সহসা। জিজ্ঞেস করলাম, কথাগুলো কার কাছে শুনলে ইন্দির ?

ইন্দির বলল, দশজনে বুলে শুনি।

দশজনে একদা বলেছিল, আমার ফাঁসী হয়ে গেছে। ইন্দির তাই বিশ্বাস করেছিল। আজও সেই দশজন যা বলছে, সে তাই অনায়াসে বিশ্বাস করেছে। তখন যদি বা সংশয়ের অবকাশ ছিল, আজ তা নেই। আজ সে প্রত্যক্ষই দেখছে, আমি রাজনীতি থেকে দূরে। সন্দেহ হয়, আমার তত্ত্ব ইন্দিরকে বোঝাতে চাইলেও তা বোধগম্য হবে না তার। আমার নিজের অপমানবোধ ও ক্ষোভ দেখে, মনে মনে না হেসে পারলাম না। ইন্দিরের দোষ কী।

বললাম, ইন্দির কয়েকজন লোকে যা বলে, তাই বললে। কিন্তু সংসারে সব লোক এক কাজ করে না। তুমিও না, আমিও না। আমি যদি স্বদেশী না করি, তাতে কি মন্দ হয়ে যাই ?

ইন্দির সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। ঘাড় নেড়ে, জিভ কেটে বলল, আ, ছি, আপনকাকে কি মন্দ বুলতে পারি দাদাবাবু ? কিন্তুক, আপুনি স্বদেশীর জন্যে জেল খেটে এলেন।

বললাম, ইন্দির, ওটা ভূমিকম্পের মত। তখন সবাইকেই বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়।

ইন্দির ঘাড় নেড়ে বলল, আজ্ঞা হঁ, রাগ করবেন নাই গ আমার কথায়। মুখ্যু মানুষ—।

আর দাঁড়াইনি। জানি, ইন্দিরের ধারণা আমি বদলাতে পারিনি। সম্ভবও নয়। যে প্রচারটা সব থেকে শস্তা, আকর্ষণীয়, সেই প্রচারই চলছে আমার নামে। রাজনীতি যে বিবাদ এবং বিদ্বেষ ছাড়া এক মুহূর্ত চলতে পারে না, এগুলিতে তাই প্রমাণ করে। করুক, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি আমার আকৈশোর লক্ষ্যভেদের পথ ছেড়ে আসতে পারিনে।

তবু এসব অনেকটাই জীবনের বাইরের। অস্বীকার করতে পারিনে, আমার ভিতরের প্রবাহে কী এক অস্পষ্ট রহস্যের ঝঙ্কার, কোন এক অলৌকি-

কতার অন্ধকার ছায়ায় নিয়তি টেনে নিয়ে চলেছে। ঝিনুকের চোখেই যেন সেই নিয়তির আঙুল দোলে।

ইতিমধ্যে অঘোর জ্যাঠা কয়েক বার আমাকে বিব্রত করেছেন, নিজেও ব্যর্থ হয়েছেন। নিজেই কন্যা দেখে আলাপ আলোচনা করেছেন। আমাকে মেয়ে দেখতে যাবার আমন্ত্রণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে স্পষ্টই জানাতে হয়েছে, উনি যেন এখন এসব চেষ্টা না দেখেন। ক্ষুব্ধ হয়েছেন, বিরক্ত হয়েছেন। পিশীমার প্রাণে বেশ একটু ভয়ও ধরিয়ে দিয়েছেন।

আজকাল রেণু মেয়েটি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসে। পাটনায় সে থাকত, লেখাপড়া শিখেছিল। কুসুমের ভাষায়, মেমসাহেবদের মত যে চুল বেঁধে দিতে পারে এবং মিথ্যা কলঙ্কের জন্য স্বামী যাকে ঘরে নেয় না।

কলঙ্কের ঘটনা কী, তা জানিনে। রেণুর চোখ মুখ দেখে, কোথাও তার সন্ধান পাইনি। বয়স বছর বাইশ চব্বিশ হবে বা। শ্যামবর্ণ, একহারা রেণুর ডাগর দুটি চোখ। মুখখানি মিষ্টি। কিন্তু সন্ধ্যাবেলার দলছাড়া হরিণীর মত ও যেন এক অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে আছে। বিষণ্ণ, ক্লান্ত, তবু ভয়চকিতা। কপালে কখনও সিঁদুরের টিপ দেখিনি। সীঁথিতে ঈষৎ আভাস থাকে। অনেক সময় কুমারী বলে ভুল হয়। তখন আমার বুকের মধ্যে চমকে ওঠে। মনে হয়, ঝিনুক আর রেণুর মধ্যে একটি জায়গায় কোথায় মিল আছে। ঘরে নয়, পরে নয়, মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু তফাৎও আছে। তফাৎ যেখানে, সেখান থেকেই রেণু তো নতুন জীবনের দিকে যাত্রা করতে পারে। কেউ কি ওকে ডাক দেবার নেই। ভেবে আবার নিজেকেই জিজ্ঞেস করি, ডাক দিলেই যেতে পারে কি ?

মাঝে মাঝে রেণু বলে টোপনদা, একটা কোনো কাজকর্ম পেলে করতাম। কিন্তু এখানে থেকে যে কিছুই হবে না।

রেণু বাইরে যেতে চায়। শহরে, অনেক লোকের ভিড়ে, যেখানে মানুষের পরিচয় শুধু কাজের লোক বলে। তারপরে যার সংবাদ আর কেউ রাখে না। কিন্তু ওর সীমাবদ্ধতা আছে। লেখাপড়া ততোধিক জানা নেই ওর। যদিও সেই বিদ্যে নিয়েই কয়েকটি মেয়েকে বাড়িতে পড়ায়। নিজে যায় শালঘেরির বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদের বাড়িতে। তবু নিজেই বলে, ইচ্ছে করে, অনেক পড়ি। কিন্তু মন বসাতে পারিনে কিছুতেই।

স্বাভাবিক। আজন্ম যে জীবনটা রক্তের মধ্যে পাক দিয়ে রয়েছে, এত সহজে তার ভাঁজ খোলা যায় না। তাই বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সমস্ত মনটা জুড়ে বসে থাকে। অন্যদিকে তা বসবে কেমন করে। তা ছাড়া, রেণু জীবিকার দ্বারা আত্মনির্ভরশীল হবে, সেটাও ওর অভিভাবকদের কাছে গ্রাহ্য নয়।

রেণু অসহায়। ওর জন্যে যে কষ্ট বোধ করি, সেটাও অসহায়। ইচ্ছে করে, ওকে বলি, এ সংসারের যাবত বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করুক। সাহস পাই নে। হয়তো আমাকে ও বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, তাই কথার দাম দেয়।

বিদ্রোহ করতে গিয়ে যদি ভেঙে পড়ে, আমাকে ভুল বুঝবে। যদিও আমার বক্তব্য প্রায় তাই।

মিহিরবাবু শালঘেরিতে আসছেন আগামী কাল। সপরিবারে আসছেন বেড়াতে। তাঁর স্ত্রী এবং এক শিশুপুত্র। আমাদের গ্রামের বিবরণ শুনে তিনি লোভ সংবরণ করতে পারেননি। তাছাড়া তামাইয়ের ব্যাপারেও তাঁর অসীম উৎসাহ। আমি মিহিরবাবুর জন্যেই মাটি কাটার কাজ আরম্ভ করিনি।

কিন্তু মিহিরবাবু এসে কাজে হাত দিতে বারণ করলেন। জানালেন, কিছু-কাল অপেক্ষা করাই ভাল। তা ছাড়া, গোবিন্দ সিংহ নামে এক প্রত্নতত্ত্ববিদ আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছেন? এই ভদ্রলোকের চিঠি আমি আগেই পেয়েছিলাম। একদা গোবিন্দবাবু সিন্ধু উপত্যকা খননের কাজে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা গিয়েছে। কয়েক-বার সাময়িক পত্রিকায় তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী পড়েছি। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে রাজনৈতিক বিবাদে তাঁকে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তিনি আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছেন শুনে, আমার নিজের প্রতি বিশ্বাস বাড়ল। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক অবস্থা একটু না দেখে আসতে পারবেন না।

মিহিরবাবু তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন প্রায় উৎসব চলল। ঝিনুক নিজেও একদিন নিমন্ত্রণ করল ওঁদের। প্রাচীন মন্দিরের দেশ শালঘেরি মিহিরবাবুকে রীতিমত মুগ্ধ করেছে।

দিন সাতেক পরে ওরা ফিরে গেলেন।

পিশী স্বভাবতই একটি অজানা ভয়ে ও বিস্ময়ে থমকে আছেন। আমার কাজের অর্থ তাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। জমির অভাব না থাকা সত্ত্বেও শুধু মাটি খুঁড়ে দেখবার জন্যে নিষ্ফলা জমির পিছনে এত টাকা খরচ করাটাকে তিনি আদপে সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ বলেই বোধহয় বিশ্বাস করেন না।

শুধু কি আমার এই কাজ? আমি জানিনে, তবে পিশী আজকাল সব সময়েই একটু অভিমান করে থাকেন। বিয়ে না করাটা তার একটি কারণ জানি। তার চেয়েও বড় কারণ বুঝি ঝিনুক। তাঁকে আমি কখনো ঝিনুকের নাম করতে শুনিনি।

তবে, একটি কথা আবিষ্কৃত হয়েছে। আমার মায়ের গহনার একটি হিসেব দিতে গিয়ে পিশী বলেছিলেন, আমার মায়ের একটি আংটি দিয়ে নাকি বাবা ঝিনুকের বৌভাতের দিন আশীর্বাদ করেছিলেন। পরে আমি সেটা ঝিনুকের হাতে দেখেছি।

কুসুম তেমনি আছে। আগের চেয়ে অবশ্য একটু পরিবর্তন হয়েছে। যত-ক্ষণ বাড়িতে থাকি প্রায় সব সময় কাছে থাকে। কী দিয়ে কতটুকু আমার মন রাখা যায়, যত্ন নেওয়া যায়, ওটাকে ও ধ্যান করে ফেলেছে। সব সময় ভাল লাগে না। বিরক্তি বোধ করি, ধমকও দিই। তখন দুটি বড় বড় ভীরু চোখে

থমকানো কান্না নিয়ে তাকিয়ে থাকে। পালিয়ে যায় মাথা নীচু করে।

তখন আমারও কষ্ট লাগে। ওর ওই চোখ দুটিকে সরাতে পারিনে আমার চোখ থেকে। কিন্তু ওকে ডেকে ভোলাবার আগেই চোখে পড়ে যায়, দরজার ফাঁক দিয়ে কুসুম আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। সেই সঙ্গেই হয়তো পিশীকে লুকিয়ে কোনো চৌর্য এবং নিষিদ্ধ খাবার খাওয়া হচ্ছে।

দেখে ফেলে জানান দেওয়াটা খেলার রীতি নয়। না জানার ভান করেই গলা তুলে ডাকতে হয়। তখন কাছে আসতে আসতে কিন্তু কুসুমের মুখ ভার হয়ে যায়। আর থমকানো কান্নার বদলে দেখা যায়, একটি রুদ্ধ হাসিই থমকে আছে ওর চোখে। আর কিছু বলবার আগেই কুসুম মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে, যাও! আমার সঙ্গে আর কথা বলো না।

তারপরে ওর কিশোরী গলায় হাসি নির্ঝরের মত কলকলিয়ে ওঠে।

যদি ঠিক লক্ষ্য করে থাকি, তবে একটা বিষয় একটু আশ্চর্য। মাঝে মাঝে ওকে আশ্চর্য রকম নীরব হয়ে যেতে দেখেছি। তখন ও আমার সামনে থেকে সরে সরে থাকে। ডাকলে জবাব পাই সংক্ষিপ্ত। কাছে এলে দেখতে পাই, ওর দুটি চোখের অতলে বিরক্ত হওয়ার তিরস্কার। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলে জবাব পাওয়া যাবে না। পিশী তো তখন কুসুমের ওপর ক্ষেপে বারুদ হয়ে যান। তখন ওর রান্না ভাল হয় না, কাজে ভুল বারে বারে। কথায় কথায় পিশীর সঙ্গে ঝগড়া। পিশী তো প্রায় তাড়িয়েই দিতে যান, দূর হ, দূর হ মুখপুড়ি।

তারপরে ও কখন থেকে যে আবার হাসতে, কথা কইতে আরম্ভ করে, কেউ টেরও পায় না। পিশী বলেন, মাথায় ভূত আছে। শ্বশুরবাড়ি যেয়ে জ্বালাবে।

তবে ওর শরীরটা একেবারেই ভাল নয়। আজ জ্বর, কাল সর্দি আছেই। শৈশবে ম্যালেরিয়ায় ভুগে পিলেখানি বেশ বাগিয়েছে। এর ওপরে কুসুমের অসহ্য পাকামি, মাসে সে পিশীর সঙ্গে একটি করে উপোস করবেই। বকো ধমকাও, যা খুশি তাই কর, কুসুম শুনবে না। পিশী মুখে আপত্তি করলেও, অন্তরে যে সায় আছে, তা বুঝতে পারি। বুঝতে পারি পিশী মনে মনে বেশ খুশি।

কিন্তু ছেলেমানুষের এসব আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া কুসুমের অপুষ্ট শরীরে উপোসটা শুভ নির্দেশ নয়। ও আমার সব কথা শোনে। ওইটি শোনে না।

এ ব্যাপারে ওর কাছে আমি বিস্ময়কর রকম অসহায় ভাবে পরাভব মেনেছি। তার কাহিনীটা সামান্য, আমার অবাক হওয়াটা তুলনায় অসামান্য।

এ মাসেরই কয়েকদিন আগে উপবাসের সেই দিনটি গেছে। খবরটা আমার জানা ছিল। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠেই, কুসুমকে শুনিয়ে পিশীকে ঘোষণা করে দিলাম, কুসুমের উপোস করা চলবে না। যদি কুসুম উপোস করেই, তবে যেন আমার জন্যে রান্নাবান্না না করে। ছেলেমানুষের এ সব

পাকামি আমার একেবারেই ভাল লাগে না। লেখা নেই, পড়া নেই, যত সব সৃষ্টিছাড়া গেঁয়োবৃত্তি। যদি উপোস করেই, তবে আর রান্নার ডেঁপোমি করে দরকার নেই। আমি বাইরে কোথাও খাওয়ার পাট মিটিয়ে নেব।

কথাগুলি বলেছিলাম বেশ রূঢ় রুক্ষ সুরে, গম্ভীর মুখে। ভেবেছিলাম, এই রকম একটা কিছু না করলে কুসুম ও পিশী কাউকে দমানো যাবে না। মনে মনে বলেছিলাম, দেখা যাক, কৌশলটা কাজে লাগে কি না।

লেগেছিল। দেখেছিলাম, পিশী স্তম্ভিত বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ও পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। তারপরে আস্তে আস্তে তাঁর দৃষ্টি শান্ত হয়ে এসেছিল। বলেছিলেন, কুসির উপোসের জন্যে তুই বাইরে খেয়ে আসবি, তাই কি কখনো হয় টুপান? ও আজ থেকে আর উপোস করবে না। আমি বারণ করে দিচ্ছি।

কুসুমকে দেখতে পাইনি আর। আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম। পরিবেশ এবং আবহাওয়াটা বড় বেশী গম্ভীর ও ভারী হয়ে উঠেছিল। যেন একটা স্তব্ধতায় থমকে গিয়েছিল। একটু যে অনুশোচনা না হয়েছিল, এমন নয়। এতটা রূঢ় না হলেও বোধহয় চলত। অথচ কয়েকবার বারণ করার পরেও মানেনি, তখন আর কী ভাবে বলা যেত বুঝিনে। আসলে আমি পিশীকেই তটস্থ করতে চেয়েছিলাম। উপোস পুণ্যি, ইত্যাদির বড় আশ্রয় তো তিনিই।

আমি জানি, আর বিশ্বাসও করি, অসহায় মানুষেরাই সব থেকে বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়। নানান ধরণের অদৃষ্টবাদ, ঝাড়ফুক-মাদুলি, এ সবই তাদের দৈন্যের দেয়ালে মাথা কোটা। কুসুম যে রোজ শিব পুজো করে, গ্রামের অধিকাংশ মেয়েরাই যে করে, তার কারণ তো একটাই। একটি ভাল বর। যে দেশে মেয়েদের ইচ্ছে বলতে কিছু নেই, সব কিছুই ঘটে পরের ইচ্ছেয়, সেখানে কতকগুলি অসহায় আকুতিস্বরূপ ব্রতপুজো তো থাকবেই। নিজের ভাগ্যটাকে অন্তত যাতে ধুয়ে মুছে বেশ ঝকঝকিয়ে রাখা যায়।

কিন্তু ভাগ্যকে জীবনের পাটে ফেলে এমন করে ধোয়া যায় না। শিক্ষাই একমাত্র অন্ধকারকে দূর করতে পারে। কুসুম লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হবে, এটা দেখতেই আমার ইচ্ছে হয়। তা ছাড়া, আর একটি কথাও নিজের কাছে স্বীকার না করে উপায় নেই। কুসুম যে ছেলেমানুষ, এই বাস্তবও সত্যের মধ্যে এমন কিছু দেখতেই আমার ভাল লাগে না, যাতে ওকে সংসারের ক্ষেত্রে বড় বলে মনে হয়। কোনোরকম সমকক্ষতার দাবী একেবারেই মানতে পারিনে।

মনের দ্বিধা ও অস্বস্তি নিয়ে ঝিনুকদের বাড়িতেই গিয়েছিলাম। ঝিনুক শুনে বেশ খুশি হয়েছিল। তার মতে অনেক আগেই নাকি কুসুমকে আমার শাসন করা উচিত ছিল। পিশী তো এতকাল প্রশ্রয় দিয়েই আসছিলেন। আমিও নাকি তাই দিয়ে দিয়ে মেয়েটির ক্ষতি করছিলাম। একটু শক্ত হয়ে নাকি ভালই করেছি।

দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে মনে হয়েছিল, সকালবেলার স্তব্ধতা তখনো যেন

থম্‌থম্‌ করছে। আমার সাড়া পেয়ে পিশী গলা তুলে বলেছিলেন, কুসি, টুপানের চানের জল তোলা আছে তো?

রান্না ঘর থেকে জবাব এসেছিল, আছে!

যে বউটি বাসন মাজে, সে-ই জল তুলে রেখে যায়। আমি প্রত্যহের মতই স্বাভাবিক গলায় বলেছিলাম, কুসুম, রান্না কত দূর?

জবাব এসেছিল, হয়ে গেছে।

এত সংক্ষিপ্ত জবাব পাবার কথা নয়। তারপরেও, 'তাড়াতাড়ি নেয়ে এস, বেলা অনেক হয়েছে। বেরোলে তুমি বাড়ি আসতে ভুলে যাও।' ইত্যাদি কিছুই শুনতে পাইনি।

স্নান করে খেতে বসেছিলাম। পিশী অদূরেই বসেছিলেন। জানতাম, আমার খাওয়া হলেই, পিশী মন্দিরে চলে যাবেন। কুসুমও যেত, কিন্তু সেদিন কুসুমের যাওয়া হবে না। কারণ দরকার নেই। উপোস বন্ধ পুজোও বন্ধ।

থমকে গিয়েছিলাম কুসুমের মুখ দেখে। আমার সঙ্গে ঝগড়া করে মুখ ভার করা তো ওর রোজই আছে। তাতে মুখের অমন ভাব তো কখনো দেখিনি। আমাকে যখন ভাত বেড়ে দিতে এসেছিল, দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন একটা প্রচণ্ড শোকে শীর্ণ হয়ে গেছে। চোখ দুটি লাল ফোলা ফোলা। খুব কেঁদেছে নিশ্চয়। কাঁদুক। আমি বলেছিলাম, কুসুম, রাগ করছিস নাকি?

জবাব দিয়েছিল, না।

পিশী বলে উঠেছিলেন রাগ করবে কেন? তুই কি ওর মন্দের জন্যে বলেছিস্‌? আমি ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারি না বলে কিছু বলি নাই। সত্যিই তো আজকাল আবার এসব আছে নাকি?

পিশীর এতটা সমর্থন আমার হজম হচ্ছিল না। বরং একটু সন্দিগ্ধ চোখেই ওঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। পিশী হাঁটুর কাছে কাপড় তুলে, নিচুমুখে সল্‌তে পাকাচ্ছিলেন। কুসুম সেখানে ছিল না। নিশ্চয় রান্না ঘরে দরজার আড়ালে ছিল। কিন্তু এরকম তো আমি চাইনি। কুসুম ঝেঁজে, পা দাপিয়ে, দু'বার জিভ ভেংচে তারপর হেসে উঠত, তবেই ঠিক হত। সেটাই তো আশা করেছিলাম। অথচ উল্টো ফল দেখছিলাম। যেটাকে রোধ করতে চেয়েছিলাম, সেটাই ঘটছিল। কুসুমকে আরো বেশী ভারী ও গম্ভীর করে তুলেছিল।

আবহাওয়াটা হালকা করার জন্যে আমি রান্নার খুব প্রশংসা করছিলাম, চমৎকার রেঁধেছিস কুসুম। এমন ছেঁচকি অনেকদিন খাইনি।

পিশী বলেছিলেন, মন দিলে তো ভালই পারে।

কুসুমের কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। আমার খাওয়া শেষ হতেই পিশী উঠে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি যাচ্ছি, অ'লো কুসি, তুই খেয়েনে তাড়াতাড়ি। তারপরে মন্দিরে আসিস্‌। টুপান তুই শুয়ে পড় গা যা।

পিশী চলে গিয়েছিলেন। আমি মুখ ধুয়ে দালানেই ছিলাম। প্রত্যহের

মতো, আমার পাতের কাছেই কুসুম ভাত বেড়ে নিয়ে বসবে, সেটা দেখবার অপেক্ষাতেই আসলে দালানে এদিক ওদিক করছিলাম। দেরি হচ্ছে দেখে বলেছিলাম, কই কুসুম খেতে বসলি না ?

আমার কথা শেষ হবার আগেই দেখছিলাম, কানা উঁচু ছোট থালায়, প্রত্যহের মতোই কুসুম নিজের ভাত বেড়ে নিয়ে এসেছে। মুখ নিচু। খোলা চুল রুক্ষ, মুখের একপাশ দিয়ে এলিয়ে পড়েছে। চান করে ও সকালবেলাতেই। সেদিন তেল দেয়নি। উপোসের দিন তেল দেয় না মাথায়। সম্ভবতঃ আমার বারণ করবার আগেই ওর নাওয়া হয়ে গেছিল। রান্নার কাপড়টি পিশীরই একটি জীর্ণ থান। তাতে হলুদের দাগের অন্ত নেই। সেলাই জোড়াতালির শেষ নেই। অপুষ্ট একহারা রোগা কুসুমকে তখন দেখাচ্ছিল অত্যন্ত করুণ। ঢলঢলে জামার ফাঁকে কণ্ঠা বেরিয়ে পড়েছিল। মুখ একেবারে দেখতেই পাচ্ছিলাম না। আমার এঁটোর সামনে থালা রেখে, ও জবুথবু হয়ে বসেছিল। আমি অস্বস্তিবোধ করলেও তাড়াতাড়ি হেসে একটা কিছু ঠাট্টা করবার উপক্রম করছিলাম।

থমকে গিয়েছিলাম। কুসুমের শরীরটা থরথর করে কাঁপছিল, আর মাথাটা ক্রমেই নুয়ে পড়ছিল। আমি দু-পা এগিয়ে গিয়ে বলেছিলাম, কী হল রে।

কুসুমের রুদ্ধ কান্নার বেগ তাতে কমেনি। বরং আরো জোরে শব্দ করে কেঁদে উঠেছিল। আমি প্রথমে একেবারে হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে ডেকেছিলাম, কুসুম শোন্।

কুসুম কান্নারুদ্ধ গলায়, থেমে থেমে কোনোরকমে বলেছিল, তোমার পায়ে পড়ি টোপনদা, পুজো না হয় করব না, কিন্তু আমাকে আজ খেতে বলো না।

কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বিরক্ত যে না হচ্ছিলাম, তা নয়। কিন্তু ওভাবে জোর করে যে কাউকে খাওয়ানো যায় না, তা বুঝতে পারছিলাম। একি দুর্ভেদ্য অন্ধতা। একটা মেয়ে, ভয়ংকর দারিদ্র্যের মধ্যে লালিত, পেট পুরে দু'বেলা দুটি খেতে পাওয়া যার কাছে পরম ভাগ্য, সে তার বিশ্বাসের জন্যে খেতে চায় না, এর কী বিহিত আছে, বুঝতে পারিনে। ওর সেই ভয় ও অসহায় অবস্থা দেখে আমার কষ্টও হচ্ছিল।

বলেছিলাম, খেলে কী হবে কুসুম।

ও বলেছিল, আমার পাপ হবে।

—পাপ ? কেন ?

—আমি যে দিব্যি করেছি। এটা নিয়ে সাতটা উপোস হচ্ছে আর পাঁচটা হলেই হয়ে যায়। আর করতে চাইব না।

অবাক হয়ে বলেছিলাম, কার কাছে দিব্যি করেছিস ?

—তাঁরী পাড়ার ডেঙা শিবের কাছে।

ডেঙা শিব। আমাদের এই জেলায় ডেঙা মানে ছোট, বেঁটে। তাঁরী

পাড়ার মন্দিরে যাঁর অবস্থান, তিনি এই নামেই পরিচিত। এবং ডেঙা শিব-ঠাকুরটি যে অত্যন্ত জাগ্রত, তাও ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি। কুসুমের কথা শুনে আবার কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারিনি। সত্যি বলতে কি, হাসিও পাচ্ছিল। বলেছিলাম, আচ্ছা যা, ওঠ, এগুলো সব সরিয়ে পরিষ্কার করে ফ্যাল্।

তবুও কুসুম নিচু হয়ে, বাঁ হাতে আঙুল খুঁটছিল। বলেছিল, তুমি রাগ করছ না তো?

বলেছিলাম, রাগ করে আর কী করব। তুই তো কেবল কাঁদবি। তবু ওতে পাপটাপ সত্যি হয় না রে।

কুসুম বলেছিল, মানত করে ফেলেছি যে।

—কিসের মানত?

কুসুম ওর বড় বড় ভেজা চোখ তুলে একবার তাকিয়েছিল। অন্য সময় হলে কুসুম নিশ্চয় এরকম একটা গূঢ় সংবাদ ফাঁস করত না। তখন না করে পারেনি। যদিও কুসুম লজ্জায় পড়ে গেছিল। দ্বিধা কাটিয়ে বলেছিল, বাবার যেন সুমতি হয়, আর—।

—আর?

—তারকের সঙ্গে যেন বিয়ে না হয়।

এর থেকে পরিষ্কার আর কী হতে পারে। এবং এরকম দুটি কামনার পরিবর্তে, ডেঙাশিবের দরবারে বছরে বারোটা দিন উপোস করে থাকা কি খুবই তুচ্ছ নয়? তাতে লিভার খারাপ হোক, গ্যাসট্রিকের ব্যথাই হোক, এমন মনোস্কামনা সিদ্ধির মতো পরম শান্তি আর কী আছে।

খুব গম্ভীর হয়েই বলেছিলাম, তবে কার সঙ্গে বিয়ে হবে, সেটাও নিশ্চয় মানত করেছিস?

কুসুম ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে বলেছিল, তাই বুঝি আবার কখনো মানত করা যায়?

—যায় না?

—মোটেও না।

তারপরেই কুসুম তাড়াতাড়ি এঁটোকাঁটা পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেছিল। আমি আমার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলাম। আর কেন যেন বারে বারেই ঝিনুকের কথা মনে পড়েছিল। তার কোন উপোস মানতের কথা আমার জানা ছিল না। ভাবছিলাম, দু'জনেই মেয়ে, অথচ কত তফাত। কুসুম যখন বড় হবে, তখন কি আর ওই সব বিশ্বাস কাজ করবে? না কী জীবনের প্রত্যক্ষ গতিই কোনো জটিল বিড়ম্বনার সৃষ্টি করবে? তা যেন না করে। কুসুমের প্রার্থনা তো সাধারণ। এটুকু যেন সার্থক হয়। ও তো অনেক সহজ। ওর কষ্ট যেন কম হয়।

আবার কুসুমের মুখ উঁকি দিয়েছিল। মনে হয়েছিল পেট পুরে খেলেও

কারুর মুখ অমন উজ্জ্বল আর তৃপ্ত দেখায় না। আমিষ ঘেঁটে স্বভাবতই আবার স্নান করে, ধোয়া শাড়ি পরেছিল। কুসুমের শাড়ি পরার যে কী প্রয়োজন, জানিনে। অকারণ অনেকখানি বড় দেখায়। বলেছিল, টোপনদা, যাচ্ছি।

গম্ভীর গলাতেই বলেছিলাম, দেরি করিস না যেন।

—না, পিশীর সঙ্গেই আসব।

আমি মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিলাম। কুসুম তখনো দাঁড়িয়েছিল।

—কী হল ?

কুসুমের চোখের পাতা পড়ছিল না। আমার ভিতর পর্যন্ত যেন দেখতে চাইছিল। বলেছিল, সত্যি সত্যি রাগ করনি তো ?

বলেছিলাম, না, পালা এখন।

—কিন্তু রাত্রেরটা ঠিক থাকবে তো ?

ওটাই বোধহয় আসল জিজ্ঞাস্য ছিল। আমি যে আবার কুসুমের ব্রাহ্মণ। আমাকে খাইয়ে তবে ওর জলগ্রহণ। আমি শালঘেরিতে এসে পৌঁছুবার আগে ওর ব্রাহ্মণ ছিলেন ইস্কুলের হেডপণ্ডিত মশাই। যাই হোক উপোস যখন মেনেছিলাম, ব্রাহ্মণভোজন মানতে আর আপত্তি কী। বলেছিলাম, হবে খন

পরমুহূর্তেই কুসুম আমাকে অবাক করে দিয়ে, গড় গড় করে বলতে আরম্ভ করেছিল, come if you are ready—যদি তৈরী থাকো তো এস The sun sets in the west—সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। It rained all day—সারাদিন বৃষ্টি হল।…আর-আর It is five minutes to one—এখন একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী।

হুস্ করে একটা প্রকাণ্ড নিঃশ্বাস নিয়ে বলেছিল, হয়েছে টোপনদা। ভুল হয়নি ? ও হ্যাঁ, মিনিটস্, এম আই এন ইউ টি ই এস্, মিনিটস্। হয়েছে

কথা বলার তো অবসরই পাচ্ছিলাম না ওর কাণ্ড দেখে। বলা শুনে মনে পড়েছিল, ওকে যে ট্রানসেলেশন করতে দিয়েছিলাম, ওগুলো তারই জবাব এবং উপোসের অনুমতি দেবার প্রতিদান হিসেবেই যে কুসুম সেই মুহূর্তে আমাকে নির্ভুল ট্রানসেলেশন উপহার দেবে একেবারেই বুঝতে পারিনি। তা কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলাম, মুখস্থ কে ফেলেছিস বুঝি ?

কুসুম ঘাড় কাত করে ভুরু কুঁচকে বলেছিল, ইস্। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞে করে দেখ না বলতে পারি কি না পারি। 'ক্রিয়া পদের বিভিন্নতা' বলে গুলোন পড়তে বলেছিলে, তার থেকেই তো করেছি।

আমিও সহজে ছাড়বার পাত্র ছিলাম না। বলেছিলাম, বটে ? আচ্ছ তাড়াতাড়ি সেই কথাটার ইংরেজী বল্ তো, 'আমি চাই এটা এখুনি ক হোক।'

কুসুম এক মুহূর্ত জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট নেড়ে ফিস

ফিস্ করেছিল। তারপরেই বলে উঠেছিল, I want it done at once.

একেবারে নির্ভুল জবাব। আমি বিস্মিত প্রশংসায় ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিল, হয়েছে ?

বলেছিলাম, খুব ভাল হয়েছে।

জবাবে কুসুমের জিভ বেরিয়ে পড়েছিল কোঁচকানো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। একবার নয়, তিনবার জিভ ভেংচে ও ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। ভয় পেয়েছিলাম, আছাড় খেয়ে না পড়ে। তারপর আপন মনে একলা ঘরে না হেসে পারিনি। কার যে কিসে আনন্দ। উপোস করাটা কি কুসুমের কাছে কেবল ছেলেমানুষি খেলা। সমস্ত ঘটনাটা তো আমার কাছে সে রকমই মনে হয়েছিল। সেই হাসিখুশির আবহাওয়া তো আমি এক কথাতেই থম্‌থমিয়ে তুলেছিলাম। কী লাভ! ওই খুশিটুকু থেকে ওকে বঞ্চনা করলে, নিজেও হয় তো কিছুটা বঞ্চিত হতাম।

তাই এই পরাভবকে আমি স্বীকার করেছি। স্থির করেছি, এ বিষয়ে ওকে আর কিছু বলব না। পিশীমা যে কী খুশি হয়েছিলেন, তাঁর মুখের অনির্বচনীয় হাসি এবং 'মুখ-পুড়ির ওই ঠিক সাজা' বলা থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ঝিনুক বিরক্ত হয়েছিল। ও মেনে নিতে পারেনি। আমি যে কুসুমকে অন্যায় ভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছি, এ বিশ্বাস থেকে ওকে টলানো যায় না। বলে, 'এখন বুঝবে না, পরে বুঝবে।'

কী যে বুঝতে হবে জানিনে। আমি ঝিনুককে বোঝাতে পারিনে, আমার জীবনের আবর্তে, অন্তস্রোতের টান ভাটায় কুসুম কোনো সমস্যা নয়। মোটামুটি তার ভালো মন্দের খবরদারি করতে পারি। আবার যেমন ইচ্ছে, তেমন করে আর গড়তে পারিনে। বকি ঝকি ধমকাই শাসন করি, স্নেহ ও আদর করি, তবু জানি ও হরকাকার মেয়ে। আমার সব কিছুই সীমাবদ্ধ। এসব মানলে, পরে বোঝাবোঝির আর কী থাকতে পারে, আমি জানিনে। অতএব, এ বিষয়ে ঝিনুকের সঙ্গে তর্ক ত্যাগ করেছি। ও যা বলে, শুনে যাই।

তবু, জীবনের চারপাশে অনেক অসহায়তা সত্বেও ছেলেমানুষ কুসুমের নানান উদ্দীপনা, ওর হাসিখুশি ছুটোছুটি আমার ভালো লাগে। ওর উপোসের প্রার্থনার মধ্যে একটি ভারী তেজালো সৎ মেয়েকে আমি দেখতে পাই।

আর কুসুমকে দেখতে হয়, যখন হরলাল কাকার সঙ্গে কথা হয়, ঝগড়া করে। সে চেহারা আলাদা। আমার একটু লজ্জা করে, বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে উঠি, কিন্তু কুসুমকে সামলানো যায় না।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলাতেই একবার হরকাকা আসেন তাঁর বৌঠানের সংগে দেখা করতে। তখন তো এক প্রস্থ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ছুঁড়ে মারা আছেই। কুসুম সে সব আড়াল থেকেই মারে, হরকাকা শুনেও না শোনার মতো নির্বিকার থাকেন। আমি অনেকদিন বারণ করেছি, 'শত হলে বাবা তো, অমন করে বলিস না।'

তখন যে কুসুম ঠোঁট বাঁকায়, তা দেখবার মতো। বলে, 'বাপের বুঝি বিচার আচার নেই। আমি মায়ের মতন নয় যে, ছেড়ে কথা কইব।'

কুসুমের জন্য মাঝে দু'বার নগেন ডাক্তারকে ডাকতে হয়েছিল। খবরটা হরলালকাকা জানতে পেরে, দুবারই ছুটে এসেছেন। প্রথমবার এসে, ভর দুপুরে আমাকে ডেকে বললেন, হাঁ হে টোপন, নগা শুন্দুরকে তুমি আমার মেয়েকে দেখতে ডাকিয়েছিলে।

নগেন ডাক্তারকে উনি ওই নামেই ডাকেন। বললাম, হাঁ, তাতে কী হয়েছে?

অবাক হবার অবসর না দিয়ে হরলালকাকা চীৎকার করে উঠলেন, কী হয়েছে? আমার মেয়েকে দেখবে নগা শুন্দুর? কেন, দেশে কি আর ডাক্তার নেই?

অন্ততঃ এ'গাঁয়ে নেই, তা জানতাম। আর হরলালকাকাকে ধরলে, আছেই বলতে হবে। বললাম, আমাদের বাড়িতে অসুখ বিসুখ হলে উনিই তো আসেন বরাবর।

—তা আসুক গে, কিন্তু আমার মেয়েকে সে দেখবার কে?

আমার দ্বিতীয় জবাবের আগেই, কুসুম জ্বর গায়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দেখলাম কুসুমের মুখ উত্তেজনায় দপ দপ করছে। অথচ মুখে একটি বিকৃত হাসির ধার। তীব্র গলায় বলল, তবে কি আপনাকে ডাকতে হবে?

কুসুমের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে হরকাকা বলে উঠলেন, তোমাকে আমি বারণ করে দিচ্ছি টোপন—।

কথা শেষ করতে পারলেন না হরকাকা। কুসুম বলে উঠল, হ্যাঁ, হরলাল ডাক্তারকে যদি না ডাক এবার থেকে, তা হলে দেখে নেব।

ভেংচে, ব্যঙ্গ করে, উত্তেজিত কুসুমের জ্বরো মুখ অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, তুই উঠে এলি কেন?

হরকাকাও বলে উঠলেন, তুই কথা বলছিস কেন?

কুসুম তেমনি ছুঁড়ে মারা ভাবে বলল, না, তা বলব কেন? তুমি ভর দুপুরে মদ খেয়ে গেরস্থের বাড়িতে মাতলামি করতে আসবে, তোমাকে আমি বলব কেন? ফুল বেলপাতা দিয়ে তোমাকে পুজো করব।

হরকাকা চীৎকার করে উঠলেন, এ্যাইওপু, খবরদার বলে দিলাম। মুখ সামলে কথা কোস।

কুসুমও পা দাপিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠল, এস। মুরোদ নেই কানাকড়ি, দুপুর-বেলা আর মাতলামি করার জায়গা পেলে না। হাজারবার আসবে নগেন ডাক্তার, এখন বেরোবে কি না বল।

শুনি বুনো ওলের বাঘা তেঁতুল দরকার। এ প্রায় সেই রকমের। আমাকে কতক্ষণ বকতে হত জানিনে। হরকাকা দেখলাম পিছু হটলেন, যদিও সসম্মানে। অর্থাৎ বলতে বলতে গেলেন, আচ্ছা, আমিও দেখে নেব টোপন। মেয়ের যদি

।কটা কিছু হয়ে যায়, তা হলে আর একবার খুনের দায়ে জেলে যেতে হবে তামাকে। নগা শুন্দুরকেও আমি ছেড়ে কথা কইব না।

কুসুম সাঁ করে, উঠোন পেরিয়ে দরজার ওপরে গিয়ে পড়ল। চেঁচিয়ে লল, খুব হয়েছে, এখন পথ দেখ।

বলে সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমি কুসুমের জন্যেই ভয় পেলাম। গায়ে একশো এক-এর ওপরে জ্বর। তাতে এই উত্তেজনা দাপাদাপি। পিশীও াড়িতে ছিলেন না কিছুক্ষণ সময়ের জন্য। বললাম, করিস কী কুসুম। যা যা শুয়ে পড়গে যা।

কুসুম বিনা বাক্যে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি কাছে গিয়ে বললাম, হ্যাঁ রে, বাপকে অমন করে বলতে আছে?

কুসুমের কাঁথা মুড়ি দেওয়া তীক্ষ্ন চাপা গলা শোনা গেল, বাপ, অমন বাপের আমার দরকার নেই।

বললাম, না, তুই ওরকম বলিস নে, আমার শুনতে লজ্জা করে।

কুসুমের গলা শোনা গেল, আর আমার বুঝি বাবার জন্য লজ্জা করে না?

আর একদিনও নগেন ডাক্তারকে ডাকতে হয়েছিল। যদিও পিশী ও কুসুমের মতে ছোটখাটো অসুখ বিসুখে ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন নেই। তাদের কাছে ছোটখাটো অসুখ কী, কে জানে। এক শো দুই তিন জ্বর উঠে গেলে, সেটা ছোটখাটো মনে করতে পারিনে। অনেক সময় অনেক ছোটখাটো অসুখের কথা আমি পারিনে জানতেও। কারণ এক শো জ্বর নিয়ে কুসুম, রীতিমতো হেসে ছুটে ওর গিন্নিপনা বজায় রাখে। চোখে দেখে ধরবার উপায় থাকে না কিছু।

নগেন ডাক্তার এসে দেখে যাবার পরেই হরলালকাকা এলেন। কার কাছে যে খবর পান কে জানে। এসেই হাঁক দিয়ে ডেকে বললেন, অ হে টোপন, বলি টাকা কি তোমার বেশী হয়েছে?

বেরিয়ে এসে বললাম, কেন বলুন তো?

—তাই তো দেখছি বাবা। হাঁচি কাসি হলেই তুমি নগাকে ডাক। কেন গাঁয়ে কি আর ডাক্তার নেই?

সেই একই কথা। আমি জানি, ওঁর সব থেকে বেশী বিক্ষোভ, উনি থাকতে কেন নগেন ডাক্তার মেয়ের চিকিৎসা করবে। কী করব। আমাদের অপরাধ, আমরা হরলালকাকার ডাক্তারিতে আস্থা রাখতে পারিনে।

হরলালকাকা তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে, প্রায় চুপি চুপি গলায় বললেন, কেন মিছিমিছি ওকে বেশী টাকা দিয়ে ডাকতে যাও। তুমি তো বাবা লেখা-পড়া জানা ছেলে, বুদ্ধিমান। গাঁয়ের মধ্যে নগা দু'টাকা ভিজিট নেয়, আমার মাত্তর আট আনা। অথচ চিকিচ্ছে সেই একই হবে। একবার বুঝে দেখ।

আমার বুঝতে হল না। তার আগেই কুসুম কখন উঠে এসে দাঁড়িয়েছে।

সরু গলায় ফোঁস করে উঠল, খুব বুঝেছে, আর বোঝাতে হবে না। চিকিচ্ছে করতে চাও, না ভিক্ষে চাইতে এসেছ?

আমি ফিরে বললাম, উঠে এলি কেন কুসুম, শুতে যা।

হরলালকাকা বলে উঠলেন, আমি ভিক্ষে চাইতে আসব? শুনেছ টোপন, আস্পর্ধার কথা শুনেছ।

ঠোঁট বাঁকিয়ে, ঘাড় দুলিয়ে কুসুম বলল, খুব শুনেছে। কত টাকা চেয়ে মেগে নিয়েছ, তার হিসেব করগে, তারপরে আস্পর্ধার কথা বলতে এস।

কথাটা মিথ্যে নয়। ইতিমধ্যে হরলালকাকা আমার কাছে তাঁর ঋণের বোঝা বেশ ভারী করে ফেলেছেন। কিন্তু এতে উনি দমলেন না। চেঁচিয়ে বললেন, চেয়ে মেগে নেব কেন? ধার করেছি, ধার শোধ করব। এ তো সবাই করে।

—তবে তাই করো। আগে ধার শোধ করো, তারপরে আবার মাগতে এস।

এ সবই ঘৃতে আহুতি পড়ছিল। হরলালকাকা বললেন, দ্যাখ্ কুসি, মুখ সামলে কথা বলিস। আমি মাগতে আসিনি, চিকিচ্ছের কথা বলতে এসেছি।

ইতিমধ্যে পিশী এসে পড়লেন। বললেন, কী হয়েছে কী? সকাল-বেলাতেই এত হাঁক ডাক কিসের?

হরলাল বলে উঠলেন, আপনি আর মুখ বাড়িয়ে কথা বলতে আসবেন না বোঠান। মেয়েটাকে তো বিষ করে তুলেছেন, আবার আমার ওপরেই পেছন থেকে লেলিয়ে দেন।

কুসুম ঘাড় কাত করে বলে উঠল, দেয় বুঝি?

পিশী বললেন, লেলিয়ে দিই?

হরকাকা বললে, দেন বৈ কি, নিশ্চয় দেন।

—বেশ করবেন হাজারবার লেলিয়ে দেবেন।

কুসুমের তীব্র জবাব শুনে হরকাকা ক্ষেপে উঠলেন। পিশীকে বললেন, দেখুন, একবার দেখুন, কী চিজ্ তৈরী করেছেন।

পিশী বললেন, সে আমি দেখছি। এখন তুমি যাও দিকি, যাও।

হরকাকা ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, মনে করেছেন আমাকে এভাবে তাড়ালেই হবে? শুনে রাখুন, জেনে শুনে ও মেয়েকে আমি আর নষ্ট হ'তে দেব না।

কুসুম অবলীলাক্রমে, চোখ কপালে তুলে বলল, ও মা, তাই কি কখনো হয়? কখন যাব বল? এখুনি তোমার সঙ্গে যাব?

কুসুমের অমন ভঙ্গি দেখে বিরক্তিতেও আমার হাসি পাচ্ছিল। লজ্জাও করছিল। হরকাকা ততক্ষণে পিছনে ফিরেছেন। চলতে চলতে বললেন, পরের বাড়ি থেকে বাপকে অবগেরাহ্যি করা। মজাটা দেখাবো। মনে করেছিস, তোর নাগাল আর কেউ পাবে না। কী করে টিট্ করতে হয়…।

পিশী কুসুমকে ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। শুনতে পেলাম, পিশী বলছেন, কাঁদছিস কেন? তোর বাপ কি আজ নতুন ওরকম করছে? তুই কথা বলতে যাস কেন।

কুসুম বলল, গায়ের মধ্যে আমার জ্বলে যায়। টোপনদা যে কিছু বলতে পারে না।

আর একজন আছে তারকা অর্থাৎ তারক। হরলাল কাকার ভাবী জামাই বলে একরকম স্থির করেই রেখেছেন। যে সাত আট বিঘা জমি কাকীমার দৌলতে টিকে আছে, সেটা তিনি বড় জামাইকে দেবেন, এটাও ঘোষিত। এতে অপরাপরের মতামত না-ই বললাম, কুসুম বলেছে, খ্যাংরাতে বিশেষ কিছু মাখিয়ে একদিন না একদিন সে তারককে মারবেই। তারকও কিঞ্চিৎ সন্ত্রস্ত। দিনের বেলা উত্তরপাড়ায় ঢোকাই তার বন্ধ হয়েছে। কিন্তু রাত্রে হরলাল কাকার পিছু পিছু আসে। ও সময়টা হয়তো আমিও বাড়ি থাকিনে। কী করবে, তারক যে প্রেমে পড়ে গেছে। শুধু চুরি করে একটু চোখের দেখা বৈ তো নয়।

একদিন দুপুরের দিকে, সাধারণতঃ যখন বাড়ি আসি, তার আগেই ফিরে এলাম। রান্না ঘরে খুন্তি নাড়ার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ শুনতে পেলাম। ঘরের দিকেই পা বাড়ালাম। জানি কুসুম খুশি হবে, তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি। দালানে পা দেবার আগেই কানে এল, কে যেন ডাকছে, কুসি, এ্যাই কুসি।

গলাটা পুরুষের এবং স্বরটা ভেসে আসছে পিছনের বাগান থেকে। অবাক হয়ে ঘরে ঢুকে পিছনের জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম। দেখলাম, শ্রীমান তারক—অনেকখানি পশ্চিমে বেঁকে, পিশীর পাশের ঘরের জানালা দিয়ে, যেখান থেকে রান্নাঘর দেখা যায়, সেখান থেকে তারক জামরুল গাছের নিচে, কোমর ডোবা সন্ধ্যামালতীর ঝাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাপা গলায় ডেকে চলেছে, এ্যাই কুসি, কুসি!

হাসব না, রাগব, কয়েক মুহূর্ত বুঝতে পারলাম না। মনে হল পিশী বাড়ি নেই। ওদিকে খুন্তি নাড়া ও ছ্যাঁক ছ্যাঁক সমানে চলেছে। তাতে তারকের গলা চাপা পড়ে যাচ্ছে। আমার বাড়ি ঢোকা কুসুমও টের পায়নি। চুপ করেই রইলাম।

একটু পরেই রান্নাঘরের শব্দ থামল। তারকের ডাক এবার পরিষ্কার শোনা গেল। পরমুহূর্তেই কুসুমের বিস্ময়চকিত গলা শোনা গেল, কে রে?

—আমি, আমি রে কুসি।

তারকের গাল চোপসানো মুখে আমি হাসি দেখতে পেলাম। কচুরি-পানার শেকড়ের মতো এক মাথা চুল, ঘাড় কামানো তারকের খালি দেহটি লিকলিকে সরু পাকানো পাকানো।

কুসুমকে দেখতে পাচ্ছিনে। ওর গলা শুনতে পেলাম, আবার এসেছ

মরতে। জেঠিকে ডাকব?

তারকের হাসি বিস্ফারিত হল। বলল, তোর, জেঠি বাড়ি নেই আমি জানি। তাইতেই তো এলাম।

কুসুমের গলা, অ, খবর নিয়েই এসেছ! চেঁচাব দেখবে, এখুনি পাড়ার লোক জড়ো করে ফেলব বলছি।

তারক বলল, চেঁচাস না। এদিকে শোন না, একটা কথা বলব।

—কী কথা?

—এদিকে আয় না। সব কথা কি চেঁচিয়ে বলা যায়?

কুসুমের গলাটি নিতান্ত কচি। অন্যথায় যুবতী মেয়ের বয়ান বলে মনে হত। তারক এদিক ওদিক একবার দেখে, চাপা গলাতেই বলল, আহা, জানিস না যেন কী বলব। হরোকা' বলছিল, এই জষ্টি আষাঢ়েই বিয়ে লাগিয়ে দেবে, জানলি? তুই যেন অমত করিস না।

তারকের কথা শেষ হয়নি। কুসুমের গলা শোনা গেল, ওরে, আবার সেই কথা। বিয়ে না নুড়ো জেবলে দেব তোদের মুখে।

তারকের মুখ গম্ভীর হল। বলল, কেন নুড়ো জেবলে দিবি? চিরকাল কি তুই টোপন চাটুয্যের ঘরে আইবুড়ো হয়ে থাকবি?

কুসুমের গলা: সে কথা তোকে বলতে যাচ্ছি কেন রে মড়া। বিটলে, মাতাল, ওলাউঠো, আমি যার ঘরেই আইবুড়ো হয়ে থাকি, তাতে তোর কিরে, মা শেতলার অরুচি।

পিছনের বাঁশ ঝাড়ে শুকনো পাতার শব্দে তারক একবার পিছন ফিরে দেখল। তারপর বলল, তবে তুই কি ভেবেছিস টোপন চাটুয্যে তোকে বিয়ে করবে?

কুসুমের সরু গলায় গর্জন শোনা গেল, কী বললি ড্যাকরা? তুই বামুনের ছেলে, না বাউরির? খচ্চর, শুয়োর, ইতোর!

আমি আমার নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারক আর কুসুমের এ রকম বাক্য-বিনিময় এই আমি প্রথম শুনছি। রাগ দুঃখ এবং হাসি, এই তিনে মিলে আমার অবস্থা নিজের কাছেই অবর্ণনীয়। ওদিকের অবস্থাও অবর্ণনীয়। কুসুমের গালাগালিগুলি আর কান পেতে শোনা যাচ্ছিল না। কুসুমের গলা শুনতে পাচ্ছিলাম, এত বড় সাহস তোর, টোপনদার নাম মুখে নিচ্ছিস? নিব্বংশে, মড়ার মাথাখেকো, গরুচোর, গো-খেকো, তোর মুখে যদি না আজ আগুন গুঁজি—

দেখলাম, তারকের চোখে ভয় ও বিস্ময়। বলল, এ্যাই দ্যাখ্‌ জ্বলন্ত কাঠ তুলিস না ওরকম। আগুন নিয়ে খেলা নয় বলে দিচ্ছি।

কুসুমের গলা, খেলা! ওরে বিষ্টাখেগো!

হঠাৎ তারক ছিটকে খানিকটা সরে গেল, আর তৎক্ষণাৎ দেখলাম একটা আধ জ্বলন্ত কাঠ জানালা গলে সন্ধ্যামালতীর ঝাড়ে গিয়ে পড়ল। তারক

বলে উঠল, দ্যাখ্ তো, গায়ে লাগলে কী হত ?

কুসুমের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তারক সন্দিগ্ধ চোখে, বাগানের দরজার দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত পরেই, কুসুমকেও আমি দেখতে পেলাম বাগানে। ছুটে গিয়ে বড় ঢ্যালা তুলে, তারকের দিকে ছুঁড়ছে, আর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে। তারক বেগতিক দেখে, বাঁশঝাড়ের দিকে দৌড়ল। কুসুম থামল না। ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছন তাড়া করল।

দৌড়তে দৌড়তেই তারক বলল, দ্যাখ্ কুসি, মেয়েমানুষের এত তেজ ভাল নয়, আমি বলে দিচ্ছি।

দেখলাম কুসুমের লক্ষ্যভেদ একেবারে ব্যর্থ নয়। তারকের গায়ে এক আধটা গিয়ে ঠিক পড়ছে। নিতান্ত শুকনো মাটির ঢেলা তাই রক্ষে। সেই হলুদ মাখা ছেঁড়া ন্যাকড়ার আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। কুসুমের শরীরটি বারো তেরো বছরের ছেলের মতো। নীল জামাটি তাতে ঢলঢল করছে। চুল খোলা। সে দৃশ্য দেখে, অনেক দুঃখেও হাসি সামলানো দায় হয়ে উঠল আমার।

একটু পরেই তারক বাঁশঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আড়াল থেকেই তার তড়পানি শোনা গেল, আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। হরো বাঁড়ুজ্জের দেনা কী করে শোধ হয়, দেখব। আমার নামও তারক চক্কোত্তি।

কুসুম সে কথার কোনো জবাব দিল না। বাঁশঝাড়ের দিকে এলোপাথারি আরো কয়েকবার ঢিল ছুঁড়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারকের আর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। কুসুম ফিরে দাঁড়াল। সন্ধ্যামালতীর ঝাড়ের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে আপন মনেই ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগল, মড়া। এত লোক মরে, এটাকে ডেঙো শিব নেয় না ?

সন্ধ্যামালতীর ঝাড়ে তখনো ধোঁয়া উঠছিল। কুসুম জ্বলন্ত কাঠটি উদ্ধার করে বাগানের দরজার দিকে চলে গেল। রান্নাঘর থেকে কুসুমের গলা ভেসে এল, কতদিন জেঠিকে বলেছি, বাগানের পেছুতে একটু শক্ত করে উঁচু বেড়া দাও। তা আর কিছুতেই হবে না।

আমি তেমনিভাবেই জানালায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, কুসুমের অকালপক্কতায় কেন মিছে ভেবে মরি। এই আবহাওয়ার ও পরিবেশে কেমন করে আশা করি, ওর মন কাঁচা ছেলেমানুষের মতো থাকবে। আমি যে ছেলেমানুষির কথা চিন্তা করি, কুসুমের জীবনের চার পাশে কোথাও তার ছায়া নেই। বরং সেটা অবান্তর এবং হাস্যকর। জীবনের নানান আবর্তে পড়ে, ওর সবই জানা হয়ে গেছে। কে জানে, আরো কত জটিল গহনে কুসুমের মন চলা ফেরা করে।

এই সব মিলিয়ে বড় করুণ মনে হয় কুসুমকে। মনটা সহসা টনটনিয়ে উঠল। কী দুর্দৈব। কুসুম যেন এই পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। অথচ সত্যি একেবারে ছেলেমানুষ। আমার হয় তো এমনি একটি ছোট বোন

থাকতে পারত। গ্রামের অনেকের মতো খুব অল্প বয়সে বিয়ে করলে, প্রায় কুসুমের মতোই আমার একটি মেয়ে থাকত। এ অবস্থায় তার জন্যেও যা প্রার্থনা করতাম, কুসুমের জন্যেও তাই করি। ও যেন নিশ্চিন্ত নিরপত্তাময় পরিবেশে, সহজ সুখে থাকে। কুসুম তাড়াতাড়ি বড় হোক, বড় হোক।

একটু পরেই দালানে পায়ের শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তেই আমার ঘরের দরজায় কুসুমের গলার অস্ফুট আর্তনাদ। আমি সহসা পিছন ফিরে তাকালাম না। ওর বিস্মিত সন্ত্রস্ত গলা শুনলাম, কখন এলে টোপনদা ?

না ফিরেই বললাম, কাঠটা উনুনে গুজেছিস তো, নাকি এখনো বাইরে রেখেছিস। তা হলে একটা লঙ্কাকাণ্ড হবে।

আর সাড়া নেই। পিছন ফিরে দেখি, কুসুম অদৃশ্য। এগিয়ে দেখলাম দালানেও নেই। দালান পেরিয়ে, রান্নাঘরের পিছনে ইদারাতলায় দেয়াল ঘেঁষে কুসুম মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। দেখলেই বোঝা যায় ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানিও শক্ত, ভ্রূকুটি দৃষ্টি স্থির। যেন কিছু বললেই প্রতিবাদে ফেটে পড়বে। আমি বললাম, কী রে।

বাকী কথা শোনবার আগেই ও বলে উঠল, তা আমার কী দোষ। তারকা আমার পেছুতে লাগতে এল কেন ?

এক মুহূর্ত দেখেই বুঝতে পারলাম, কুসুম ভেবেছে, ওর ব্যবহারে আমি রাগ করেছি। সুযোগটা ছাড়তে চাইলাম না। বললাম, তা বুঝলাম। কিন্তু অমন গালাগালিগুলো—।

কুসুম তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তা আমার মুখ ওরকমই খারাপ। এ কুসুম কিন্তু আলাদা। এ ওর সেই বেঁকে যাওয়া ভাব। মাঝে মাঝে ও নিজেই যেমন বিরক্ত গম্ভীর ও শক্ত হয়ে যায়। এখন তো তবু মোটামুটি কার্যকারণ বোঝা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তাও বোঝা যায় না। তখন আমি বিস্মিত হই, পিশী চটেন।

জানি এসময়ে কুসুম কিছুতেই আত্মসমর্পণ করে না। উল্টোপাল্টা বললে, ও বকবক করবে। তাই ধরে নিতে হয়, রাগ দুঃখটা ওরই এখন সব থেকে বেশী। বললাম, অ! তা হলে তো আমাকেও তুই ওরকম বলতে পারিস।

কুসুম চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ইস্‌, তাই কি না!

—নয় ?

—তুমি কি আমাকে তারকার মতন বলবে নাকি ?

—যদি বলি ?

কুসুম সন্দিগ্ধ বড় চোখে আবার তাকিয়ে দেখল আমার দিকে। বলল, তাই কি না তুমি বলতে পার, আমি যেন বুঝিনে ?

এরকম অটল বিশ্বাস টলানো মুশকিল। ওর শক্ত আড়ষ্টতা কাটাবার জন্যে অন্য কথা বললাম, বাগানের পেছনে একটা পাকা পাঁচিল তুলে দিলে কেমন হয় রে ?

কুসুমের মুখের ভাব মুহূর্তে বদলে গেল। চোখে ঝলক লাগল। বলল, দেবে? খুব ভাল হয়।

বললাম, দিতেই হবে। অন্তত: তোর মুখটা তো তাতে শুদ্ধ হবে।

কুসুম ঠোঁট টিপে, প্রায় কানের কাছে চোখের মণি টেনে আমার দিকে তাকাল। তারপর আমি ঘরে ফিরে গেলাম। পিছন থেকে কুসুমের চীৎকার শোনা গেল, আমার রান্না হয়ে গেছে কিন্তু। আবার যেন এখন বেরিও না।

শালঘেরিতে গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা দেখা দিল। সূর্যোদয় হতে না হতেই যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো মাটি তেতে ওঠে। ঘরের বাইরে এক মুহূর্ত চোখ রাখা যায় না। দৃষ্টি ঝলসে যায়। চারদিক শাদা আগুনের শিখা কাঁপতে থাকে, সাপের মতো ফণা তুলে দোলে। শালঘেরির কাঁকুর পাথুরে রক্তাভ মাটি জ্বলন্ত উনুনের মতো গন্‌গন্‌ করে। তার সঙ্গে লু। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঝলসে দিয়ে যায়। মানুষ পশু পাখী পতঙ্গ সকলেই ছায়ান্ধকার খুঁজে ফেরে।

এ সময়ে শ্রমজীবি মেয়েপুরুষেরা তাড়ি আর আমানির সহায় নেয়। আমাদের এখন প্রায় প্রতিদিনই ঠাণ্ডা কড়ায়ের ডাল, আলু-পোস্ত, পোস্তর বড়া আর পুরনো তেঁতুলের অম্বল। আর কিছু ভালও লাগে না।

গ্রীষ্মের এই রুদ্র দাহের পর এল বর্ষা। গাছগুলি কৃষ্ণ সবুজ হয়ে চিকচিক করতে লাগল। মাটি গাঢ় লাল, কিন্তু স্নিগ্ধ দেখালো। তারপর দূরে শাল-বনের দিকে তাকিয়ে, একদিন শরতের আবির্ভাব দেখতে পেলাম।

এই যে দিনগুলি যায়, এই দিনগুলিকে কাজহীন জীবনে দীর্ঘতর মনে হওয়াই তো উচিৎ ছিল। কিন্তু অস্বীকার করি কেমন করে, তা মনে হয়নি। বিচারের অবসর পেলাম না, যাচাইয়ের উৎসাহ পেলাম না, কী একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে দিন কেটে যায়। কিংবা সেই অবসর আর উৎসাহকেই ভয় পেয়েছি, সরিয়ে রেখেছি দু'হাত দিয়ে। একটা স্বপ্নের মধ্যে যেন নিবিড় নিবিড়তর হয়ে ডুবে যাচ্ছি।

একদা ছিল পুবপাড়ার হাতছানি। এখন দক্ষিণ। কিন্তু একটু কি চোখ চেয়ে দেখিনে, সকল ব্যাপ্তি কত জটিল বেড়ায় আমাকে ঘিরে ফেলছে?

এদিকে কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। সিন্ধু উপত্যকার অভিজ্ঞ কর্মী প্রত্ন ও নৃ-জ্ঞানী গোবিন্দ সিংহ চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, তামাইয়ের মাটির অন্তর্রহস্য জানবার আগে আমি যেন আরো অনুসন্ধান করে নিশ্চিন্ত হই। মাটি খোঁড়ার কাজটা যখন খুশিই সুরু করা যায়। তার আগে জানা দরকার, হিসেবে কোথাও ভুল হচ্ছে কি না। আমি আরো নিদর্শন সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। গোবিন্দবাবুর সাহচর্য নিয়ে প্রথম মাটি খোঁড়ার কাজ সুরু করব। ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে একটি লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়।

গোবিন্দবাবুই তা আমাকে সংগ্রহ করে দেবেন।

মাঝে মাঝে বিজনে যাই। অর্থাৎ আমাদের শালঘোরির স্টেশনমাস্টার বিজন ঘোষের ওখানে। উনি বলেছিলেন, সময় পেলে বিজনে আসবেন মাঝে মাঝে। আমি আর ভবেন, দু'জনেই যাই।

মিথ্যে নয় সত্যি সেটা ঘোর বিজন। সেই বিজনে আলো আছে, বাতাস আছে। আকাশে অনেক রং। কিন্তু ভদ্রলোকের রুদ্ধ কক্ষে কোথায় একটি কষে বাঁধা তারে টং টং করে একটি সচকিত আর্ত স্বর বেজে ওঠে মাঝে মাঝে টের পাইনে!

বাড়ি খাস কলকাতাতেই। এখানে নাকি পালিয়ে এসেছেন। এবং পালিয়ে এসে বেঁচেছেন। এখান থেকে আর কোথাও যেতে চান না। এই নাকি ভাল। ভোরে পাখীরা যায়। সন্ধ্যায় পাখীরা ফিরে আসে। গাড়ি যায়, গাড়ি আসে। উনি নিশান দেখিয়ে খালাস।

তবে এই অদৃশ্য রুদ্ধ কক্ষে তারকটাকে কে আঙুল দিয়ে টং টং করে? করুক। উনি কি খোঁজ রাখেন? এই নিরালায় আছেন বেশ। তবে মাঝে মধ্যে কেউ এলে একটু পরীক্ষা করে নিতে পারেন যে একেবারে বোবা হয়ে যাননি।

ভবেনের খুবই ভাল লেগেছে ভদ্রলোককে। আগে তো যেত সে। আমার বলতে ইচ্ছে করছিল, বিজনে আছেন বিজনবাবু। সেকথাটা একবারও ভুলতে পারছেন না। একটু স্বজনে গিয়ে বরং ভুলে থাকুন বেঁচে যেতে পারেন।

আর বিজনবাবুর সবচেয়ে বড় অভিযোগ বচনের ওপর। বলেন, মশাই, ওই লোকটা আমাকে এখান থেকে ভাগিয়ে ছাড়বে। জানেন, লোকটা বদ্ধ মাতাল। আর আমাকে খালি বলে, 'বাবু, বে'থা যদি না করে থাকেন, গিয়ে করে ফেলুন তাড়াতাড়ি। আপনার ব্যাপার খুব সুবিধার বুঝছি না'। কতবড় সাহস দেখুন দিখি?

আমি হাসি চাপতে পারিনি। এ হেন বাণী নিতান্ত বচনের না হয়ে যায় না। ওর কথার মধ্যে একটা সত্য যেন কৌতুকের বেশে মিশে থাকে। বিজনবাবু বলেছেন, আবার কি বলে লোকটা জানেন? বলে, 'বাবু, কাউকে যদি ঠিক করে থাকেন বে' করবেন বলে, তা'লে দেরী করবেন না। মেয়েমানুষের মন, এ বেলা হঁ্যা, ওবেলা না। জোর করে ধরে নিয়ে আসবেন।' কত বড় পাজী বলুন তো।

ভবেন আর আমি দুজনেই মুখোমুখী হেসে উঠেছি হা হা করে। দেখে বিজনবাবুই কেমন যেন অবাক হয়ে যান। তবু ভবেনের আর আমার হাসিটা থামতে অনেক সময় লাগে। তারপরে সন্দেহ হয়, আমরা বোধহয় হাসি না।

বিজনবাবুর স্টেশনমাস্টারের গলা বন্ধ কোটের পকেট থেকে প্রায়ই সিলার-শেলী, গ্যেটে বয়রণ ইয়েটস্ এলিঅটর কবিতার বই বেরিয়ে পড়ে। বলেন, যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটু আবৃত্তি করি।

আমরা সানন্দে সম্মতি দিই। বিজনবাবু কবিতা পড়েন। ও'র গলাটি সুন্দর, উচ্চারণ ততোধিক। আবৃত্তির সময় ও'র বাহ্যজ্ঞান থাকে না। গলার স্বর আশ্চর্য ছন্দে ওঠা নামা করে, কাঁপে কখনো। কখনো হাসেন, চোখের কোণে বড় বড় ফোঁটায় জল জমে ওঠে। আমি আর ভবেন মুখোমুখী, চোখে চোখে চেয়ে থাকি। হাসতে যাই, হাসতে পারিনে। একটা বিস্মিত জিজ্ঞাসা দু'জনের চোখে চিকচিক করতে থাকে। কখন যেন, চোখে আমাদেরও জল দেখা দেয়। এক সময়ে কবিতা পড়া শেষ হয়ে যায়। কিন্তু স্তব্ধতা ভাঙে না। তিনজনেই নীরব হয়ে বসে থাকি।

এই নীরবতার মধ্যে অনুভব করি, আমাদের সঙ্গে বিজনবাবুর একটা নিবিড় সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। এবং এমনি নীরব নিবিড়তার মধ্যেই একদিন ধ্বনিত হল, এই দূর নির্জনে নির্বাসনের, ছোট সাধারণ একটি কাহিনী। একজনকে ভুলে থাকার সহজ কাহিনী। অসহজ শুধু এই, বিজনবাবুর মনে হয়, এই বিশাল নির্জনতাটাও সেই ভুলে থাকতে চাওয়ার মানুষটিতেই পরিপূর্ণ। এমনটা নাকি হত না। একদা যার সঙ্গে মনের মানুষ পাতিয়েছিলেন, সে দেহ নিয়ে অন্য কোথা ছুটেছিল। তারপরে হঠাৎ সে সংবাদ দিয়েছিল, ভুল হয়েছে, ভয়ংকর ভুল। ফিরে যাবার পথ কি আছে?

না। পথ ছিল না। নেই এখনো। তাই নিজেকেই নির্বাসন খুঁজে নিতে হল।

সে দিন আমি আর ভবেন চোখাচোখী করে, হঠাৎ হেসে ফেললাম। বিজনবাবু অবাক হলেন, তাকিয়ে রইলেন কিন্তু কিছু বললেন না।

কেবল বচন মাহাতো তার কালো কুচকুচে নতুন যুবতী সঙ্গিনীটির কাঁধে হাত রেখে, দূর থেকে তাকিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, অই, ইস্টিশনটা পাগলা গারদ হয়ে উঠলে গ'।

গড়াইতে মহাদেববাবুর ওখানে ইচ্ছে করলেও যাইনি। ও'র ব্যাপার যা শুনেছি, সেটাও ভাল লাগেনি। আর অনিরুদ্ধ যে নেই।

আমার বুকের মধ্যে একটা দুরু দুরু শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। সে যে কিসের সংকেত, কার আগমনের অগ্রিম বার্তা জানাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারিনে। কেবল এইটুকু বুঝি, আমার অয়ন চলন একটা কক্ষপথে নির্ধারিত। আর ঝিনুক যেন একটা কেন্দ্রে বসে, সেই কক্ষের গতি নির্দেশ করছে।

পুবপাড়ার সেই ফুলটি যেন এতদিনে তার সব দল মেলেছে। এসে যে-রূপ দেখেছিলাম ঝিনুকের, এখন তার চেয়ে আরও বেশি রূপ যেন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে সর্বাঙ্গে। যেন নতুন করে খোলস ছেড়েছে সে। কেন এমন হয়, তা বুঝিনে।

এই আমার শালঘেরি ফিরে আসা। মহাকালের যে ধ্বনি বিরতিতে শোনা

যেত, সে এখন অষ্টপ্রহর বাজে আমার কানে। প্রত্যহের যে-রাগিণী ছন্দ ও আবেগের সঞ্চারে আমার শালঘেরির জীবনকে হাসাবে কাঁদাবে ভেবেছিলাম, সে রাগিণী বাজল না। মহাকালের গুরু গুরু ধ্বনি আমাকে প্রতিনিয়ত জটিল ও রূঢ় চেতনার সীমায় রাখলে দাঁড় করিয়ে। তারই পায়ের চিহ্ন হাতের বেষ্টনীকে আমি দেখতে পেলাম ঝিনুকের হাতে পায়ে, শালঘেরির আকাশ মাটি ঘিরে।

ভবেনের সংসারে আমি প্রত্যহের তৃতীয় ব্যক্তি। ভবেন বলে, ভুল বলছিস টোপন। শুরু থেকে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে আমি আছি। শুধুমাত্র সময়ের কুটিল চালে একটা অনিয়ম ঘটে গেছে।

এমন সহজ উক্তিতে আমি থমকে যাই। মেনে নিতে পারিনে। অথচ প্রতিবাদ করার মতো কথা মেলে না। তর্ক বৃথা। কারণ, মনে হয় বিচারের অবকাশ রাখেনি ঝিনুক।

ভবেনের বাগানে ফুল ফোটেনি। যদি এমন বলতে পারতাম, কার বাগানে বা ফুটেছে? আমার বাগান নেই। ঝিনুকের বাগানেও কি সে ফুল ফোটাতে পেরেছে?

কিন্তু এমন বলা, ভাবা, সবটাই অবান্তর। সংসার এমন একটি অনিয়মের ব্যাপার কারুর মনঃপূত নয়। কিন্তু সংসারে কবে কার মনের মত হয়েছে?

কালের মত সংসার নিরবধি। তার সামাজিক আবর্তে আমরা ঘুরছি। সেইখানে আমরা চিত্রিত। বিচিত্রের এ কারসাজি সেখানে লক্ষ্যণীয় নয়।

তাই তামাইয়ের ধারে দাঁড়িয়ে যখন ওপারের শালবনের দিকে তাকাই, তখনো অকৃতজ্ঞ হয়ে মুখ ভার করে থাকিনে। আমার নিজেরই রক্ত দিয়ে গড়া জীবনদেবতাকে নমস্কার করি। কারণ, জীবন বয়ে চলবে। তার সঙ্গে অন্তঃস্রোতের এ আবর্তও থামবে না।

তবু, তবু ভয়ংকর অস্থিরতা চেপে ধরছে অতি মন্থরে, ক্রমেই যেন একটা ফাঁস শক্ত হয়ে উঠছে। আমি যেন ভবেনের মুখের দিকে তাকাতে পারিনে। নিজের ওপর ক্রুদ্ধ বিরক্ত হয়ে উঠি। অথচ তাতে আমার পথের নির্দেশ বদলায় না।

ঝিনুক এখন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতেও আসে। পিশীকে সে খুশি করার চেষ্টা করে। কিন্তু পিশী খুশি হবেন না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, কুসুমের ওপর ঝিনুক খুব সদয় নয়। কারণ, কুসুমের সঙ্গে সে খুব কম কথা বলে। লোকের সঙ্গে ব্যবহারে ঝিনুক কখনো খারাপ নয়। কিন্তু হরলাল-কাকার ওপর খুব বিরক্ত। সংসারটাকে তিনি নষ্ট করছেন বলেই হয়তো।

কিন্তু ঝিনুক যখন কুসুমকে তার পুজো পাট উপোস নিয়ে গম্ভীর ভাবে বিদ্রূপ করে, তখন আমি অবাক হই, অস্বস্তিবোধ করি। বিশেষ করে পিশীর সামনে তা একেবারে অনুচিৎ। তাতে পিশী ঝিনুকের ওপর আরো বেশী রুষ্টই হন।

কুসুমের প্রতিবাদ করার সাহস নেই। বরং দেখি, ঝিনুকের সামনে কুসুম যেন বড় বেশী গুটিয়ে যায়। ঝিনুকের সামনে থেকে সরে থাকতে চায়। যেন ঝিনুককে ও ভয় পায়। এতে ঝিনুকের দায়িত্বই বেশী। সে কি একটু স্নেহ করে, সহৃদয় ভাবে কথা বলতে পারে না? কিন্তু আমি ঝিনুককে এ বিষয়ে শেখাবো, তা সম্ভব নয়। কারণ, ঝিনুক অচেতন নয়।

ঝিনুক এসে বলে, কি রে কুসি, পাকা বুড়ি, তোর ডেঙা শিবের মতি গতি কেমন?

কুসুম মুখ নীচু করে থাকে।' কোন জবাব দেয় না। কথাগুলি নিতান্তই ঠাট্টার, ঝিনুক বলতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে যদি হুলের খোঁচা থাকে তা হলে অস্বস্তি না হয়ে যায় না। তখন হয় তো পিশী ডেকে বলে ওঠেন, কুসি, সলতে পাকাবার ন্যাকড়া কোথায় আছে, একটু দেখে দে তো।

বুঝতে পারি, পিশী ইচ্ছে করেই কুসুমকে ডেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ঝিনুক এলে, অধিকাংশ দিন বিকেলেই আসে। বাহন হিসেবে ইন্দির আসে। সে পিশীর সঙ্গে বকবক করে। কুসুমকে আরবী ঘোড়ার গল্প শোনায়। যদিও আরবী ঘোড়া সে কখনো দেখেছে কি না সন্দেহ। কিন্তু সে যে একদা ঘোষালদের গাড়ি চালাতো, এই অধিকারে, স্বচক্ষে পক্ষীরাজ দেখার কথাও বলতে পারে। কোথায় দেখেছে সে আরবী ঘোড়া? 'আঃ! হরোঠাকুরের বিটি কী বোকা গ! ক্যানে, বরিশের জমিদার মুখুজ্জে মশায়দের বাড়িতেই ত আরবী ঘোড়া ছিল। পেকাণ্ড ঘোড়া, দু' মানুষ সমান উঁচা, আর সি জীবের কী বা গড়ন, কী বা বরণ! চকচকে সোনার মতন রং, উদিকে ল্যাজে ঝাপটা মারলেন ত গটা শরীলে ঢেউ খেলে গেল।'

তবে মুশকিল এই, ঘোড়াটি বুনো, বদ ভারী বেয়াদপ ছিল। ইন্দিরকেই তো মুখুজ্জেরা ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন আরবীকে বাগ মানাতে। ঘোড়া আজ একে লাথি মারে, কাল ওকে চাট মারে, পিঠে কেউ চাপতে গেলে জগঝম্প নাচ।

কিন্তু ইন্দিরের কাছে ওসব চালাকি করলে চলবে না। তুমি ঘোড়া, আমি মানুষ। তোমার পিঠে আমি সওয়ার হবই। তা সে তুমি যত বেয়াদপিই কর। ইন্দির বলে 'আমি আমার মনিবের হুকুম নিয়ে গেলাম। নিজের হাতে আচ্ছা করে বেটাকে খাওয়ালাম। গা হাত পা ডলে মেজে দিলাম'। কিন্তুক চখের নজরটি সুবিধের দেখলাম নাই। ত, পেথমে খুব চেঁচিয়ে হেঁকে গালাগাল দিলাম, "শালো, বানচত, ইঁদুরের বাচ্চা! শালো, আরবী না খচ্চর তুই! লজ্জা নাই রে তোর, পাপের ফলে ঘোড়া হয়ে জন্মিছিস। তোর চাইতে একটা কুত্তাও ভাল, সেও কথা শোনে। আর এত বড় শরীলটা তোর, ঘোড়া বলে কথা, তুই চখ পাকাচ্ছিস।"

'লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চেঁচিয়ে কুঁদে এমন বললাম, আরবী কান খাড়া করে ভয় ভয় চখে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি আস্তে আস্তে কাছে গেলাম,

মাথাটা নামিয়ে নিয়ে এসে, কানে কানে একটা মন্তর দিলাম। সে মন্তর কাউকে বলতে নাই। দেখলাম, সমীহের ভাব এসেছে। তা পরে গদী এ'টে রেকাব পরালাম, লাগাম বাঁধলাম। আপত্তি করলে না। হাতে চাবুক নিয়ে লাফ দিয়ে উঠলাম। পেথমটা শান্ত কিন্তুক শালো লড়বে না। পা দিয়ে পেটে গুতা মারলাম। পেছুকার দু' পা দিয়ে লাফিয়ে উঠল। সামনের দিকে হড়কে পড়েই যেতাম। তার আগেই লাগামে জোরে টান, আর চিহ'ী হ'ী হ'ী ডাক। ডাক দিয়েই দে ছুট। সি মানে তুমার, গুল্‌তির গুলির মতন ছুটলে। দুটো কাঁদর লাফিয়ে পার। বাবুদের সব লোক, বরিশের তাবত মানুষ হায় হায় করতে লাগল, আমার মরণ আর ঠেকাবে কে। কিন্তুক আমি ইন্দির সহিস। তুমাকে দিয়ে আমি গাড়ি টানাই, আর এখন ত ঘাড়ে চেপে আছি। ফ্যাল্ দিকি নীচে। লাগাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাইরে নিয়ে গেলাম। সি কী দৌড়। আরবীর পা নাকি দেখা যাচ্ছিল নাই। মাঠ মাটি পাথর, কিছু বাকী রাখে নাই। আমি গায়ের চামটির মতন পিঠে চেপে রইলাম। তা পর ঝাড়া তিন ঘণ্টা দৌড়ে লাফিয়ে বাছাধনের হাঁপ ধরল, শান্ত হল। কিন্তু আমি ছাড়বার পাত্তর নই, এই সুযোগ। দোষ করেছ, শাস্তি লাও। একটা গাছের সঙ্গে বে'ধে খুব চাবকালাম। আবার গালাগাল দিলাম। পিঠে চেপে ফিরে এলাম, আস্তাবলে। ছিমান তখন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। কিন্তুক তাড়াতাড়ি নিজের হাতে আবার খেতে দিলাম, গা ডলে ঘষে খুব আরাম দিলাম। সাত দিন। বুঝলে গ দিদি, সাত দিনে আরবী মানুষ হয়ে গেল।"

এমনি নানান গল্প সে কুসুমকে শোনায়। কুসুম বড় বড় চোখে হা করে শোনে। আমার সামনে অবশ্য ইন্দির গল্প বলার তেমন উৎসাহ পায় না। বুঝতে পারি, তার মন আর আবেগ দিয়ে আমাকে যেমনটি দেখতে চেয়েছিল, তেমন আমি নই। আমি তার অপছন্দের তালিকায় স্থান পেয়েছি।

গল্প বলার জন্য কুসুমকে বা পিশীকে না পেলে ঝিনুকের অনুমতি নিয়ে ইস্টিশনের পাকা রাস্তায় একটু পাক দিয়ে আসে। ঝিনুক সরাসরি আমার ঘরে চলে আসে। নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারিনে, আমি অস্বস্তিবোধ করতে থাকি। সারা বাড়ির মধ্যেই একটা অস্বস্তি ঘিরে আসে।

ঝিনুক নিশ্চয় তা বোঝে। কিন্তু মেনে নিতে চায় না। আমি বলি, 'তুমি আবার এলে কেন। আমিই তো যেতাম।' ঝিনুক বলে, 'মাঝে মাঝে ফাঁক দাও বলেই, ভয় পাই, আজ বুঝি এলে না। তাই আগে আগে চলে এলাম।'

এমনি করে বললে কোনো কথা বলতে পারিনে। শুধু ঝিনুকের চোখের দিকে তাকাই। সেখানে উপহাস বিদ্রুপের কোনো চিহ্নই নেই। বরং ঝিনুকের সেই চোখের দিকে তাকিয়ে, আমার বুকের মধ্যে যেন একটা তীর বে'ধা পাখী পাখা ঝাপটাতে থাকে। চোখ ফিরিয়ে নিই। আবেগ ও যাতনার সংঘর্ষে, কথা আসে না মুখে।

ঝিনুক কিন্তু রেহাই দেয় না। বলে, মুখ ফিরিয়ে নাও যে? আমি

তাড়াতাড়ি বলি, ভবেন ইস্কুল থেকে বাড়ি এসেছে ?

ঝিনুক বলে, না। আনিদিকে বলে এসেছি। খবর পেয়ে সেও এখানেই চলে আসবে।

তাই আসে ভবেন। ঝিনুক এলে অধিকাংশ দিন ভবেনও আসে। রাত্রে আমরা তিনজনে এক সঙ্গে ফিরে যাই।

ঝিনুক কথার খেই হারায় না। বলে, কিন্তু এ কথা কেন বল ? আমি কি তোমার বাড়িতে আসব না ?

ঝিনুক 'তোমার বাড়ি' বলে, 'তোমাদের বাড়ি' বলে না। আমি বলি, তা কেন ? তুমি আবার এলে কষ্ট করে।

—কষ্ট ?

ঝিনুক অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যেন। তারপর অন্যমনস্কের মতই আপন মনে বলে, কষ্ট ! ক বছর তো কোথাও বেরুইনি। তখন যে জোর করে বেরোইনি তা নয়। সেটাও যেমন ইচ্ছে করে নয়, এটাও তেমনি ইচ্ছে করে নয়। সব আপনি আপনি হয়ে যায়। এর মধ্যে কষ্ট আছে কি না আমি জানি না। কিন্তু তুমি তো সে জন্যে বলনি।

আমি ফিরে তাকাই।

ঝিনুক আবার বলে, তুমি বল পিশীর জন্যে, পাড়ার লোকের জন্যে। তোমার অস্বস্তি হয়। আমার অস্বস্তি হয় না, আমার এ সব মনে হয় না। তোমার যে অস্বস্তি হয়, এও আমার সয় না। সংসারে সকলের জীবন কি এক রকম হয় ? হয় না। তবে আর সকলের কথা ভাবি কেন ? কারুর কথা ভাবব না। তুমি যদি বারণ কর, আলাদা কথা।

বলে আমার চোখের দিকে তাকায়। যেন আমার ভিতর অবধি দেখে নিতে চায়। আমি মনে মনে বলি, সকল বারণের পথ আগলে রেখে, এ কথা বললে, আমি কি তার জবাব দিতে পারি ? জানি, ঝিনুক বারণ বলে কিছু রাখতে রাজী নয়। আমার সব কথা তো সেখানেই ফুরায়! আমার সব প্রশ্নের সেখানেই অবসান।

তবু সেই যে আমার বুকের মধ্যে দুরু দুরু গুরু গুরু ধ্বনি, তাতে যেন অজস্র বারণের সংকেত আমাকে ইশারা করে। অনেক বারণ, অনেক বারণ। অথচ সে বারণ আমার মতোই অসহায়।

এসব কথা প্রথম প্রথম হত, এখন আর হয় না। এখন ঝিনুকের আসাটা সকল কথার ঊর্দ্ধে চলে গেছে। কিন্তু ঝিনুক সাঁঝবেলায় এসে যখন, কুসুমের হাত থেকে রান্নার দায়িত্বটা নিয়ে, হেঁসেলে পড়ে বসে, তখন পিশীর কাষ্ঠ হাসি দেখে আমিও বিব্রত হয়ে পড়ি। পিশী বলেন, আ হা হা, তাই কি হয়, তুমি এ বাড়িতে এসে রান্নার খেসমত খাটবে।

কথার সুরে পিশীর অনিচ্ছাটাই ফোটে। কিন্তু ঝিনুক এত সহজে সব চালিয়ে যায়, কিছু বলা যায় না আর ? বলে, শুধু বসে গল্প করব তার

চেয়ে টোপনদার রান্নাটা করে দিয়ে যাই।

আমি তাড়াতাড়ি হেসে বলি, তা হলে ভবেন আর তুমিও এখানেই খেয়ে যেও, সেই ভাবে রেঁধো। আমি বরং আনিদিকে বলে আসি। ভবেনকেও ডেকে নিয়ে আসি।

ঝিনুক খুব সহজভাবেই বলে, যাবে আর আসবে, একটুও দেরী করতে পারবে না।

এ রকম নির্দেশে যে পিশীর আপত্তি আছে, বুঝতে পারি, যখন তিনি বলেন, ওরে, ওরা পুরুষ মানুষ, ওদের কি ওভাবে বলা যায়, না, ওরা তা শোনে?

ঝিনুক অন্য দিকে মুখ রেখে শুধু বলে, শুনতে হবে পিশী।

পিশী নীরব হয়ে যান, আমি বেরিয়ে যাই। কিন্তু রান্নার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, সেই কুসুমের অবস্থা অবর্ণনীয়। এ রকম ক্ষেত্রে, প্রথম দু' একবার পিশীকে বলে কুসুম তৎক্ষণাৎ বাড়ি চলে গেছে। আমি না জেনে যখন খোঁজ খবর করেছি, তখন পিশী জানিয়েছেন, কুসুম তো নেই, ওর মার কাছে গেছে। আজ রাত্রে একেবারে খেয়ে দেয়ে শুতে আসবে।

আমি অবাক হয়ে বলেছি, তাই নাকি? কখন গেল, আমাকে কিছু বলে নি তো।

পিশী জবাব দিয়েছেন, আমাকে বলে গেছে। তুই ব্যস্ত ছিলি তাই তোকে আর বলে যেতে পারেনি।

সত্যি ব্যস্ত ছিলাম কি না, ভেবে নিজেই থমকে যাই। ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। পরে কুসুমকে জিজ্ঞেস করেও এক রকমই জবাব পেয়েছি, ঝিনুকদি রাঁধবে দেখে ভাবলাম, আজ মার কাছে চলে যাই।

আমি এক মুহূর্ত কুসুমের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করেছি, রাগ করেছিস নাকি?

অমনি কুসুমের মুখ নত হয়েছে। নিঃশব্দে ঘাড় নেড়েছে, ও রাগ করেনি। পরে বুঝেছি, রাগ নয়, কুসুমের কষ্ট হয়। ঝিনুকদি রাঁধে বলে নয়, ওর কোন সাহায্যেরও প্রয়োজন হয় না। ঝিনুক ওকে একেবারে রান্নাঘর ছাড়া করে দেয়। যেখানে ওরই পরিপূর্ণ অধিকার, সেখান থেকে মাঝে মাঝে বিনা নোটিসে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ মেনে নিতে পারে না। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া যে কুসুমের কাছে মর্মান্তিক, তা বুঝতে পারলাম, এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে ওকে কাঁদতে দেখে। কিন্তু এ কান্নার কোন যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাইনে। এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপার, এক ফোঁটা মেয়ে কাঁদে কেন? আমার বিরক্ত হওয়া দেখে, কুসুম আর কাঁদেনি। বাড়িতে ওর মায়ের কাছে পালিয়েও যায় না। লক্ষ্মী মেয়ের মতো বই নিয়ে পড়তে বসে। তাতে আমি খুশি হতে চেয়েছি, কিন্তু স্বস্তি বোধ করি না।

ক্রমে দেখছি, ঝিনুককে কুসুম সত্যি ভয় পেতে আরম্ভ করেছে। সেই

ভয়ের মধ্যে যেন একটা সম্মোহনের ভাব। ভয় পায় অথচ অবহেলা করতে পারে না।

একদিন ভবেন বলল, কুসুমের এ ভয় পাওয়াটা ভাল নয়।

—কেন?

—ভয় যদি কোনদিন ভাঙে, সেটা বড় দুর্দিন হবে।

আমি বিশ্বাস করিনে। কিংবা বলা চলে, কুসুমের ভয়ের ততোধিক মূল্য দিতে চাইনে।

ঝিনুকের আসার চেয়ে, তবু আমার যাওয়াটাই বেশী।

নিজের কাছে অস্বীকার করে লাভ নেই, ঝিনুকের কাছে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু নিজের মনেই এত বাধার কাঁটা-তারের জটলা যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মরি। এ আসলে আমার সেই, শালঘেরির ধুলো ছিটিয়ে না হাসতে পারা। বনের আড়ালে গিয়ে না কাঁদতে পারা।

আমাকে ঘিরে জমে উঠেছে নানান দেশী বিদেশী প্রত্নতত্ত্বের বই। সম্প্রতি সাঁওতাল পাড়ার করিক টুডু জুটেছে। তামাইয়ের ধারে ও আশে পাশে প্রাচীন বস্তুর সন্ধানে, সে আমার সঙ্গে থাকে। তাকে নিয়েই ঘোরা ফেরা করি। কিন্তু ঝিনুক আমার পড়া ও কাজকে যেন তেমন আমল দিতে চায় না। ইন্দিরকে দিয়ে যখন তখন ডেকে পাঠায়। ইন্দিরের ওপর এমন নির্দেশও থাকে, বাড়িতে না পেলে, যেখান থেকে হোক খুঁজে সংবাদ দিতে হবে। বুঝতে পারি, ইন্দিরের কাছে এ কাজটা মোটেই পছন্দসই নয় বরং আপত্তিকর।

ঝিনুককে গিয়ে রুষ্ট হয়েই বলি, এরকম যখন-তখন ডেকে পাঠাও কেন?

ঝিনুক চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা যায়।

বলে, আমি ডাকি আমার দায়ে, তোমার যদি ইচ্ছে না হয় এস না।

আমি তখন বলি, কথা বললেই তো দেখছি রাগ কর।

—সত্যি কথায় রাগারাগি কী আছে?

তারপরে আমাকে চুপ করতে হয়।

ঝিনুক হয় তো বলে, একটু চা করে দেব?

কিংবা বলে, কাজের মানুষ হয়েছ, কাজ কর না এখানে বসে বসে।

যদি বলি, এখন তামাইয়ের ধারে যাব, কাজ আছে।

ঝিনুক বলে, নিয়ে যাবে সঙ্গে?

ঝিনুকের চোখের দিকে তখন তাকিয়ে দেখেছি, সেখানে কোনো মিথ্যে ঠাট্টার কৌতূহল নেই। কিন্তু সে আহ্বান আমি কোনোদিনই করতে পারব না।

উপীনকাকার বাড়িতেও মাঝে মাঝে দেখা হয় ঝিনুকের সঙ্গে। আমি হেঁতালগাছটার দিকে তাকালে ঝিনুক আমাকে জিজ্ঞেস করে, যাবে?

—কোথায়?

—ওখানে?

যেন একটি দূরাগত রহস্যের ইশারার মত হেঁতালগাছের তলায় আঙুল দেখায় সে।

আমি তাকাই ঝিনুকের দিকে। তার দেহের রৌদ্রচ্ছটায় আমার চোখ ঝলকায়। রক্তে রক্তে সঞ্চারিত হয় সেই রোদ। আমি দেখি, তার রক্তাভ ঠোঁটে, দূরবিসারী চোখে, আকাশের সেই কবেকার খসে-পড়া তারায় আলো-ছায়ার খেলা। তার দুই প্রতীক্ষিত বাহুতে নিটুট যৌবনের দৃপ্তভারে, কোন্ অজানা আদিমকাল থেকে স্তম্ভিত তার গুরু ও বলিষ্ঠ নিম্ন শরীরে এক রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতা। এ কবেকার প্রতীক্ষা? সেই আদিম অজানা কালের বয়স কত? তার ওপর থেকে একটি স্পর্শের অতি প্রত্যক্ষ চেনা অনুভূতি আমার রক্তের মধ্যে দাপাদাপি করে। একটা দুঃসহ সুখে ও যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন চোখে যেন স্বপ্নের মতো, বিস্রস্ত বেশ, সুঠাম তনুর প্রত্যঙ্গ ভেসে ওঠে। গভীর তৃষ্ণায় মুখ নামিয়ে, দুটি রক্তাভ ঠোঁটের উষ্ণ ভেজা কম্পিত কপাটে, নিশ্বাসে, রক্তের ও প্রাণের তীব্র মদির গন্ধ পাই। আমার ভিতরটা কাঁপতে থাকে।

চোখ ফিরিয়ে হেঁতালগাছের দিকে তাকাই আবার। আর দূর থেকে যেমন দুরু দুরু শব্দে ঢাকের দগর ভেসে আসে, তেমনি আমার বুকের ভিতরে শব্দ বেজে ওঠে। সেই শব্দের ভিতর দিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভবেনের মুখ। রুদ্ধশ্বাস হয়ে বলি, না, যেতে পারব না ঝিনুক।

—কেন টোপনদা।

—ওইটিই আমার সান্ত্বনা ঝিনুক।

আজকাল ভবেনের মুখখানি প্রায়ই, আচমকা আমার চোখে ভেসে ওঠে। যখন একলা থাকি, যখন পড়ি, যখন চলি, হঠাৎ দেখতে পাই, ভবেন আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যেন একটি বিব্রত বিভ্রান্ত হাসি ওর মুখে। আমার এই দেখার ভিতর দিয়েই আবিষ্কার করি, ওর চোখের কোল বসে গেছে। ওর মুখের রেখাগুলি গভীর হয়ে উঠছে, শরীরটা শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমি দেখতে পাই, আর সেই বিষাণের গুরু গুরু ধ্বনি প্রবল হয়ে ওঠে। ভবেনের মুখের সঙ্গে আমার সেই গুরু গুরু ধ্বনির কী একটা যোগাযোগ যেন আছে।

তখন আর আমি স্থির থাকতে পারিনে। ভবেনের কাছে ছুটে যাই। কাছে গিয়ে বাস্তবেও দেখি, ভবেনের চেহারায় ভাঙন। লক্ষ্য পড়ে ওর চুলে পাক ধরেছে। কিছু বলতে পারিনে। শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

ভবেন বলে, কী রে?

আমি বলি, কিছু নয়। তোর কাছে আসতে ইচ্ছে করল।

তারপর দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকি, আর হঠাৎ দুজনেই হো করে হাসতে থাকি। আমি বলি, উল্লুক, হাসিস না।

ভবেন বলে, রাস্কেল, তুই তো হাসছিস।

তখন আমাদের কেউ দেখলে, পাগল ছাড়া আর কিছু ভাববে না। কিন্তু

আমি যেন কী বলতে চাই, বলতে পারিনে। কেউ যেন আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে। অথচ, কী একটা যেন আসন্ন হয়ে উঠছে! একটা ভয়ঙ্কর কিছু।

মাঝে মাঝে আমি আর ভবেন দাবা নিয়ে বসি অবসর সময়ে। আমাদের দুজনের মাঝখানে বসে ঝিনুক। ওকে দেখলে কেউ বুঝবে না যে ও দাবা খেলা জানে। কারণ, দাবার ছকের থেকে, আমাদের দুজনের মুখের ওপরেই ওর দৃষ্টি বেশী চলে ফিরে বেড়ায়।

আমি আর ভবেন খুব ভাল চালের খেলোয়াড় নই। মোটামুটি। ঝিনুক শুধু মাঝে মাঝে তার চুড়ি-পরা হাতখানি বাড়িয়ে, সহসা একটি করে চাল দিয়ে দেয়। কখনো আমার হয়ে, কখনো ভবেনের হয়ে। কিন্তু যার হয়ে যখনই দেয়, তখনই উল্টোপক্ষের নিশ্চিত মাত্।

আর এমন বিস্ময়কর সেই চাল দেওয়া ও মাত্ করা, আমরা দুজনেই অগম্য বুদ্ধি নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। যদি জিজ্ঞেস করি, এটা কেমন করে ঘটলো?

ঝিনুক হয় তো তখনই উঠে যেতে যেতে বলে, ওই ভদ্রলোক তো (অর্থাৎ ভবেন) বোড়ের চাল ছাড়া কিছু দেবেন না বলে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু তোমার ঘোড়া যে ওৎ পেতে আছে, তা লক্ষ্য করেননি। তুমি দিব্যি বোড়ে-গুলো গাপ করছিলে। তাই ডান দিকে ওঁর গজ সরালাম পেছনে। তারপর ঘোড়া মন্ত্রী সরিয়ে, বোড়ে দিয়েই কিস্তী মাত্ করলাম। ভুল হয়নি তো আমার!

ভুল? আমরা দুজনেই সেই আশ্চর্য নির্ভুল, নিশ্চিত মাত্ করা দেখে নির্বাক হয়ে থাকি। ঝিনুক চলে যায়।

আসলে দাবার ছকটি একটি যুদ্ধক্ষেত্রের মতো পুরোপুরি ঝিনুকেরই আয়ত্তে।

প্রথম দিন খেতে বসে ভেবেছিলাম, ঝিনুক যেন মহারাণী, আমি আর ভবেন তার বংশবদ প্রজা। সেটা যেন একটা নিষ্ঠুর সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু কুসুমের প্রতি ঝিনুকের বিরূপতা সমান। হয়তো, কুসুম যে আমার খাওয়া শোয়ার রক্ষণাবেক্ষণে আছে, এটা ঝিনুকের মনঃপূত নয়। আমার বিশ্বাস, কুসুমের জায়গায় যে কেউই থাকত তাকেই ঝিনুকের ভাল লাগত না। এটা কি অপ্রতিরোধ্য?

সবচেয়ে বাড়াবাড়ি হয়েছিল একদিন। কুসুমের বুঝি মাঝে কী ব্রত হয়েছিল, যা কুসুমদের মতো মেয়েরাই করে থাকে। সেই উপলক্ষে একজন ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণটা দ্বিপ্রহরে কুসুম আমাকেই করেছিল। যদিও নিমন্ত্রণটা আমাদেরই বাড়িতে এবং পিশী তাঁর থলি থেকে ওবাবদে ভালই খরচ করেছিলেন।

কিন্তু সেইদিন ঝিনুকও দুপুরেই নিমন্ত্রণ করে বসল। ঝিনুক সাধারণতঃ

রাত্রেই নিমন্ত্রণ করে। যদিও অবশ্য নিমন্ত্রণ কথাটার কোনো অর্থ হয় না। ঝিনুকের ইচ্ছেই নিমন্ত্রণ। কুসুমকে রাতের আশ্বাস দিয়ে আমি ঝিনুকের নিমন্ত্রণই রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু বিরক্তিটা আমি চাপতে পারিনি। বলেছিলাম, তোমার কোন উপলক্ষ নেই। ও বেচারীর একটা উপলক্ষ ছিল।

ঝিনুক বলেছিল, বিনা উপলক্ষ কারুরই নেই। আমি দেখছি, এসব ব্যাপারে কুসুমকে তুমিও প্রশ্রয় দিচ্ছ।

ঝিনুকের কথায় একেবারে অবিশ্বাসও করতে পারিনি। কুসুমকে যে পড়াশোনা করতে বলি, তাতে ওর তেমন উৎসাহ তো দেখতে পাইনে।

সেইদিন রাতে খেতে বসে কুসুমকে বলেছিলাম, এসব গেঁয়োমিগিবি তো খুব করছিস কুসুম। তোর দ্বারা কিছু আর হবে না। এবার ওই তারককে ডেকে সত্যি দু'হাতে এক করে দিই, মিটে যাক।

সেই মুহূর্তেই কুসুমের চোখ থেকে সব উৎসবের আলো নিভে গিয়েছিল। মন বিমর্ষ হলেও, আমি নরম হইনি।

এখন কুসুম রোজই একটু পড়াশোনা করে। আমার পড়ার তাড়া, পিশীর সংসারের তাড়া, দু'য়ের মাঝে ছুটোছুটি কুসুমের।

বছর ঘুরে আবার বসন্ত এসেছে শালঘেরিতে। এই যে ধুলো ওড়া, পাতা খসা, মাঝে মাঝে একটু রংএর ছোপ লাগা শালঘেরি, দেখলেই কেন যেন আমার মনে হয়, পৃথিবীর কোথায় একটা শক্ত বাঁধনে ভীষণ মোচড় লাগছে।

সেদিন প্রায় সন্ধ্যাবেলা সাঁওতাল সর্দার করিক টুডুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তামাইয়ের ধারে চলে গেলাম। ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি জিনিস আমার সংগ্রহে এসেছে। মাটির কয়েকটি ছোট পাত্র এবং দু একটি অলংকারের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছি। গোবিন্দ সিংহ ও মিহিরবাবুকে সে সংবাদ জানিয়েছি। গোবিন্দবাবুর আশা এখন অনেক বেড়েছে। তিনিও আমার মতোই প্রায় নিশ্চিত এখন, তামাইয়ের গর্ভ হয় তো একেবারে শূন্য নয়। আমি তাই প্রতিদিন, এই পড়ন্ত বেলায়, দিনের শেষে একবার তামাইয়ের ধারে না এসে পারিনে।

করিক চলে গেল তামাই পার হয়ে। শালবনের দক্ষিণে ওদের বস্তি। আমি সেই পাথরটার কাছে বসে রইলাম। অন্ধকার নামার আগে, নির্জন তামাইয়ের ধারে পাখীরা জটলা করছে।

শাল তালের ফাঁকে ফাঁকে এত পলাশের জটলা অন্য সময় টের পাওয়া যায় না। তামাইয়ের দু'পারেই পলাশের অজস্র রক্তিম ঠোঁট আকাশের দিকে মুখ বাড়িয়ে আছে। শালবনে এখন ঝিঁঝির ডাক ডুবিয়ে অষ্টপ্রহর বাতাসের গর্জন। রক্তধুলার ছড়াছড়ি।

সহসা পিছনে পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি ঝিনুক।

—এখানে কেন ঝিনুক।

—দেখলাম, তুমি এলে এদিকে।

—কোথা থেকে দেখলে।

—আমাদের বাড়ির জানালা থেকে।

অর্থাৎ উপীনকাকার বাড়ি থেকে। জিজ্ঞেস করলাম, ভবেন ফেরেনি স্কুল থেকে?

—তোমারই কাজে নাকি গেছে জেলা শহরে। ক্যামেরার ফিল্‌ম আনতে।

—কিন্তু ও নিজে গেল কেন? কাউকে দিয়ে আনিয়ে নিলেই তো পারত। আমি তো তাই বলেছিলাম।

—তা জানি না।

যে সব জিনিস তামাইয়ের ধারে কাছে পেয়েছি তার ফটো তোলার জন্যেই ফিল্‌ম দরকার।

দেখলাম, ঝিনুক তামাইয়ের ওপারে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আমি আর স্বস্তি পেলাম না। ইদানিং শালঘেরিতে আমাদের বিষয় কথা হয়। গ্রামবাসীর কৌতূহল জেগে উঠেছে। আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থা আর নেই।

বললাম, এভাবে হঠাৎ এসে পড়লে কেন? কেউ যদি আসে এখন এদিকে?

ঝিনুক বলল, এখন কেউ আসবে না।

—তুমি জেনে বসে আছ, না?

ঝিনুক তাকাল আমার দিকে। বলল, লুকিয়ে পড়ব পাথরের আড়ালে। এতবড় পাথরের আড়ালে লুকনো যাবে না?

বলে ঝিনুক আমার মাথার ওপর দিয়ে পাথরটার দিকে তাকাল।

ঝিনুক আজ চুল বাঁধেনি। আঁচড়ায়ওনি বোধ হয় ভাল করে। চোখের কোলগুলি বসা। গাল দুটি অতিরিক্ত লাল দেখাচ্ছে। ঠোঁটের কোণে একটু ক্লান্ত হাসি যেন এলিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু চোখ দুটিতে গাঢ় ছায়া।

বললাম, আড়াল করবার মত এ পাথর নয় ঝিনুক, চলে যাও।

ঝিনুক এগিয়ে গেল জলের দিকে। গিয়ে বসল। খোলা চুল পিঠ বেয়ে মাটিতে পড়ল তার। হাত দিয়ে সে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগল স্রোতের দিকে। যেন কী এক খেয়ালী তর্পণে সে ব্যস্ত।

এখন জল আরও কম। হাঁটুও নয়। পাথরে বাধা-পাওয়া স্রোতের শব্দ খুবই ক্ষীণ। শালবনের বাতাসে শোনাও যায় না।

ঝিনুক একবার ফিরে তাকাল। তারপর বাঁ হাতের আঙুল তুলে শালবনের দিকে দেখাল। আমার স্তব্ধ বুকে সহসা সেই গুরু গুরু ধ্বনি বেজে উঠল।

ঝিনুক জলে নামল। কিছু বলতে না বলতেই দেখলাম, ঝিনুক ওপারের কাছাকাছি। উঠে ডাকলাম, ঝিনুক।

ঝিনুক ফিরে তাকিয়ে হাসল, কিন্তু থামল না।

আমি জলের ধারে গিয়ে ডাকলাম, ঝিনুক কী হচ্ছে এটা? অন্ধকার হয়ে

আসছে।

ঝিনুক শালবনের উঁচুতে পা বাড়িয়েছে তখন। বনের ফাঁকে ফাঁকে ইতি-মধ্যেই অন্ধকার তার থাবা বাড়িয়েছে। বাতাসের ঝাপটায় কোটি কোটি শালফুল নাচছে বাতাসে তাল দিয়ে দিয়ে। ঝিনুককে পেয়েই যেন তাদের এত উন্মত্ততা।

একদা শালবনের ওই সীমানা লঙ্ঘন করে, তার নিবিড় জটাজুট ছায়ায়, ঝিনুকের সংকেতে হারিয়ে যাবার জন্যে ছুটে গিয়েছি। শুকনো পাতার শয়ানে ঝিঁ ঝিঁর ডাকের সঙ্গে, সময় কোথা দিয়ে গেছে, টের পাইনি। এখন আমার বুক কাঁপছে। গলায় স্বর নেই।

আমি আবার ডাকলাম, ঝিনুক।

ঝিনুক ক্রমেই বনের দিকে পা বাড়াচ্ছে। ঢুকলে আমি আর ওকে খুঁজে পাব না হয়তো। গাছের জটলার কোন অন্ধকারে আমিও হয়তো পথ হারাবো। সংসারের কাছে ঝিনুক আমাকে সেইখানে বেঁধেছে, যেখান থেকে আমি এর কোনো কৈফিয়ৎ দিতে পারব না।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম জল পার হয়ে। ওপরে উঠে বনের হাতায় ঝিনুকের সামনে গিয়ে তার মুখোমুখী দাঁড়ালাম।

ঝিনুক দাঁড়াল, কিন্তু মুখ তুলল না। দেখলাম, আমরা দুজনেই হাঁপাচ্ছি।

তারপর আস্তে আস্তে আমাদের নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল।

ঝিনুক চোখ তুলল। আমার দিকে তাকাল। তারপর বনের গভীরে অস্পষ্ট অন্ধকারেব প্রতি দৃষ্টিপাত করল।

আমি বললাম, ফিরে চল ঝিনুক।

ওর পিছনে পিছনে নামবার আগে, আমি একবার বনের দিকে না তাকিয়ে পারলাম না।

অন্ধকার তখন নেমেছে। উপীনকাকার বাড়ির দরজার বাইরে আমি দাঁড়ালাম। ভিতরে ইন্দিরের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। ইন্দিরের গলার স্বর শুনে থমকে গেলাম। আর এই বোধহয় প্রথম থমকে যাওয়া। কোথায় যেন একটা দ্বিধাবোধ আমায় বাধা দিল। অস্ফুট গলায় বললাম, যাচ্ছি।

ঝিনুককে বাড়ির দরজায় রেখে, হেঁতালের তলা দিয়ে চলে এলাম আমি। তখন আমার বুকের মধ্যে গুরু গুরু ধ্বনি এত প্রবল হয়ে উঠেছে, যেন বাইরে একটা শব্দ করে ফেটে পড়বে। কিন্তু আমি শান্ত হতে পারলাম না। একদিকে মাথার ভিতরে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা দুঃসহ যন্ত্রণায় মাথা ঘুরতে লাগল। বর্তমান ঝিনুক এবং অতীতের স্মৃতি, সব কিছুই আমার প্রাণের মূল থেকে, রক্ত মাংসের প্রবাহের যেন অতি তীক্ষ্ম ভয়ঙ্কর আয়ুধসহ সংগ্রামে নেমেছে। আর একদিকে অসহ্য আত্মগ্লানি। এই দুয়ের মাঝখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে, কেবল শুনছি সেই গুরু গুরু দূরে গর্জনের শব্দ। আর বারে বারেই, এই শব্দের

মধ্যে ভবেনকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। মনে হয় এর মধ্যে যেন মহাকালের বিশেষ একটা ইঙ্গিত আছে। এটা নিতান্তই তার ভয় দেখানো নয়। এই বুক কাঁপানোর মধ্যে কী একটা 'অসম্ভবের' সংকেত যেন ফুটে ওঠে।

ঝিনুককে ছেড়ে, বাড়ি এসে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। বাতি কমানো আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এ সব ভাবতে ভাবতে, সহসা একটা বীভৎস দুঃস্বপ্নের ঘোরে যেন আমি কাঁপতে লাগলাম। অসহায় পতিতের মতো, দারুণ বিপদগ্রস্তের মতো, আমি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠলাম, আমাকে রাস্তা দেখতে দাও, আমাকে দিক নির্দেশ কর।…

বলে আমি দু হাতে মুখ ঢাকলাম। আমি যে এই দুঃস্বপ্নের মধ্যে শুধু অকারণ অভিশপ্ত ভবেনকে এক বালিয়াড়ির বুকে কাঁটা ঝোপে দেখতে পেলাম, তাই নয়। দেখলাম, সে বুক চাপড়ে হাহাকার করছে। এই দেখার সঙ্গে, আমার নিজের সকল যন্ত্রণা মিলে, একটা অলৌকিক নির্দেশের আশঙ্কায় চোখ ঢেকে অন্ধকারে ডুবে রইলাম।

এমন সময়ে কুসুমের ভয় ভয় সঙ্কুচিত, একটু বিস্মিত গলা আমার কানে এল, যা ভেবেছি ঠিক তাই! আলো উস্‌কে দেব টোপনদা?

আমি তাড়াতাড়ি, প্রায় চুপিচুপি গলাতেই বলে উঠলাম, না থাক।

তাতে বিপরীত ফল হল। কুসুম ঘরের মধ্যে ঢুকে চলে এল। উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, কখন এসেছ? তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

আমি বলে উঠলাম, না না।

—তবে অমন করে ভূতের মত মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছ যে?

সহসা আমি একেবারে ফেটে পড়লাম, তুই যা এখান থেকে, যা বলছি! পালা।

কুসুম চকিতে ছায়ার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই আমি আমার ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু এ অনুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হল না। একটা শূন্যতায় আমি ডুবে গেলাম। কী করব, ভেবে না পেয়েই যেন আবার বাড়ির বাইরে চলে গেলাম। কোথায় যাচ্ছি, কোন্‌ দিকে যাচ্ছি, কিছুই জানি না। আমার কানে এল, দূরে কে যেন মত্ত সুরে চীৎকার করে গান করছে,

এ বড় সোখের রস ছিল,
কী দিয়ে করলে চোলাই
প্রাণে যেয়ে যাতনা হল।

হঠাৎ গান থেমে গেল। দুটি অস্পষ্ট মূর্তি আমার পাশ ঘেঁষে উল্টো দিকে চলে গেল। সন্দেহ হল, হরোকাকা আর তারক। হয়তো হরোকাকা আমাদের বাড়িতেই যাচ্ছেন। তারকই হয় তো চেঁচিয়ে গান ধরেছিল।

শেষ পর্যন্ত আমি তামাইয়ের ধারে চলে এলাম। দেখলাম, আমার সামনে সেই কালো পাথরটা! পাথরের গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলাম যেন।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে আমার নিশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। আমি বসলাম। তামাইয়ের কুলু কুলু শব্দ কানে আসছে। যে শব্দ ছেলেবেলা থেকে আমি অনেক কল্প কাহিনী শুনে আসছি। এপারের অন্ধকার শালবন থেকে অস্পষ্ট শালফুলের গন্ধ আসছে। চারপাশের অন্ধকারের নিবিড়তা কেটে গিয়ে, একটা অস্পষ্ট আলোয় আমি যেন আশেপাশের সবই দেখতে পাচ্ছি।

ক্রমেই আমার ভিতরের উত্তেজনা শান্ত হয়ে এল। আমি যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম, আমার ভিতরের যত আলোড়ন, সবই আমার নিজের প্রতি অবিশ্বাস ও ভয়। ঝিনুককে যেমন আমার জীবনে অস্বীকার করা যায় না, আমার ভিতরে যেখানে তার অবস্থান, সেখান থেকে যেমন তাকে সরানো যায় না, তেমনি এই অবিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিনিয়তই লড়তে হবে। এই ভয়কে সাহস দিয়ে জয় করতে হবে। আর আমার অন্তর্যামী বলে যদি কেউ থাকে তবে সেই জানে, ভবেন আর ঝিনুককে যদি খুশি দেখতে পাই, তা হলে আমার দ্বিধাহীন সাহস পরিপূর্ণ হবে। আমি বারে বারে উচ্চারণ করতে লাগলাম, সাহস, সাহস, সাহস।

এই সময়ে, সহসা আমার অন্তরাবদ্ধ দৃষ্টি সচকিত হল। একটু দূরে বাবলা ঝোপের কাছে যেন কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখলাম। ভাবলাম, শেয়াল। কিন্তু মানুষের উপস্থিতি টের পেয়েও শেয়াল যে ঝোপের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকবে তা সম্ভব নয়। সন্দেহ হল, অন্য কোনো জানোয়ার হবে। কারণ ঝোপের কাছে তার নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে। যেন একবার আড়াল ছেড়ে বাইরে আসছে, আবার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে আলো নেই, এক গাছা লাঠিও নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তীক্ষ্ন চোখে তাকিয়ে তখনো দাঁড়িয়ে রইলাম। আর দেখলাম, জানোয়ার নয়। ছায়াটা উঠে দাঁড়াতে টের পাওয়া গেল, মানুষের মূর্তি।

জিজ্ঞেস করলাম, কে? ওখানে কে?

—আঁমি।

একটু ভয় মেশানো সঙ্কোচে, ভাঙা ভাঙা সরু গলায় 'আমি' শব্দটা সেরকমই শোনা গেল। বললাম, আমি কে।

জবাব এল, তারক।

তারক। তারকা? বললাম, তারক? তা ওখানে কী করছো?

কোনো জবাব নেই। ডেকে বললাম, এদিকে এস।

তারক মাথা নিচু করে সামনে এসে দাঁড়াল। তারকই বটে। রোগা সরু শরীর, একেবারে খালি গা, চুলের বোঝাতেই মাথাটা বড় দেখায়। জিজ্ঞেস, করলাম, ওখানে কি করছিলে?

তারক পা দিয়ে পা ঘষে বলল, আপনার কাছে একটু এসেছিলাম। দেখলাম, একলাটি ইদিকে আসছেন, তাই মানে—।

কথা শেষ করল না। বললাম, পাহারা দিতে এসেছিলে?

তারক তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলল, না না। টোপনদার যে কী কথা।

প্রায় মেয়েদের মতোই সলজ্জ সুরে বলল তারক। অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। যদিও ওর মুখটা আমি মনে করতে পারছি। কুসুমের সঙ্গে এক সকালবেলার সেই দৃশ্য আমার মনে পড়ল। হাসি চাপতে কষ্ট হল। কিন্তু তারক হঠাৎ আমাকে 'একলাটি আসতে' দেখে তামাইয়ের ধারে কেন? বললাম, কিছু বলবে নাকি?

মনে হল তারকের সমস্ত শরীরটা হেলে দুলে মোচড় দিয়ে উঠল। বলল, হ্যাঁ। শুনে রাগ করবেন না তো?

একটু সন্ত্রস্তই হলাম তারকের ভূমিকা দেখে। বললাম, রাগের কথা তুমি বলবে কেন?

তারক চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। অস্বস্তি আর দ্বিধাতেই বোধ হয় ওর শরীর বারে বারে দুলে দুলে উঠল। তারপর বলল, অই মানে কুসির কথা বলছিলাম।

রাগ করব ভেবেও রাগ করতে পারলাম না। বরং একটু কৌতূহলই হল। বললাম, কী কথা?

আবার একটু চুপচাপ। তারপর বলল, বে'র কথা, কুসির বে।

ব্যাপারটা বোধগম্য হতে আর আমার দেরী হল না। রাগ করতে চেয়েও আমার কৌতুকের মাত্রাই বাড়ল। বললাম, কুসুমের বিয়ে? কেন, কোন ছেলে টেলে দেখা আছে নাকি তোমার?

তারক আমতা আমতা করে বলল, দেখা? হ্যাঁ, তা দেখা বলতে পারেন।

—কিন্তু কুসুম তো এখনো খুব ছোট, ছেলেমানুষ।

তারক অবাক সুরে বলল, টোপনদা যে কী বলেন। কুসি এই চৈতে পনেরোয় পড়ছে, আর কত ধাড়ি হবে?

তা বটে, তারকের কাছে এটাই যথেষ্ট। যদিও, চক্ষুষ্মান কোনো মানুষই বোধহয় কুসুমকে পনেরো বছরের মেয়ে বলবে না। আর বিবাহ সম্বন্ধে প্রস্তাবের কী উপযুক্ত সময় ও স্থান! কিন্তু এ ছাড়া তারকের উপায়ই বা কী ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, তা ছেলেটি কী করে, বয়স কত?

তারক ঢোক গিলল। একটা চাপা উত্তেজনা তার গলায়। বলল, তা ছেলের বয়স একুশ বাইশ হবে। বাপের কিছু জোতজমি আছে, এক ছেলে, সুখে দুঃখে একরকম চলে যাবে, বুঝলেন কি না টোপনদা।

—কোথায় থাকে, নাম কী, কার ছেলে।

প্রশ্ন করে আমারই নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল। তারকেরও জবাব দিতে দেরী হল। বলল, পাত্তর আমি নিজেই। মানে, কথাবার্তা একরকম হয়েছে···।

আমি ততক্ষণ হাঁটতে আরম্ভ করেছি। তারক আমার পিছনে পিছনে চলেছে। পাছে হাসতে হাসতেই ধমকে উঠি, তাই চলা ছাড়া উপায় ছিল না।

বললাম, ও ! তা কথাবার্তা কী হয়েছে ?

—কুসির বাবা, মানে হরোকা'র সঙ্গে।

—রাজী হয়েছেন ?

—এখুনি।

—তবে আর অসুবিধে কী ?

তারক আবার চুপ। তারপরে বলল, আপনার অনুমতি না হলে কুসি বে করবে না।

এবার আমাকেই চুপ করতে হল। তামাইয়ের বিস্তীর্ণ ঢালু প্রান্তর পার হয়ে গ্রামের কাছে এসে পড়েছি তখন। আমি দাঁড়ালাম। তারককে ধমক দিতে আমার ইচ্ছে করল না। জানি, এক কথায় তারককে ধমকে তাড়ানো সব থেকে সোজা। আর সেটাই বোধহয় সংসারের যথার্থতা। তারকের প্রেম খাঁটি কি না জানিনে। হতে পারে। পৃথিবীতে মানুষের সব অধিকার হরণ করা যায়। ভালবাসার অধিকার হরণ করা যায় না। তা সে তারক হলেও নয়। যাই হোক, নিয়মের যথার্থতা সবখানে চাপানো যায় না। তার চেয়ে, উপলব্ধিই ভাল। বললাম, বলে ভালই করেছ, কথাটা আমিও শুনেছিলাম। আমার কথা শুনবে ?

—হ্যাঁ।

—কুসুমকে তুমি বিয়ে কোর না।

—কেন ?

—যে তোমাকে বিয়ে করতে চায় না, তাকে বিয়ে করে কী লাভ। তুমি যাকে চাও না, তাকে কি তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছে করে ?

তারক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। বলল, কিন্তু আমি কী দোষ করেছি। আমি, একটা ব্যাটাছেলে বটে তো, নাকি ?

বললাম, তা যদি বল, দোষ তো তোমার অনেক, তুমি লেখাপড়া শেখনি, তার ওপরে নেশাভাং কর।

তারক সঙ্গে সঙ্গে, ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

—নেশাভাং করে শরীরটাকে জাহান্নামে দিয়েছ। এই বয়সে কিছুই আর বাকী রাখনি। তোমাকে তো ধাক্কা মারলে পড়ে যাবে।

—তা যাব না। এই সিদিনেও এক বস্তা ধান বই করেছি। তবে হ্যাঁ, ডাক্তারে বলেছে, আমার লিভারটি পোকা খেয়ে গেছে।

—তবেই বোঝ, এ বয়সে লিভার পোকা খেয়ে যাওয়া মানে, তার আর কী রইল। তার চেয়ে আমি বলি, তুমি একটু ভাল হবার চেষ্টা কর। বিয়ে থার কথা ভেব না এখন।

তারক বেশ সহজ হয়ে এসেছে। বলল, না বেথা আর কি, কুসিকে নিয়ে কথা। তা আপনি ঠিক জানেন তো টোপনদা, কুসির মন নাই ?

তারককে রীতিমতো করুণ মনে হল। আমি সত্যি বলতে দ্বিধা করলাম

না, না, মন নেই। ডেঙা শিবের কাছে সে মানত করেছে শুনেছি, যাতে তোমার সঙ্গে বিয়ে না হয়।

—অ!

তারক আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনি যখন বলছেন, তখন ঠিক। হরোকা বলেছিল কিনা, মেয়েমানুষের কথায় কিছু যায় আসে না।

আমি বললাম, ওঁর কথা তুমি বিশ্বাস কোর না।

তারক সঙ্গে সঙ্গে বলল, তা হলে হরোকা যে ঋণ করলে শুধবে কেমন করে।

—সে দোষ তো কুসুমের নয়। আর তুমি ভদ্রলোক, বামুনের ছেলে, তুমি কি পণ দিয়ে মেয়ে নেবে? সে আবার কেমন কথা?

—তা বটে।

একটু থেমে আবার বলল, তবে কুসি বলে কথা। কিন্তু আপনি ঠিক বলেছেন টোপনদা, যে আমাকে চায় না তাকে বে করে কী লাভ। এ রকম কথা আমাকে কেউ কখনো বলে নাই কি না। সত্যি তো, বে বলে কথা, স্বামী ইস্তিরি সম্পর্ক। তালে আপনি ঠিক জানেন তো টোপনদা, কুসি যে মুখনাড়া দেয়, ওগুলোন মিছে নয়?

এ কি আমারই মনের অবস্থার জন্যে, না কি তারকের সংশয় ও কষ্ট দেখে, জানিনে, জবাব দিতে একবার থামতে হল। কিন্তু তারককে নিরস্ত করাই উচিত ভেবে বললাম, ঠিক জানি, ওসবই সত্যি, তুমি বোঝ না?

তারক টেনে টেনে বলল, বুঝি। তবে মানুষের মন। আচ্ছা যাচ্ছি টোপনদা।

—হ্যাঁ এস।

অন্ধকারে কয়েক পা গিয়ে তারক দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, জানেন টোপনদা, অমন একটা ভাল মেয়ে সারা শালঘেরিতে নাই।

আমার হাসির মুখে প্রায় একটা ছুঁচ বিঁধিয়ে ব্যথা করে দিল তারক। বললাম, তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। ওকে আমি খুব জ্বালাতন করি, আর করব না। জানেন টোপনদা, যা বলব, হ্যাঁ, অমন তেজালো মেয়ে আর দুটি দেখি না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, মিছে বললে আমার জিভ খসে যাবে না। যাচ্ছি টোপনদা।

—এস।

অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল তারক। হঠাৎ ওকে আমার মহৎ মনে হল। জানিনে ভালো এবং তেজালো বলতে ওর ধারণা কী। কুসুমের এখনো চরিত্র বিচারের সে সময় এসেছে বলে মনে করিনে। কিন্তু তারকের কথাগুলোতে কুসুমের সৌভাগ্য মানাই উচিৎ। অল্প বয়সে মদ্যপ, রুগ্ন, মূর্খ, আমার চির বিতৃষ্ণা, উঞ্ছ ছেলেটার জন্য মনটা সহসা বড় বিষন্ন হয়ে উঠল। একটা

জায়গায় কি বিশ্ব সংসারের সকল মানুষই এক, যখন সে ভালবাসে ?

তামাইয়ের অভ্যন্তরের রহস্য জানবার জন্য আমি নিজেকে আরো বেশী ন্যস্ত করতে চাইলাম। জানবার ব্যাকুলতা তো আছেই। আমার নিজের মনে হল, যেন ততোধিক মনযোগ আমি দিচ্ছিনে। বিশেষ করে মনে হওয়ার কারণ এই, আজকাল আমাদের জেলা, জেলার থেকে বহু চিঠি-পত্র আমার কাছে আসে। তামাই সম্পর্কে নানান জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল সেই সব চিঠিতে। অনেকেই আমার প্রতিদিনের কাজ জানতে চায়। আমি কত দূর অগ্রসর হয়েছি, এ সম্পর্কে তাদের ব্যগ্র কৌতূহল ও উৎসাহ, কেন আমি জনসাধারণের কাছে সব সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছি না। অনেকে স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে কাজ করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে। শালঘেরি ও আশেপাশে গ্রামের কোন কোন ছেলে আজকাল আমার কাছে যাতায়াত করে। মাটি বা পাথরের, এমন কি লোহা ও তামার কোন জিনিস পেলেই আমার কাছে নিয়ে আসে। তার অধিকাংশই বর্তমান জীবন যাপনের পরিত্যক্ত ভাঙা জিনিস। ওদের দোষ নেই, চিনতে পারে না।

এই সময়ে গোবিন্দ সিংহর একটি চিঠি পেলাম। আমি ওঁর জন্যেই বিশেষ করে অপেক্ষা করছি। গোবিন্দবাবু লিখেছেন ; 'আমি বুঝতে পারছি আপনি আমার অপেক্ষায় খুবই ব্যস্ত হয়েছেন। সংবাদপত্রের দিকে চোখ দিলেই বুঝতে পারবেন, রাজনৈতিক আবহাওয়াতে কী রকম ঘূর্ণী লেগেছে। সম্ভবত আমাদের চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আগত। যে রকম ব্যাপার দূতীয়ালী ও আলাপ আলোচনা চলেছে, তাতে কেমন একটা ভয় ধরা বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। রাজনীতির সঙ্গে বরাবর সম্পর্ক রেখে এসেছি, সে জন্যে হঠাৎ এ সব ছেড়ে এই মুহূর্তে কোথাও যেতে পারছি না। আপনি আর কিছুকাল অপেক্ষা করুন, যদি আমার জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন বোধ করেন। অন্যথায় আপনি কাজে হাত লাগাতে পারেন আমি পরে গিয়ে আপনার সঙ্গে যোগ দেব।

'আমি জানি না, গত বছরের কলকাতার বীভৎস দাঙ্গার ঢেউ আপনাদের অঞ্চলগুলোতে কী পরিমাণ আঘাত করেছে। কলকাতার সর্বনাশ করে দিয়েছে। আর এ সবই ঠাণ্ডা মাথায় বেশ ষড়যন্ত্র করে. ভেবে চিন্তেই ঘটানো হয়েছে। ফলে বাংলা বিভাগ ঠেকানো যাবে না, স্বাধীনতার সঙ্গেই সেটা আসন্ন। ভবিষ্যৎ যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে কোনো আশা বা উৎসাহ পাচ্ছি নে। মনের এ অবস্থা বাইরে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আপনিই বা কী মনে করছেন জানি না। কারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন প্রবল আলোড়ন চলছে, সকলেই নতুন কিছুর জন্যে ব্যাকুল ও উন্মুখ। কিন্তু কোথায় তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বুঝতে পারছি না।

'কিন্তু এসব কথা লিখে অকারণ আর বিব্রত করব না। আমাদের পার্টি'ই যখন নিশ্চিত ভাবে সরকার গঠন করতে চলেছে. তখন আমার মনের এ

অবস্থায় কী রকম থাকতে পারি, সেটা জানাবার জন্যেই লেখা। যাই হোক, আপনি ইতিমধ্যে একটা কাজ করতে পারেন। গ্রীষ্ম এল, বর্ষারও বড় বিশেষ দেরী নেই। এ সময়টার মধ্যে, তামাইয়ের যে সব অঞ্চল আপনার এখনো দেখা হয়নি, সেগুলো দেখে নিতে পারেন। আপনি মোটামুটি শালঘেরির কাছা-কাছি অঞ্চলই দেখেছেন। আমি পুরনো ম্যাপ সংগ্রহ করে, তামাইয়ের উপত্যকা সীমানা দেখেছি। আপনি পশ্চিম দিগন্তে, বিশ পঁচিশ মাইল অঞ্চল একবার ঘুরে আসতে পারেন। হয়তো সে ঘোরা একেবারেই ব্যর্থ যাবে, তবু ক্ষতি নেই। সংবাদপত্রে লেখালেখি সত্ত্বেও, সকলের কাছে হয়তো সংবাদ পেঁছায়নি, পেঁছুলেও অনেকের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। একবার ঘুরে এলে হয়তো নতুন কিছু সন্ধান পেয়ে যেতে পারেন।

'আপনি লিখেছেন, "মাটি সম্পর্কে মানুষের এমন নিদারুণ মোহ, কেউ বিনামূল্যে সূচ্যাগ্র ভূমিও ছাড়বেন না।" সেটা খুবই স্বাভাবিক। আর দেশের বর্তমান আবহাওয়া এমন যে, এ সময়ে সরকারি আনুকূল্যের আশা আপনি করতে পারেন না। অবিশ্যি ব্যক্তিগত চেষ্টায় তামাই উপত্যকার ছোটখাটো কোনো অংশ আপনি খনন করাতে পারেন। তাতে জমি কেনার যে খরচ পড়বে, তা ভবিষ্যতে ফেরত পাবেন কিনা কে জানে। আর যদি আশা সফল হয়, তবে সর্বত্রই উৎসাহের সঞ্চার হবে। তাই বলছিলাম, আর একটু দেখে নিন।' ইত্যাদি ইত্যাদি।··· ···

গোবিন্দবাবুর চিঠি আমার কাছে একটি সম্পদ স্বরূপ। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে কোথায় যেন আমার একটা যোগসূত্র আছে। কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে তিনি যে সব কথা লিখেছেন, তাতে আমি এক মত। আমাদের এ অঞ্চলেও সেই বিষের হাওয়া পেঁছেছিল। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা এত অল্প যে, কোনো কিছুই ঘটেনি। কলকাতা থেকে মোল্লা মৌলবীরা মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামে আসছে, গোটা দেশটাই পাকিস্থান হয়ে যাবে, এ ধরনের নানান উত্তেজিত সংবাদ ও আলোচনার আলোড়ন কিছু চলছে। শালঘেরিতে এমন সব লোককে রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করতে দেখছি, যারা কোনোদিন এ জগতের সীমানায় পা দেয়নি। স্বয়ং অঘোর জ্যাঠা সভায় সভাপতিত্ব করছেন। হরলাল কাকাকে একদিন দেখলাম বাজারের কাছে কয়েকজনকে হাত পা নেড়ে আসন্ন স্বাধীনতার কথা বোঝাচ্ছেন। বিয়াল্লিশে যে পতাকা বে-আইনী ছিল, এখন হাতে হাতে সেই পতাকা ঘুরছে। অবস্থার যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথায়, কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে!

আমি যেন দেখছি, মানুষ স্বাধীনতা বলতে রাতারাতি হাতে হাতে একটা প্রত্যক্ষ ফলের আশায় উদ্‌গ্রীব। যেন ম্যাজিকের মতো কিছু একটা পরিবর্তনের প্রত্যাশা। ভয় হয়, অবুঝ উত্তেজনার পরে, একটা ব্যর্থ অবসন্নতা যেন অবশ্যাম্ভাবী।

একদিন অঘোর জ্যাঠা আমাকে বোঝাতে এলেন, এ সময়ে আমি যদি

তামাইয়ের বিষয় ছেড়ে একটু রাজনৈতিক বিষয়ে উঠে পড়ে লাগি, তবে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে। বললেন, আমাদের এসব জায়গায় সৎ শিক্ষিত লোক তেমন নেই, যারা জেল খেটেছে দেশের জন্য, লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁদের প্রতি অচলা। এ সময়ে যদি একটু এদিকে মনোযোগ দাও, তুমি অনেক উঁচুতে উঠবে বাবা। লোকে তোমাকে চায়।

আমি সৎ কি না জানিনে। হিসেব অনুযায়ী শিক্ষিতের কোঠায় পড়ি। মুশকিল এই, অঘোর জ্যাঠাকে বোঝানো যায় না, পৃথিবীর অধিকাংশ সৎ শিক্ষিত লোকেরাই রাজনীতি করেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসৎ অশিক্ষিত লোকেরাই হয় তো ও বিষয়ে যথেষ্ট প্রতিভাশালী হয়ে ওঠে। দেশ বিদেশের ইতিহাসে তার নজীর একেবারে দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

অঘোর জ্যাঠা যা বললেন, হয়তো এ বিষয়ে তাঁর দূরদৃষ্টি গভীর। আমার উপায় নেই। যে কাজে কোনো আকর্ষণ আনন্দ বা কৌতূহলই বোধ করিনে, তার মধ্যে আমি যাব না। বললাম, আমি তা পারি না। কয়েক দিনের জন্যে তামাইয়ের দু' পার ধরে একটু ঘুরতে চলেছি। ভাবছি, সাকোটের পাহাড় অবধি মাইল তিরিশ যাব।

অঘোর জ্যাঠা খুশি হলেন না। বললেন, কিছুকাল এ কাজ থামিয়ে রাখলেই বা ক্ষতি কী। আমি তোমাকে যা বলছি, তা যদি তুমি করতে পার, এসব কাজ তোমার পড়ে থাকবে না। বরং আরো ভাল ভাবে হবে।

বললাম, আমাকে মাপ করুন জ্যাঠামশায়।

অঘোর জ্যাঠা হতাশ হয়ে বললেন, আর কিছু নয় টোপন, হয় তো চোখের সামনে দেখতে হবে, যত উঞ্ছেরা দেশের সরকারের মুরুব্বিব হয়ে বসবে এখানে। তখন তোমরাই রাগ করে গাল দেবে।

হয় তো হেসেই ফেলতাম অঘোর জ্যাঠার কথা শুনে। তিনি আহত হবেন ভেবেই সামলাতে হল। যারা চায় না, তাদের অভাবে যদি স্থানীয় উঞ্ছেরা সরকারের হোমরা চোমরা হয়ে বসে জনতার প্রতিনিধি হয়ে বসে, তা হলে লোকে তো খারাপ বলবেই। কিন্তু উঞ্ছের দল কি এতই ভারী হয়ে গেছে? ভাল লোক কি নেই?

শুধু অঘোর জ্যাঠা নয়, এ কথা তো আগেই জানা গেছে, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করার দরুণ অনেকেই আমাকে নিয়ে হতাশ হয়েছে। বিরূপ হয়েছে। বর্ষীয়সী মহিলাদের মধ্যে অনেকে বলেছেন, "তবে ঢঙ করে জেল খাটতে যাওয়া কেন বাপু?" এসব কথার কোনো জবাব নেই।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। রেণু রাজনীতির আসরে প্রবেশ করেছে। তাতে বোঝা গেল, কালের হাওয়ায় একটা দিক পরিবর্তনের ধাক্কা লেগেছে। একদা রেণুর যে ভবিষ্যৎ চিন্তা করা গিয়েছিল, আজ আর তা সত্য নয়। এতে রেণুকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে জানিনে, কিন্তু আমি খুশি হয়েছি। যেখানেই নিয়ে যাক, শালঘেরির মেয়ে এই প্রথম গ্রামের কর্তা ব্যক্তিদের সমর্থন

ও সহায়তায় রাজনীতির পথে পা বাড়িয়েছে।

পায়ে হেঁটে হেঁটে সাকোট পাহাড়ে যাবার কথা শুনে পিশী তো থ। দু' ঘণ্টা রেলগাড়িতে গিয়ে যেখানে হেঁটে যাওয়া যায়, সেখানে এ অভিনব পন্থার কারণ কী। আমার কথা শুনে চুপ করে গেলেন। বুঝতে পারি পিশী ক্রমেই ভাবিত হচ্ছেন, ভয় পাচ্ছেন আমার মতিগতি দেখে। জেল থেকে আসার পর তিনি যে একটি কল্পনার ছবি দেখেছিলেন তা ক্রমেই বিলীয়মান। আমি কষ্ট বোধ করি কিন্তু সংসার কোথাও কারুর মনোমত হয় না।

কুসুম জিজ্ঞেস করল, গরুর গাড়িতে যাবে বুঝি?

—না, পায়ে হেঁটে।

—ওমা! পথে ঘাটে খাবে কি? মালপত্তর নিয়ে যাবে কিসে?

—মালপত্তর আবার কি রে?

—চাল ডাল সবই? পথে পথে তো দোকান পাট নেই যে কিনে নেবে?

বললাম, দোকান পাট নেই, গাঁ ঘর তো আছে। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

কুসুম খুব বেশী ভরসা পেল না। তারপরে ঝপ্ করে বলে বসল, আমাকে নিয়ে চল না টোপনদা, তুমি ঘুরে ঘুরে কাজ করো আমি রান্না করব।

মন্দ বলেনি কুসুম। পথ চলাটা সে রকম খেয়ে দেয়ে গড়িয়ে চুড়ুইভাতি করতে করতে যাওয়া যায়। তাতে কাজ হোক বা না হোক। গম্ভীর হয়ে বললাম, দাঁড়া, কাজ কর্ম মিটুক, তারপর ওরকম বেড়াতে যাওয়া যাবে।

গাম্ভীর্য দেখে একটু সংশয়ে কুসুম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যেন, ও কিছু সন্ধান করছে আমার চোখে মুখে। এটা কুসুমের নতুন। কথা কম বলে, দ্যাখে বেশী। তবু না বলে পারল না, একলা যাবে।

বললাম, হ্যাঁ।

কুসুম ছায়া ভরা মুখে বলল, বাড়িটা খুব ফাঁকা লাগবে।

সে কথার কোনো জবাব দিলাম না। যাবার দিন ভোরবেলা একটা বড় ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ভবেনের বাড়ি গেলাম। ভবেন তো রেগে চীৎকার করেই উঠল, কাল রাত্রেও তুই কিছু বলিস নাই? তা হলে আমিও যেতাম।

ঝিনুক কোনো কথা না বলে, দূর থেকে তাকিয়েছিল। ভবেনই তাকে বলল, শুনেছ, বাবু হাঁটতে হাঁটতে সাকোটে চললেন।

ঝিনুক দূর থেকেই বলল, শুনেছি।

কিন্তু ঝিনুক আমার মুখ থেকে চোখ সরাল না। আমি ভবেনকে বললাম, তুই সংসারী মানুষ, তোর কি যখন তখন বেরুলেই হল।

ভবেন বলে উঠল, রাসকেলের মতন কথা বলিস না। তোর কাছে আমি সংসার করা শিখব, না? আর তুই একলা এই পথ ঘুরে আসবি।

আমি হেসে বললাম, ঘুরে আসি একটু।

ভবেন বলল, যাও, মর গে এই গরমে। কিন্তু আজকাল খুব চাপতে শিখেছিস যা হোক। কাল তো একবারও মুখ খুললি না?

আমি হাসতে লাগলাম। কিন্তু ঝিনুক উঠোনের যে প্রান্তে ছিল, সেদিকে চোখ তুলে তাকালাম না। ভবেন আবার বলল, মাঝখান থেকে ঝিনুকের মেজাজটা বিগড়ে দিলি। এ বাড়ির হাওয়া খারাপ হল।

—এতে বেগড়াবার কী আছে?

—বলিস নাই কেন? জানিস তো ওকে।

ভবেনের এরকম কথায় বিব্রত হতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। এবং সে বিরক্তি আসলে ঝিনুকের উপর। বললাম, তুই অর্থহীন কথা বললে আমি তা মানতে পারি না।

বলে, ঝিনুকের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম, ও সেখানে নেই। ভবেন কিন্তু ব্যাপারটাকে গুরুগম্ভীর হতে দিল না। ঘুষি উঁচিয়ে, চোখ পাকিয়ে মুখটা অদ্ভুত করে নিচু স্বরে বলল, এবার বোঝ ঠ্যালা।

আমি আবার হাসলাম। কিন্তু ভবেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা টনটনিয়ে উঠল। ভবেন আবার বলল, মনে করেছিস, তোর নিজের ইচ্ছে মতনই সব হবে।

কেন, ঝিনুক কি নিয়তির মতো আমার সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করবে? ভাবনা শেষ হতে না হতেই, ঝিনুক দু'হাতে দুটি চায়ের কাপ নিয়ে এসে দাঁড়াল। বলল, ধর।

আমি আর ভবেন, দুজনেই চা নিলাম। ঝিনুক বলল, কবে ফিরবে?

—কদিন আর। দিন দশেক লাগবে হয় তো।

আনিদি এসে আর এক কাপ চা ঝিনুকের হাতে তুলে দিয়ে গেল। ঝিনুক যেন গরম চায়ের কাপে নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, মুখ না তুলেই বলল, শুধু এই ঝোলা কাঁধে করেই চললে?

—হ্যাঁ।

—তার মানে, কদিন সব রকমের অত্যাচার হবে।

আমি বললাম, ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

ঝিনুক বলল, তা বুঝেছি। কিন্তু কাল রাত্রে বললেও, তোমার কাজে আমি বাগড়া দিতাম না। তাড়াতাড়ি চলে এস।

ভবেন ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, দাঁড়া জামাটা চাপিয়ে আসি, একটুখানি সঙ্গে যাই।

ঝিনুক চোখ তুলে বলে উঠল শালঘেরি থেকে চলে যাবার মহড়া দিচ্ছ নাকি?

ঝিনুকের এই প্রশ্নের মধ্যে যে সত্য একেবারে ছিল না, তা নয়। মনে মনে এমনি একটা চিন্তা ছিল, আমার কয়েক দিনের অনুপস্থিতির একটা অভিজ্ঞতা

দরকার। তাতে অন্তত ভবেনের অবস্থাটা কিছু বুঝতে পারব। কারণ ইদানিং একটা সংবাদে অত্যন্ত অস্বস্তি ও বিমূঢ়তা বোধ করছিলাম। ঝিনুকের মুখেই শুনেছি, ভবেন আচমকা এক একদিন থেকে ইস্কুল থেকে ছুটি নিয়েছে। কিন্তু ছুটি নিয়ে বাড়ি আসেনি। ছুটির কথা বাড়িতেও বলেনি, আমাকেও না। সময়গুলি তার কোথায় কেটেছে কেউ জানতে পারেনি। শুনে থমকে গিয়েছি। ভবেন বলেনি বলেই ওকে জিজ্ঞেস করতেও বেধেছে। তখন থেকে অনেকবার ভেবেছি, আমি শালঘেরিতে না থাকলে হয় তো ভবেন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়।

কিন্তু ঝিনুকের চোখের দিকে তাকিয়ে সে চিন্তার কথা আমি বলতে পারলাম না। বললাম, তা কেন? কাজেই যাচ্ছি।

ঝিনুক চুপ করে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই আয়ত চোখ দুটির দিকে আমি তাকিয়ে থাকতে পারিনে। ভবেন বেরিয়ে এল। ঝিনুক হাত বাড়িয়ে আমার চায়ের কাপ নিল। আমরা দুজনে বেরিয়ে গেলাম।

বাইরে এসে ভবেনকে বললাম, তুই আর কেন আসছিস?

ভবেন গম্ভীর স্বরে বলল, একটা কথা বলতে।

অবাক হয়ে বললাম, কী রে, কী কথা?

ভবেন বলল, তুই আজকাল কপটতা শিখেছিস টোপন।

মনের ভিতরটা যেন দপ করে নিভে গেল। বললাম, কী রকম?

—তুই আমাকেও চাপতে শিখছিস? আমাকেও বলিস না?

হেসে বললাম, তুই একটা উল্লুক। তুই যেতে চাইবি বলেই তো বলিনি। বরং শোন্, এ কদিন ইস্কুল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাক।

ভবেন ওর কোল বসা ঈষৎ লাল চোখ তুলে বলল, কেন?

—কেন আবার? ঝিনুকের সঙ্গে দাবা খেলবি।

ভবেন আমার চোখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে হো হো করে হেসে বলল, তুই একটা রাস্‌কেল টোপন, রাস্‌কেল! ঝিনুক কি আর এখন খ্যালে? তুই আর আমি খেলি, ঝিনুক দ্যাখে।

বললাম, ভুল বললি। ঝিনুক খ্যালে, তুই আর আমি দেখি।

শুনে ভবেন হাসতে লাগল, আমিও হাসতে লাগলাম। দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সে হাসি যেন শেষ হতে চায় না।

প্রথম দিন ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যাবেলা যে গ্রামে পৌঁছুলাম, তার নাম নাবোল। সারা দিনে পথে বা দুটি গ্রামে খোঁজ করে তেমন কিছু পাইনি। নাবোলে আমার পরিচয় দিতে, আশ্রয় একটা মিলে গেল। পরের রাত্রি ওঝাই-গড়। তৃতীয় রাত্রি ভক্তবিষাণ।

এই তৃতীয় রাত্রিতে আর নিজেকে ফাঁকি দিতে পারলাম না। অনুভব

করছি ভিতরের একটা শূন্যতা যেন আমাকে গিলতে আসে। সন্ধ্যা হলেই উড়তে না পারা পক্ষী শাবকের মতো, বুকের মধ্যে যেন ডানা ঝটপট করে। আর আসন্ন রাত্রির ছায়াঘন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে, নিজেকে আশ্রয়হীন, ভয়ংকর একাকী মনে হতে থাকে। আমার প্রাণস্পন্দনের তালে তালে নাম বাজতে থাকে, ঝিনুক ঝিনুক ঝিনুক।...

আমার অনুপস্থিতি শালঘেরিতে কী ঘটাচ্ছে, সে অভিজ্ঞতার আগেই,আত্ম-দর্শনের বিস্ময়ে ও যাতনায় অভিভূত হয়ে যাই। জানিনে, সেই চোখ দুটির ভিতর দিয়ে কী সুধা পান করি। একটু কথা, মর্মে কী দ্যোতনা সৃষ্টি করে। এখন দেখছি শালঘেরির প্রায় প্রত্যহের সন্ধ্যা আমার রন্ধ্রগত হয়ে গেছে। দীর্ঘকাল জেলে থাকতেও আমার এমন অসহায় অবস্থার কথা জানতে পারিনি। ঝিনুক আমার সব কিছু নিয়ে বসে আছে। এমন সর্বব্যাপ্ত বলেই কি ওকে নিয়তির মতো মনে হয়।

পঞ্চমদিনে সাকোটে পৌঁছে আর একটা কাঁপন আমাকে নাড়িয়ে দিল। সাকোটের পাহাড়, এই তো আমাদের সেই ছেলেবেলার বোম্বাবুড়ো। পরিষ্কার আকাশের বুকে যখন পাহাড় তার কিম্ভুতাকৃতি নিয়ে জেগে উঠত, মা শান্ত করার জন্যে বলত, ওই দ্যাখ্ বোম্বাবুড়ো, বেয়াড়াবিত্তি করলে ধরবে এসে।

আজ প্রাক-সন্ধ্যায় সাকোটের আশেপাশে ঘুরতে ঘুরতে, সহসা চোখে পড়ল, নিরিবিলি এক শালগাছের তলায়, নিবিড় ঘনিষ্টতায় বসে আছে একটি আদিবাসী দম্পতী। ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু আমি নড়তে পারলাম না। জীবনে তো এমন কত দেখেছি। আমাদের গোটা জেলায় এই সব আদিবাসীদের সংখ্যা অনেক। চাষবাসের কাজ ওদের ওপরেই অনেকখানি নির্ভরশীল। এমন নির্জনে, সারাটা আতপ্ত দিনের কাজের শেষে, এর উরতের ওপর ওর পা, মেয়েটি পিঠ চুলকে দেয়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে পুট্ পুট্ করে ঘামাচি মারে, আর ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কী যেন বলে, এবং পুরুষটির হাত এলিয়ে পড়ে থাকে কৃষ্ণা মানবীটির কোলে, তার মুগ্ধ দৃষ্টি নারীর চোখের দিকে নয়, দূর আকাশের দিকে, দেখে মনে হয়, এই নিবিড়তাটুকু নিয়ে সংসার পারাবারের বাইরে গিয়ে বসে আছে। অনেকদিন দেখেছি, কিন্তু কখনো, সহসা এমন তীরবিদ্ধ চকিত কল্পনায় ও ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে যাইনি। আর একজনের সঙ্গে আমার নিজেকে এমন নির্জন, নিবিড়তায় কল্পনা করে, আহত যন্ত্রণায় কেঁপে মারিনি। বোম্বাবুড়ো ছেলেবেলায় ভয় দেখিয়েছে, আজ যৌবনে, প্রাণের দুয়ার ভেদী অন্ধকারের স্তব্ধ স্বপ্নকে চোখের সামনে তুলে দিয়ে, আর একবার ভয় দেখাচ্ছে।

বারো দিন পরে বৃষ্টি মাথায় করে শালঘেরিতে ফিরে এলাম। একেবারে শূন্য হাতে ফিরিনি। কয়েকটি ছোট ছোট মূর্তি পেয়েছি। তার মধ্যে দুটি নিঃসন্দেহে গণপতির। একটি মাতৃমূর্তি, প্রাগৈতিহাসিক মাতৃমূর্তির

সঙ্গে যার মিল রয়েছে স্তনে ও নিম্নাংগে। মূর্তিগুলি দেখলে সহসা মনে হয়, এ যুগের নিতান্তই রংহীন গ্রাম্য খেলার পুতুল। কিন্তু এদের দেহে বয়সের চিহ্ন বর্তমান। এক ভদ্রলোক একটি পাথরের অস্ত্র, দুটি শীলমোহর জাতীয় মাটির জিনিস দিয়েছেন। কোথায় পেয়েছেন, তার জায়গাও নির্দেশ করেছেন। ওঝাইগড়ের পরপারে, আকোন গ্রামের জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তেই এসব সংগ্রহ করা গেছে। আকোন আমার ফেরার পথে পড়েছিল। শালঘেরি থেকে দূরত্ব প্রায় এগারো মাইল। শালঘেরির মতই আকোনকে আমার গভীর সন্দেহ হয়েছে। ওখানেও মাটির তলায় বোধহয়, অতীত অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে।

কুসুম ছুটে এসে আমার কাঁধের ঝোলা নিল। পিশী বললেন, অরে, টুপান, আরশীতে একবারটি নিজেকে দেখ, চেহারাটা কী করেছিস্।

বললাম, বাইরে বাইরে ঘুরেছি তো। এ কিছু নয় পিশী।

কুসুম একটা ছুট দিল দালান দিয়ে। বলে গেল, চা করছি টোপনদা।

কিন্তু কুসুমের চেহারাটা তেমন ভাল দেখলাম না। চোখের কোল বসা, চুল উসকো খুসকো। বর্ষা দেখে বোধহয় স্নান করেনি। পিশী তাড়াতাড়ি শুকনো কাপড় এনে দিলেন। বললেন, আর চান করিস না, মেলাই ভিজেছিস। একটু তেল গরম করে দিই, হাতে পায়ে মাখ।

কুসুম চা নিয়ে এসে বলল, তোমার কাজ হয়েছে টোপনদা। বললাম, এই হয়েছে একটু আধটু।

—কিছু পেলে?

কুসুম বুঝুক না বুঝুক, উৎসাহের অন্ত নেই। ঠাট্টা করে বললাম, পেয়েছি।

—কী পেলে?

—কুসি বামনীর একটা বর।

কুসুম অমনি মুখ ভেংচে বলল, অ্যা হ্যা হ্যা। আর বামুনঠাকুরের একটা বউ খুঁজে পাওনি?

বললাম, তাও পেয়েছি।

বলে ব্যাগ থেকে খুলে মাতৃমূর্তিটা দেখালাম। কুসুম হেসে গড়িয়ে পড়ল। আপাতদৃষ্টিতে মাতৃমূর্তির চেহারাটি হাস্যকর বটে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, দুটি ছোট পায়ার ওপর একটি ত্রিকোণ অঙ্গ, তার ওপরেই গোল স্ফীত উদর, উদরের ওপরে দুটি বৃহৎ স্তন, একটি ছোট্ট মুণ্ড। বর্তমান চোখে অনেকটা বিদঘুটে হাস্যকর। কিন্তু উর্ধ মধ্য অধঃ, এই তিনের মধ্যেই প্রজননের চিহ্নগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মাতৃমূর্তি আসলে উৎপাদনেরই প্রতীক। এই সব সংকেত জানা না থাকলে, এর চেয়ে হাস্যকর মূর্তি আর কী থাকতে পারে।

এমন সময়ে টোকা মাথায় দিয়ে ইন্দির ঢুকল দরজা দিয়ে। কুসুম বলল, কদিন ধরে ও রোজ দুবেলা তোমার খবর নিতে আসে, তুমি এসেছ কি না।

ইন্দির আসে না, তাকে পাঠানো হয়। সে দালানের সামনে বারান্দায়

উঠে এল। দালানের ভিতরে, কাছেই ছিলাম আমি। দেখতে পেয়ে বলল, এসেছ? যাক্ বড় বউমা আর বড়দা রোজ খোঁজ করছে তোমার।

আমি বললাম, টোকা রেখে ভেতরে এস।

কুসুম বলল, চা খাবে?

ইন্দির দালানে ঢুকতে ঢুকতে বলল, তা এই বাদলা দিনে—।

কুসুম চলে গেল। ইন্দির বলল, বড় বউমা বুলে দিয়েছেন, তাড়াতাড়ি একবার দেখা করতে।

জিজ্ঞেস করলাম, ভবেন কোথায়?

—ইস্কুলে। বড় বউমা বুলছেন, জরুরী দরকার, এসে থাকলে যেন দেরী না করেন।

জানি পিশী ভিতর ঘর থেকে ইন্দিরের কথাতেই কান রেখেছেন। হয়তো ওদিক থেকে কুসুমও। বড় বউমার প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে বললাম, সে হবে খন, তুমি বস।

আমি উঠে ঘরের ভিতরে গিয়ে, বাগানের দিকে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বৃষ্টির অঝোর ধারা গাছের ও বাঁশ ঝাড়ের মাথা ধুইয়ে ঝরে পড়ছে। লাল মাটি জমাট রক্তের মতো থই থই করছে। জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে পাচ্ছিনে। ব্যাং ডাকছে, ক্যাঁ-কো। ক্যাঁ-কো।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, দোতলার বারান্দায় ঝিনুক দাঁড়িয়ে। ওর অস্নাত চুল খোলা, তামাইয়ের ওপারে শালবনের আকাশে দৃষ্টি হারিয়ে গেছে। আর ভবেন? ওকি ইস্কুলে, নাকি অন্য কোথাও গিয়ে বসে আছে?

বাড়ি থেকে ইস্কুলের ঢং ঢং ঢং ছুটির ঘণ্টা শুনেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু ভবেনদের বাড়ি এসে ভবেনের কোনো সাড়া শব্দ পেলাম না। কারুরই কোনো সাড়া শব্দ নেই। বাইরের দরজাটা খোলা। উঠানটা ফাঁকা। রান্নাঘরের দরজা বন্ধ। নিচের মাটির ঘর ও পাকা ঘরের দরজাও ভেজানো। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠলাম। বারান্দায় কেউ নেই। কিন্তু দুটো ঘরের দরজাই হা করে খোলা। বারান্দার রেলিং-এর চওড়া কাঠের উপর এক জায়গায় দেখলাম, চুলের ফিতে আর কাঁটা পড়ে আছে। এক পাশে শাড়ি শায়া জড়ো করা।

এখন আর বৃষ্টি নেই। ভেজা বাতাস বইছে। আকাশ মেঘ মেদুর। পূর্ব দিগন্তে কালো আকাশের পটে শালবন দুলছে।

আমি ডাকলাম, ভব আছিস নাকি?

কোনো এক ঘর থেকে ঝিনুকের গলা শোনা গেল, না। ঘরে এস।

এরকম এসেই থাকি, দ্বিধার কিছু নেই। অনেক দিন ভবেন এসে দেখেছে, আমরা ঘরে বসে কথা বলছি। তবু সাকোট থেকে ফিরে, আমার পায়ে যেন আড়ষ্টতা বোধ করছি। ওখান থেকেই জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ঘরে।

—তোমার বন্ধুর ঘরে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। মনে করেছিলাম, গিয়ে দেখব, ঝিনুক কোনো জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দেখলাম, মেঝেতে মাদুর বিছানো। ঝিনুক তাতে কাত হয়ে এলিয়ে, কনুয়ে ভর দিয়ে, গালে হাত রেখে, সামনে দাবার ছকে নিবিষ্ট হয়ে আছে। তার খোলা রুখু চুল মাদুরে এলানো। একটি মোটা লাল পাড় শাড়ি পরা, গায়ে একটি পুরনো রংওঠা বিবর্ণ জামা। আঁচল বুকের নিচে মাদুরে পড়ে রয়েছে। কাত হয়ে রয়েছে, তাই গলার সরু হার গাছা জামার এক পাশ দিয়ে ভিতরে চলে গেছে। কপালে সিঁদুর নেই, সিঁথের গতকালের অস্পষ্ট দাগ। একটি কালো রং-এর বোড়ে নিয়ে, ছকের ওপর এক জায়গায় রেখে চোখ না তুলে ঝিনুক বলল, এস।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। কী একটা তীব্র আনন্দ, আর একটা তীক্ষ্ম যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। তার সঙ্গেই সেই গুরু গুরু শব্দের গর্জন ভেসে আসতে লাগল। আমার নিজের প্রতি সেই ভয় আর অবিশ্বাস। একবার মনে হল, ফিরে যাই। পরমুহূর্তেই আমার ভিতরে যেন কে নাড়া দিয়ে উঠল। আমি হেসে উঠলাম, কী ব্যাপার একলাই পেড়ে বসেছ।

ঘরে ঢুকলাম আমি। ঝিনুক তেমনি চোখ না তুলে বলল, দোকলা আর পাচ্ছি কোথায় বল।

বলে উঠলাম, কেন, ভবকে যে বলেছিলাম ছুটি নিয়ে বাড়ি থাকতে?

ঝিনুক চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। বলল, বলেছিলে বুঝি? কই, জানি না তো।

ঝিনুক আবার চোখ নামিয়ে নিল। বললাম, কিন্তু ও এখনো ফেরেনি কেন? ছুটি তো অনেকক্ষণ হয়েছে।

—হয়তো তোমার ওখানেই গেছে। বস, এখানে এসে বস ছকের সামনে, একটু খেলি।

ঝিনুক তেমনি ভাবেই বলল। আমি উল্টো দিকে মেঝেয় বসে বললাম, কিন্তু একলা একলা দু'দিক চালছ কী করে? এমনি লড়া যায়?

ঝিনুক বলল, নিরুপায় হলে লড়তেই হয়।

আমি চোখ তুলতেই, ঝিনুকের সঙ্গে চোখাচোখি হল। আমার বুকে নিঃশ্বাস আটকে এল হঠাৎ। ঝিনুকের চোখে যেন জ্বরের ঘোর। ও আবার বলল, এবার তুমি এসেছ, একটু লড়ো।

আমি তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিয়ে এলাম। খেলার কথা নয়, অন্য কিছু অর্থ যেন ঝিনুকের কথায়। নিজের দিকে চেয়ে, নিজের প্রতিই যেন দীন ভিখারীর মতো প্রার্থনা করলাম, তাড়াতাড়ি খেলায় মনোযোগ দাও, খেলায় ডুবে যাও।

বেশ খানিকক্ষণ একেবারে নিবিষ্ট থেকে বললাম, কিন্তু এ কি, এ যে দেখছি প্রায় সবই সাজানো, কী খেলছ তা হলে?

ঝিনুক যে চোখ নামায়নি আর, তা আমি জানি। বলল, এতক্ষণে দেখতে পেলে? একলা কি খেলা যায়? শুধু পেতে বসা যায়।

ঝিনুকের সেই সন্ধ্যাভাষা। নিশ্চুপে নিশ্ছিদ্রের ভিতর দিয়ে সহসা আবির্ভূত হয়ে মর্মে এসে ঢোকে। তাড়াতাড়ি বললাম, তা হলে—।

কথা শেষ হল না। ঝিনুক বলল, কেমন কাজ করে এলে টোপনদা?

বললাম, ভাল। না গেলে সত্যি ক্ষতি হত। অনেক জিনিষ পেয়েছি। তা হলে তোমার বোড়ে তিনটে দাও, সাজিয়ে নিয়ে একেবারে নতুন—।

দেখলাম, ঝিনুকের গালে রাখা হাতটি আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল। ওর মাথা মাদুরে এলানো। প্রায় শ্বাসরুদ্ধ গলায় বললাম, কী হয়েছে ঝিনুক।

ঝিনুক প্রায় চুপিচুপি স্বরে বলল, আমার হাতটা একটু ছোঁও।

আমার বুকের মধ্যে সহসা সেই দুরন্ত কাঁপুনি এল। তবু ওর হাত ধরলাম। ঝিনুকের হাত, ঝিনুকের। ঝিনুক যেন হাঁপাচ্ছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। ওর হাত ঠাণ্ডা। আর একটি হাত দিয়ে মাদুর আঁকড়ে ধরে আছে, নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, শরীর শক্ত হয়ে উঠছে। ওর রৌদ্ররং শরীরের খোলা অংশে রক্তাভা দেখছি যেন। কাত করা রক্তাভ মুখের পাশ দিয়ে চুলের রাশির জটলা। ওর চোখ আমার হাতের দিকে, যে হাত দিয়ে ওর হাত ধরে আছি।

আমি স্খলিত গলায় ডাকলাম, ঝিনুক।

ঝিনুক তেমনি স্বরে বলল, টোপনদা, এখন বুঝতে পারি না, তুমি জেলে থাকতে কেমন করে ছিলাম?

আমার ভিতরে, যেন এক সংক্রান্তিকালের ইশারায় মহাকালের ভেরীতে প্রবল রব উঠল। বাইরে থাকা কালীন কয়েক দিনের সব কথা আমার জিহ্বার ওপরে এসে দাপাদাপি করতে লাগল। আর তৎক্ষণাৎ মনে হল, কী সর্বনাশ! আমি প্লাবনের মুখ খুলে দিতে যাচ্ছি। যেন ভয়ে শিউরে উঠলাম আমি। বললাম, ঝিনুক, মানুষ অনেক কিছু পারে।

ঝিনুক আরো জোরে আমার হাত চেপে ধরল। বলল, আবার অনেক কিছু পারে না টোপনদা।

—তুমি পার ঝিনুক, আমি জানি।

ঝিনুক কি ভাবল, ও আমার চোখের দিকে তাকাল। আমি আবার বললাম, না পারলে চলে না। ঝিনুক উঠে বস।

ঝিনুক চোখ নামাল না আমার চোখ থেকে। কথা বলল না। কয়েক মুহূর্তের পরে ঝিনুক উঠে বসল। আমি ওর হাত ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ও বিস্রস্ত বেশ গোছাল না। ইচ্ছে করল, আমি নিজেই ঠিক করে দিই। তা আমি পারব না। বিচারের অবসর ছিল না, শুধু ঝিনুকের সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গেও ছলনা করছি কি না। আমি সাকোটে একরকম ভেবেছিলাম, এখন আর একরকম। উঠে দাঁড়িয়ে কী যে করতে চাইলাম, জানিনে। বাইরে যাব কি

না, একবার ভাবলাম। তারপর আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। যেন নিজেকেই বলবার জন্য আবার আমি উচ্চারণ করলাম, ঝিনুক সংসারে কোনো কোনো মানুষকে পরীক্ষা দেবার জন্যেই থাকতে হয়। তাদের জন্মের সময়ে গ্রহ নক্ষত্র কে কী ভাবে ছিল, কে জানে, হয়তো সামান্য একটু এদিক ওদিকের জন্যে, সারা জীবনের ছকে বাঁধা পড়ে গেছে। নতুন কোনো কীর্তি মাতের উপায় নেই আর।

এমন সময়ে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল। ভবেনের গলাও উচ্চকিত হল, আনি দি, আমাদের চা দাও। তিনজনের মতন দিও।

আমি ঝিনুকের দিকে তাকালাম। ঝিনুক তাকাল না, ঠায় তেমনি বসে রইল। ভবেনের কথা শুনেই বুঝলাম, আমি এসেছি সে ধরেই নিয়েছে। নইলে তিনজনের চায়ের কথা বলত না। দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। ভবেন এগিয়ে এসে আমাকে দেখে বলল, আমি তোদের বাড়ি ঘুরে এলাম। কুসুমের মুখে শুনে বুঝলাম এখানেই এসেছিস। কিন্তু এ কদিনে চেহারাটা তো বাগিয়ে এসেছিস।

বললাম, একটু কালো হয়েছি।

ঝিনুক চুল এলো খোঁপায় বেঁধে উঠে দাঁড়াল। তারপর কোন কথা না বলে, আমাদের দুজনের মাঝখান দিয়ে বাইরে চলে গেল। বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

ভবেন তাকাল আমার দিকে। আমিও ভবেনের দিকেই। ভবেন বলল, কী হয়েছে, তোরা ঝগড়া করেছিস নাকি।

বললাম, না। ওকে কয়েকটা কথা বলছিলাম।

ভবেন ঝিনুকের যাওয়ার পথের দিকে কয়েক মুহূর্ত যেন মুগ্ধ স্নেহে তাকিয়ে রইল। বলল, কদিন জ্বরে ভুগল ঝিনুক। নগেন ডাক্তার এসেছিল, বলল, ও খুব দুর্বল হয়ে গেছে।

তারপরে ভবেন আমার মুখের দিকে তাকাল। কী দেখল জানিনে। আমার হাত ধরে বলল, আয়, ভেতরে বসি। সাকোটে কী কাজ হল শুনি।

আমার যেন মনে হল, ভবেনের বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে রয়েছে। আমি সহসা কোন কথা বলতে পারলাম না। আমার নিজেকেই সব থেকে বেশী বিড়ম্বিত মনে হতে লাগল।

সাকোটের পথের কথা, বিশেষ করে আকোনের কথা সব লিখে পাঠালাম গোবিন্দবাবুকে। নতুন পাওয়া মূর্তি ও চিহ্নগুলির ফটোও সেই সঙ্গে। গোবিন্দবাবু উৎসাহিত হয়ে জবাব দিলেন। জানালেন, শালঘেরি এবং আকোন এ দুজায়গাতে লক্ষ্য দিতে হবে।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতা ঘোষিত হল। শালঘেরিতে উৎসবের আয়োজন মন্দ

হয়নি। বাড়িতে বাড়িতে পতাকা উড়ল। জেলা শহরের উৎসব দেখতে গেল অনেকে। বৃষ্টি বাদলাতেই যা একটু অসুবিধে হল। তবু শালঘেরি থেকে গড়াই অবধি একটা মিছিল গিয়েছিল। ইন্দির একটা পতাকা নিয়ে সামনের সারিতেই ছিল। সে ঘড় ঘড়ে বুড়ো গলায় চীৎকার করছিল, বন্দে—মাতোরং!

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে এলেন গোবিন্দবাবু। প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখে মনে হল, একটা বিভ্রান্তির ঘোরে আছেন। এবং সেটা যে রাজনৈতিক জটিলতার ঘোর, তা বুঝতে পারলাম। আমার সঙ্গে তামাইয়ের ধারে ঘুরতে ঘুরতে কাজের কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যান। কেবলি মনে হয়, অনেক দূর অবধি তাকিয়ে কী দেখে যেন সংশয়ে ও হতাশায় ডুবে যাচ্ছেন।

মাটি কাটার কাজ যেদিন শুরু করার কথা, সেদিন সকালবেলা হঠাৎ আমাকে বললেন, সীমন্তবাবু, স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি ঠিকই। একটা জোয়ার বোধহয় শুরু হল, কিন্তু পঁচিশ বছর ধরে বেনো জলের ধাক্কায় যে ময়লা আর গ্লানিটা এখন আসবে, আমি শুধু তাই দেখে যাব।

হয় তো গোবিন্দবাবুর ভাবনার সঙ্গে আমার কিছুটা মিল ছিল। কিন্তু সময়ের কথা শুনে বললাম, পঁচিশ বছর বলছেন?

—হ্যাঁ, পঁচিশ বছর। অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাবেন। কারণ বহু, বহুযুগ পরে আবার আমাদের স্মরণ করতে হচ্ছে, আমরা ভারতবাসী। আত্মবিস্মৃতির মার না খেয়ে আমাদের উপায় নেই। নিজেদের সঠিক পরিচয়টা জানতেই এই বছরগুলো কেটে যাবে। বিভ্রান্তিই অবক্ষয়কে টেনে আনবে। আর উনিশ শতকে যে জ্ঞানের আর মুক্তির আশ্রয়টা বিদেশ আমাদের দিয়েছিল, তারও কোনো আশা নেই আর। তারা আমাদের থেকেও বোধহয় দেউলিয়া হয়ে গেছে। এবার আসুন, নিজেরা নিজেদের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে, একেবারে হাড়ের মধ্যে পৌঁছে, নিজেদের পরিচয়কে খুঁজি।

হেসে উঠে বললেন, এতে ভয়ের কিছু নেই, এ ছাড়া রাস্তা নেই। এখন যে নিজেদের সব করতে হবে।

মাটি কাটার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।

গোবিন্দবাবু করিক টুড়ুদের মাটি কাটার ধরণটা দেখিয়ে দিলেন। যতক্ষণ মাটি কাটা হয় আমি প্রতিটি সাবল কোদালের আঘাতের মুখে চেয়ে থাকি। গ্রামের এবং আমাদের গাঁয়ের লোকেরা কৌতূহলিত হয়ে খানিকটা মজা দেখার মন নিয়ে এসে ভিড় করে। বার্তা রটে গেছে, টোপন চাটুয্যে বিঘা বিঘা জমি নিয়ে মাটি খোড়াচ্ছে, মানুষের কঙ্কাল খুঁজছে। কেউ কেউ বলছে, গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে।

গোবিন্দবাবু সাতদিনের জন্য আপাতত এসেছিলেন। আরো তিনদিনের মেয়াদ বাড়িয়ে, দশদিন থাকলেন। আস্তে আস্তে তাঁর কপালে আমি কয়েকটা হতাশার রেখা ফুটে উঠতে দেখলাম। বাড়ি ফিরে এসে তিনি রোজই খুঁজে পাওয়া মাটির ও পাথরের মূর্তি এবং সামগ্রীগুলি দেখেন, আপন মনে বিড়বিড়

করেন। একদিন আমাকে নিয়ে আকোনে গেলেন।

আমার ভিতরেও একটা সংশয়ের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল। তবু একটা অটল বিশ্বাস যেন আমার মনের মধ্যে অনড়, নিশ্চল, শক্ত হয়ে বসে আছে।

দশদিন পর গোবিন্দবাবু যাবার আগে জানিয়ে গেলেন, যে জায়গাটা আমি বেছেছি, ওখানে আর কোনো আশা নেই। আর একটু ভেবে জায়গা ঠিক করতে হবে।

মাঝে মাঝে বর্ষায় কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে লাগল।

গোবিন্দবাবুর সঙ্গে চিঠি আদান প্রদান চলছিল। শেষ চিঠিতে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন, আপনি যে অস্ত্র এবং পাথরের মাটির অগণিত মূর্তি বা অন্যান্য সামগ্রী পেয়েছেন সেগুলি অন্য কোনো ভাবেও ওখানে আসতে পারে। সাঁওতাল বস্তিতে খোঁজ করে দেখবেন ওরা ওরকম কোনো কিছু পেয়েছে কিনা। না পেয়ে থাকলে আর অকারণ কষ্ট করবেন না। কারণ যদিও শালঘেরির মৃত্তিকায় একটি ইশারা দেখা গিয়েছিল আজ পর্যন্ত বাংলার অন্য স্থানের সঙ্গে সেও বোধহয় একাত্মা। অনেক কিছুই হয় তো ছড়িয়ে আছে। কিন্তু কোথায়, এখনও জানা যাচ্ছে না।

খোঁজ করে সাঁওতালদের কাছে কিছুই পাইনি। ওরা পেয়ে থাকলেও বোধহয় ভয়েই কিছু জানায়নি আমাকে।

বিঘা বিঘা মাটি কাটা হল। বড় বড় পুকুর হল। বর্ষার জল জমল তাতে। অল্পদিনের মধ্যে কিছু আগাছাও জন্মাল। আবিষ্কার হল না কিছুই।

পিশী তো প্রায় কথা বন্ধ করেছেন। কারণ তাঁর সহোদরের সঞ্চিত টাকা এভাবে নষ্ট হতে দেখে, ভয়ের অন্ত নেই। অন্ত নেই আমার ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তার। পাড়ার সবাইকে দিয়ে বলিয়ে আমাকে নিরস্ত চেয়েছেন। পারেন নি। পিশীকে অনেক বুঝিয়েছি যে সার্থক হলে এ জন্যে আর দুঃখ করতে হবে না।

পিশীর কোনো কারণ নেই বোঝবার।

কুসুম যেন শিশু গাভীটির মত অসহায় দুই চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। ওর বেশী কথা বলতে সাহস হয় না। কেবল, তামাইয়ের ধার থেকে ফিরলে একবার জিজ্ঞেস করে, কিছু পেলে টোপনদা?

সবদিন মন টন একরকম থাকে না। মাঝে মাঝে এ অনধিকার চর্চা করতে বারণ করি। তখন কুসুম আর আগের মত সরে গিয়ে, পরে কৌতুকোচ্ছলে উঁকি মারে না। আজকাল ওর অসুখ হলে আমি ফিরে দেখার সময় পাইনে। কতদিন অসুখ অবস্থাতে আমাকে দরজা খুলে দিয়েছে রাতে। ডেকে জিজ্ঞেস করবার মন ছিল না আমার। ও যে অন্ধকারে লেপটে থেকে আমার দিকে সভয় করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে, তা যেন আমি দেখেও দেখিনে।

আমি তামাইয়ের মাটির তলায় প্রাগৈতিহাসিক তামাইসভ্যতার সন্ধানে

ফিরি। আর সেই আবিষ্কারের ইন্ধন খুঁজতে কি প্রতি সন্ধ্যায় যাই ঝিনুকের কাছে?

আমাকে তামাইয়ের মাটি প্রতিদিন যেমন নতুন নতুন স্তরে ডাক দেয়, তেমনি করেই ঝিনুক আমার চোখে চোখ দিয়ে, নিঃশব্দে, বাতাসে আমার দৃষ্টি তুলে নিয়ে গেছে হেঁতালের তলায়। তামাইয়ের ওপারে শালবনে।

আমি মাটির রন্ধ্র খুঁজেছি। আমি শালবনে যাইনি। আমার মাটির তলায় আবিষ্কারের সাহস আছে। তামাইয়ের শালবনে যাবার উপায় নেই। সকল দিক থেকে যেন একটা বিরোধের বেড়া জালে আমাকে কষে বাঁধছে।

তামাইয়ে এখনো বর্ষার জল ভরা, টান একটুও কমেনি। তার ওপরে কার্তিক মাসে প্রবল বৃষ্টি হল। তামাই যেন কেমন ভয়ংকরী হয়ে উঠল। আমার কাটা জায়গাগুলি ভর্তি হয়ে গেল তামাইয়ের তাম্রাভ জলে। পুবের কুলে মাটি ভাঙতে লাগল।

প্রথম যেদিন বৃষ্টি হল, কুসুমের সেদিন অসুখ। একটু বাড়াবাড়ির লক্ষণ। নগেনবাবু এসে কেমন বিমর্ষ হয়ে গেলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, জ্বরটা তো অনেক দিন এসেছে। খবর দাওনি কেন টোপন?

বললাম, কুসুম তো আমাকে কিছু বলে না। পিশী—

—তোমার পিশীও খবর দিতে পারতেন। বড় দেরী করেছ।

ইঞ্জেকশন্ দিলেন। খাবার ওষুধও লিখে দিলেন। যাবার সময়, বাইরে গিয়ে আমাকে বললেন, এত দূর খারাপ অবস্থায় এসেছে যে, কী বলব, বুঝতে পারছি না। বড় ভাল মেয়েটি।

আমি তাড়াতাড়ি কুসুমের কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কুসুম, কেমন লাগছে?

কুসুম আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, ভাল।

বড় মায়া লাগল। কুসুমের এই নীরব অভিমানের কাছে কেমন যেন অপরাধী মনে হল নিজেকে। নগেন ডাক্তারকে দেরী করে খবর দেবার কথা শুনেছে ও। পিশীর মুখ সব সময় থম্‌থমে। কুসুমের অসুখ তো তাঁরও যেন সংসারের সব খেলার কোলাহল নীরব। জানি, নিঃসন্তানা পিশীর আমি যা, তার চেয়ে কুসুম অনেক বেশি।

বিকেলে কুসুম একটু ঘুমিয়েছিল। আমি ভবেনদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ভবেন তখন বাইরের ঘরে কয়েকটি আগামী ম্যাট্রিকের ছাত্রকে পড়াচ্ছিল। ঝিনুক আমার মুখ দেখে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

ওকে বললাম কুসুমের অসুখের কথা। নগেন ডাক্তারের শেষ কথাও উল্লেখ করলাম।

ঝিনুক একবার আমার চোখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, কুসুম

তোমাকে ভালবাসে টোপনদা।

বললাম, সেটা কি আজ নতুন নাকি?

ঝিনুক আমার দিকে আবার তাকাল। ওর মুখে হঠাৎ এক ঝলক রক্ত এসে পড়ল। বলল, তুমি যা ভাবছ তা নয়। আমি বলছি, ও তোমাকে—তোমাকে—।

একটা চমকিত বিস্ময়ে ভ্রূ কুঁচকে উঠল আমার। জিজ্ঞেস করলাম, কী আমাকে?

ঝিনুক বলল, একজন মেয়ে যেমন করে একজন পুরুষকে ভালবাসে, তেমনি।

একটা চমকিত বিস্ময়ের সঙ্গে বিরক্তি আমি চাপতে পারলাম না। বললাম, ঝিনুক ও বেচারীর ওপর অমন অবিচার কর না। ও অত্যন্ত ছেলেমানুষ।

—অবিচার?

ঝিনুক আমার সামনে এল। বলল, প্রথম যেদিন আমাকে দেখেছিলে টোপনদা, সেদিন কি আমি খুব বড় ছিলাম?

—সেদিন আমিও ছোট ছিলাম ঝিনুক।

ঝিনুকের মুখে অতীতের ফেলে-আসা লজ্জার ছায়া দেখতে পেলাম আজ। বলল, টোপনদা সেদিন তুমি ছোট হলে যা হত, বড় হলেও তাই হত।

তবু দু'চোখে আমার বিস্ময়। বুকভরা অবিশ্বাস। বললাম, যা বিশ্বাস-যোগ্য নয়, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই ঝিনুক।

—অবিশ্বাস করতে পার, আমি একটা সত্য কথা বললাম। টোপনদা, সংসারের সবই কি বিশ্বাসযোগ্য?

ঝিনুক জানালার কাছে গেল। সেখান থেকে বলল, টোপনদা, তুমি, আমি এসব কি বিশ্বাসের? তুমি বলেছ, তোমার যা সান্ত্বনা, আমারও সেই সান্ত্বনা থাক। বল তো, এ কষ্ট কি লোকে সত্যি বলে জানে?

নিজেকে সেকথা জিজ্ঞেস করবার সাহস নেই আমার। করতে পারলে একদিন বুঝি শালবনে যেতে পারতাম। এক সন্ধ্যায় হয়তো গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম হেঁতালের তলায়। কিংবা ত্যাগ করতে পারতাম শালঘেরি।

কিন্তু ঝিনুকের কথায় অবিশ্বাসে তেমনি মনটা বেঁকে রইল আমার। কেন না, প্রবৃত্তিও ছিল না বিশ্বাসের। ঝিনুকের গলায় যে সুর কোনোদিন শুনিনি, সেই ভয়চাপা রুদ্ধ গলা শুনতে পেলাম। ঝিনুক বলল, কুসুমকে দেখে বুঝি আমারও বুক কেঁপেছিল টোপনদা। কুসুমকে দেখেই বুঝি আর পেছুতে পারিনি।

আমি আর্তস্বরে ডাকলাম, ঝিনুক।

—না, তোমাকে কোনোদিন খাটো করিনি টোপনদা।

কুসুমের প্রতি ঝিনুকের ব্যবহারগুলি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তবু একি অবিশ্বাস্য কথা! এ কথা কেমন করে মানি।

ঝিনুক হঠাৎ দ্রুত বলে উঠল, টোপনদা, তুমি তাড়াতাড়ি কুসুমের কাছে যাও।

ভবেন এল এ সময়ে। বলল, কি হল, তোরা আবার ঝগড়াটগড়া করেছিস্ নাকি?

আমি বললাম, না। কিন্তু ঝিনুক কী বলছে শোন্। আমি চলি।

চলে এলাম। শালঘেরির রক্তমৃত্তিকা বৃষ্টির জলে গাঢ় রক্তের মত হয়েছে। পুবে বাতাস বইছে। শালবনের আকাশে গাঢ় কালো মেঘ আছে থম্‌কে। বাকী আকাশটার কোথাও কোথাও, ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে অস্পষ্ট নক্ষত্র দেখা যায়।

বাড়ি ফিরে এলাম। দূরে থেকে লুকিয়ে কুসুমকে দেখার ইচ্ছে হল আমার। ঝিনুক এত অবিশ্বাসের কথাও বলতে পারে।

দরজার কাছে এসে দেখলাম, হরলালকাকা আর তারক উঁকি মারছে বাড়ির দিকে। আমাকে দেখে থতিয়ে গেল দুজনেই।

হরলালকাকা বললেন, এই যে টোপন, কুসি কেমন আছে?

বললাম, ঘুমোচ্ছে।

তারক অনেকখানি সরে গেছে আমাকে দেখেই।

হরলালকাকার মুখে মদের গন্ধ। বললাম, হরকাকা, কুসুমের শরীর খুবই খারাপ। আপনি আজকে যান।

হরলালকাকা বোধহয় একটু বিব্রত হলেন। বললেন, খারাপ তো হবেই নগেন শুদ্দুরটাই আমার মেয়েকে মারবে।

আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। বাইরে থেকে হরলালকাকার গলা শোনা গেল, আচ্ছা, আমিও মেয়ের বাপ, একবার দেখে নেব!

দেখলাম, পিশী কুসুমের একটি শাড়ি জড়িয়ে পাকা মাথাটি বের করে আমার জন্য রান্নায় বসেছেন। পিশীর বড় দুর্গতি।

জিজ্ঞেস করলাম, পিশী, কেমন আছে কুসুম।

পিশী বললেন, ঘুমোচ্ছে।

আমি পিশীর ঘরে গেলাম। কুসুম এঘরেই আছে। একটি হ্যারিকেন একটু কমানো। তাতে সবই দেখা যায়। গিয়ে দেখলাম, কুসুমের চোখ বোজা। অপুষ্ট শীর্ণ শরীর থেকে কাঁথার ঢাকনা খুলে গেছে। কষ্টের একটি অস্পষ্ট ছাপ তাতে মুখে।

ঝিনুকের কথা কী অবিশ্বাস্য। এই তো কুসুম। অসুখে পড়েছে তাই, নইলে পিশীর সঙ্গে এখন কিছু একটা বায়না নিয়ে থাকত। ঝগড়া চলত, দৌড়াদৌড়ি হত। হয়তো এর মধ্যে বারকয়েক ছুটে ভাইবোনেদের কাছে ঘুরে আসত গিয়ে। উচ্চকিত হাসিতে ডুবে যেত পিশীর গলার স্বর।

কুসুমের দিকে তাকিয়ে আমার মন যেন অনেকখানি স্বচ্ছ হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ বসে থেকে আমি ওর কপালে হাত দিলাম। জ্বরটা কমেনি। বরং বেড়েছে যেন। কাঁথাটা টেনে দিলাম গলা অবধি। দিয়ে উঠে, চলে যাচ্ছিলাম।

কুসুমের গলা শুনলাম, টোপনদা।

কুসুম ঘুমোয়নি? ফিরে বললাম, ঘুমোসনি কুসুম?

অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম, কুসুমের ঈষৎ রক্তাভ দুটি বড় বড় চোখ। করুণ দূরবিসারী অন্ধকারে দুটি আলোর মতো নিরুদ্দেশে খুঁজে ফেরা দৃষ্টি যেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কুসুম ঘুমোসনি?

ওর গলাটা মোটা আর চাপা শোনাল। বলল, ঘুম আসছে না। টোপনদা।

—কী বলছিস্?

—তুমি কি তামাইয়ে যাচ্ছ?

—না।

—টোপনদা, বাবা এসেছিল?

আমার বুকের মধ্যে ধুক্ করে উঠল। বললাম, হরকাকা এসেছিলেন, চলে গেছেন। কেন?

—এমনি।

কুসুমের চোখ তেমনি খোলা। কিন্তু ওর মুখ ক্রমেই লাল হয়ে যাচ্ছে।

আমি পিশীকে ডাকলাম। পিশী এলেন। এসে দেখেই বললেন, জল, তাড়াতাড়ি জল দিতে হবে মাথায়।

পিশীই তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এলেন। আমি ঢেলে দিলাম। পিশী কুসুমের গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

মাথা ধোয়ার পর আমি নগেন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলাম আর একবার। নগেন ডাক্তার দেখে মুখ কালো করে বললেন, টাইফয়েড রোগ, বড্ড বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

ইঞ্জেকশন দিয়ে চলে যাবার আগে বললেন, শরীরে তো দেখছি রেজিস্ট্ করার ক্ষমতা একটুও নাই। ওর বাবা মা'কে একটু খবর দিয়ে রাখ।

পিশীর কাছে খবর পেয়ে ওর মা এলেন। দেখলেন অসহায়ভাবে। পিশীকে বললেন, সেজদি, দেখে কী করব। আপনার মেয়ে আপনি বুঝুন।

তারপর ওপর দিকে তাকিয়ে, কড় গুনে গুনে কী যেন বিড়বিড় করলেন। বললেন, পনর পূর্ণ হয়ে, ষোলয় পড়েছে দু'মাস।

বলে চলে গেলেন। ছায়ার মত এসেছিল কুসুমের ভাইবোনেরা। ওরাও মায়ের সঙ্গে চলে গেল।

পিশী দালানে গিয়ে জপে বসলেন সব সেরে।

কুসুম আবার ডাকল, টোপনদা।

বাতিটা কাছেই। কুসুমের মুখটি যেন ঘাম ঘাম চকচকে লাগছে।

বললাম, কি বলছিস্ কুসুম?

কুসুমের চোখ তেমনি রক্তাভ। কিন্তু চোখের পাতা আনত। চুলগুলি

বালিশ ছাড়িয়ে মেঝেয় পড়েছে। লাল কাচের চুড়ি পরা একটি হাত বুকের ওপরে।

বলল, তুমি কি ঝিনুকদির কাছে যাচ্ছ?

'ঝিনুকদির কাছে' কেন, ঝিনুকদি'দের বাড়িতেই তো যাবো কুসুম। কিংবা আজ ঝিনুকের কথা শুনে, আমার কানে লাগছে ওরকম।

বললাম, না। কেন রে?

কুসুম একবার তাকাল আমার মুখের দিকে। বলল, আমার অসুখ বলে যেতে পারছ না, না?

বললাম, সন্ধ্যাবেলা ঘুরে এসেছি। তুই কথা বলিসনে কুসুম।

কুসুম যেন হাসল। যেন সুস্থ চকিত চোখে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, আমি মরে যাব, না?

আমার বুকের মধ্যে চমকে উঠল। কুসুমের পাশে বসে বললাম, না। অবাধ্য হোসনি কুসুম। চুপ করে ঘুমো।

কুসুম চোখ বুজল। কিন্তু ওর নাসারন্ধ্র ফুলছে বারে বারে। বুকের ওপর হাতখানি ওঠানামা করছে।

আমি মুখ ফিরিয়ে গালে হাত দিয়ে বসলাম। কুসুমের অসুখে আমাকে বড় একটা বসতে হয়নি কোনোদিন।

বাইরে বুঝি বৃষ্টি নেমেছে আবার।

সহসা আমার কোলে স্পর্শ পেতে চমকে ফিরলাম। কুসুমের হাত। কুসুম তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

—কিরে কুসুম?

কুসুম আমার হাত টেনে নিল ওর কপালের ওপর। কিছু বলল না। আমার কানে ঝিনুকের কথাগুলি বাজতে লাগল। কুসুম যেন মৃত্যুর বিশ্বাসে কেমন বদলে গেল।

পরমুহূর্তেই দেখি, কুসুমের সর্বাঙ্গ কাঁপছে, ফুলছে।

—কুসুম!

দেখলাম, কুসুম আমার হাত ওর মুখে চেপে ধরে কাঁদছে ফুলে ফুলে। ওর জ্বরতপ্ত মুখগহ্বরে, বিষম জ্বরের শুকনো জিহ্বা ঠেকছে আমার আঙুলে।

কুসুমের মাথায় হাত দিয়ে আমি ভীত রুদ্ধ গলায় ডাকলাম কুসুম! কুসুম। কী হয়েছে!

রোরুদ্যমান গলায় কুসুম অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমি মরে যাব টোপনদা। আমি আর থাকতে পাব না।

—না কুসুম, মরবি না। কুসুম।

কিন্তু কুসুম শান্ত হল না। পিশী ছুটে এলেন জপ ফেলে। ডাকলেন, কুসি' অ কুসু।

কুসুমের সরু আঙুল আমার হাতে কঠিন শক্তিতে যেন বিদ্ধ হতে লাগল।

ওর চোখের দৃষ্টি অস্থির। যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শ্বাসরুদ্ধ গলায় ডাকল, টোপনদা!

আমি দু'হাত দিয়ে কুসুমকে সাপটে ধরলাম। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, বল্ কুসুম।

কুসুম তেমনি গলায় বলল, ঝিনুকদি। ঝিনুকদি।

—ঝিনুকদি নেই এখানে কুসুম।

—ঝিনুকদি…রাগ…করবে টোপনদা।

বলতে বলতে কুসুম প্রায় উঠে পড়ল। আমি জোরে ডাকলাম কুসুম।

কুসুম চমকে ফিরে তাকাল আমার দিকে। দৃষ্টিটা সহসা স্বচ্ছ দেখাল আবার। তারপর আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন হতে লাগল।

শুইয়ে দিলাম। ওর গা অত্যন্ত দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। দেখলাম, আমার জামা ওর মুঠিতে।

সামনে তাকিয়ে দেখি পিশী নোনা দেয়ালে মুখ গুঁজে আছেন। সেই ফাটা পুরানো দেওয়ালের অভ্যন্তর থেকে একটি সরু গলার কান্নার স্বর আসতে আসতে নির্গত হচ্ছে।

কুসুমের রক্ত তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হতে লাগল।

আমার ভিতর থেকে কে যেন চুপিচুপি বলে উঠল, কুসুম তাহলে আমার সঙ্গে বুঝি তামাইয়ের ওপারে শালবনে বেড়াতে যেতে চেয়েছিল। কুসুমের প্রতিদিনের প্রতিটি হাসি, চাউনি, কথা আমার মনে পড়তে লাগল। কখনো তো কিছু বুঝতে পারিনি। এখনো যেন পারছি না।

কুসুমের মুঠি শিথিল হয়ে গেল। আমার কোলেই ওর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। তারক কোথায়? তারকের একবার আসা উচিৎ এখন। সে তার তেজালো ভালো মেয়েটিকে একবার দেখে যাক।

কুসুমের মৃত্যুর দুদিন পরেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। রোদ উঠল, আর সেই সঙ্গে ঠাণ্ডাও পড়ল। কিন্তু আমি মাটি খননের কাজে যেতে পারলাম না। করিক জানতে এসেছিল, এখন কাজ হবে কি না। বলেছি, খবর দেব। সামনে অগ্রহায়ণ মাস। ধান কাটার মরসুম পড়বে। তখন লোক নিয়ে টানা-টানি পড়ে যাবে, সে জন্যেই ওদের একটু তাড়া।

কিন্তু কী করব। পারি না যে। একটা চকিত ব্যথা ও বিস্ময়ে মন যেন অবশ হয়ে গেছে। কুসুম মারা গেছে, তাই ওর প্রেমে আমি আবিষ্ট হয়েছি, এরকম কোনো বোধই আমার নেই। আমার পক্ষে তা সম্ভবও নয়। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিনে, কুসুমের কাছে জগৎ সংসার কত ভয়ের, কী নিষ্ঠুর ছিল। ছোট একটি প্রাণ নিয়ে কত সন্তর্পণে তাকে কঠিন বেড়ার মধ্যে লুকিয়ে ফিরতে হয়েছে। কুসুম মরে প্রমাণ করল, জীবধর্মের কোনো বয়স

নেই, মানুষের শাসন তার মনোজগতের দরজায় শুধু প্রহরীর কাজ করে। ভিতরে কখনো প্রবেশমাত্র পায় না।

পিশীর অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। তিনি যে বাড়িতে আর টিকতে পারছেন না, বুঝতে পারছি। কাজ হয়ে গেলেই বাড়ির বাইরে চলে যান। আর এ বাড়িতে, সবখানে, সবকিছুতেই কুসুমের হাত ছোঁয়ানো। কুসুম কলরব করত, হাসত, ছুটত, কাজ করত, এ বাড়িতে মানুষের সাড়াশব্দ বলতে সেটাই ছিল। কুসুম ছিল বলেই পিশীকেও সব সময় কথা বলতে হত। এখন পিশীর একটা কথাও শুনতে পাইনে। পিশী বাড়িতে আছেন কি না, তাই এক এক সময় বুঝতে পারিনে। আমার সঙ্গে কুসুমের বিষয় কোনো কথাই হয় না। বুঝতে পারি, খাবার সময় হলে পিশী যখন আমাকে ডাকেন, তখন তাঁর গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। খেতে দিয়ে পিশী রান্নাঘরের দরজার কোনটার দিকে তাকান, যেখান থেকে কুসুম চেয়ে চেয়ে আমার খাওয়া দেখত। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে বাতি দেবার সময় হলেই কুসুমের কথা আমার মনে পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি আমি নিজেই যাই পিশীর ঘরে, পিশীও সেই সময়েই বাতি নিয়ে এগিয়ে আসেন। তখন দু'জনেই বুঝতে পারি, কুসুম আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মেঝেয়, যেখানে বিছানা পেতে কুসুমকে নিয়ে পিশী শুতেন, ঠিক সেখানেই পিশীর বিছানা পাতা হয়।

এখন মনে পড়ছে, পিশী কতদিন বলেছেন, 'দ্যাখ কুসি, তুই আর ছেলেমানুষটি নাই বাপু যে, কোলের শিশুর মতন সারারাত আমাকে আকড়ে শুয়ে থাকবি।' কিংবা, 'ই কী মেয়ে বল দিকি, বাছুরের মতন সারারাত বুকে মুখ গুঁজে থাকবি?' এই স্নেহের বকুনিতে কুসুম বোধহয় একটু লজ্জা পেত, বলত 'হ্যাঁ, বলেছে তোমাকে, আমি মুখ গুঁজে থাকি।'...আশ্চর্য! আশ্চর্য! কুসুম যে সত্যি শিশুই ছিল। আর এখন পিশীর বিছানার খালি জায়গাটা হাতড়ে হাতড়ে হয়তো তাঁর ঘুম আসে না।

আরো কয়েকদিন পরে, আমাদের হেড পণ্ডিত মহাশয়ের বড় মেয়ে রাজুদিদি এলেন। পুরো নাম রাজেশ্বরী, নিঃসন্তান বিধবা, আমার থেকে বছর দশেকের বড়। পিশী তাঁকে নিয়ে আমার সামনে এসে বললেন, টুপান, রাজু এখন থেকে রান্না বান্না করবে, ও তোর দিদির মতন এ বাড়িতে থাকবে, বুঝলি?

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, নিশ্চয়। রাজুদির যদি কষ্ট বা অসুবিধে না হয়—।

রাজুদি বলে উঠলেন, কষ্ট কী ভাই, আসলে তোমাকে একটি দিদির ভার নিতে হবে।

আমি বুঝতে পারলাম, আমিষ ঘরে আমার জন্যে পিশীর রান্না করতে কষ্ট হচ্ছে। বললাম, ভার বলছেন কেন রাজুদি। নিজের দিদি নেই, একজন দিদি সংসারে থাকতে পারেন না? রাজুদি বললেন বেঁচে থাক ভাই।

তারপরে হঠাৎ হেসে বললেন, বাবা হেড পণ্ডিত হতে পারেন, নামটা কিন্তু ভাই ভুল রেখেছিলেন। কোথায় যে আমি রাজেশ্বরী, বুঝতে পারি না।

হয়তো অন্তরে, আমি মনে মনে বললাম। কিন্তু চোখ নামিয়ে চুপ করে রইলাম। তখনো আমার আসল কথা শোনা বাকী ছিল। পিশী হঠাৎ বললেন, অরে টুপান, আমি বাবা একটু রামপুরহাটে যাব।

—রামপুরহাট?

—হ্যাঁ, তোর পিশেমশায়ের ভিটেয় একবার যাব।

এতদিন বাদে, এই বয়সে পিশী আবার শ্বশুরবাড়ি যাবেন। সেই জন্যেই তবে রাজুদিকে ডাকা। এক মুহূর্তের জন্যে মনটা গুটিয়ে গেল, আহত ব্যথায় চুপ করে রইলাম। তারপরে মনে হল, সত্যকেই স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করি। ভুলে যাই কেন, কুসুম বিনা পিশীর দিন কেমন কাটছে। এমনিতেই তো বাড়িতে থাকতে পারছেন না।

আমি কথা বলবার আগেই পিশী বললেন, রাগ করলি টুপান।

তাড়াতাড়ি বললাম, না না, রাগ করব কেন পিশী। তোমার কষ্ট হচ্ছে, আমি জানি। ভাবছি, এতকাল বাদে, রামপুরহাটে গিয়ে তোমার ভাল লাগবে?

পিশী বললেন, যাই তো।

তারপর কাছ থেকে চলে যেতে যেতে বললেন, তুই একটা বে' থাও করলি না, কী বা করি।···

দু'দিন পরে পিশী চলে গেলেন। দেখলাম, পিশীর ঘরে আলনায়, কুসুমের জামাকাপড়গুলি আর নেই।

আবার মাটি কাটার কাজ সুরু হল। কিন্তু অত্যন্ত অনিয়মিত। ধান কাটা তোলা নিয়েই কারিকরা বেশীর ভাগ সময় ব্যস্ত হয়ে থাকে! কয়েক দিন পর একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। ধান তোলা শুধু নয়, এর পরে মাড়াই ঝাড়াই আছে। স্থির হল এ দিকটা একেবারে মিটুক তারপরে ওদিকটা হবে। কারিকরা ছাড়া হবে না, কারণ ওরাই মাটি কাটার কাজটা একটু শিখে নিয়েছে। কারিক টুডু নিজেও খুব সাবধানী বটে। অতএব, আপাততঃ একেবারে বন্ধ রইল কাজ।

কুসুমের মৃত্যুর পরে, তিনদিন ভবেনদের বাড়ি যাইনি। ভবেন রোজই এসেছে। সে আমার সঙ্গে কুসুমকে দাহ করতেও গিয়েছিল। শ্মশানে, মধ্যরাত্রে লালপাড় বাসন্তী রং শাড়ি পরা কুসুমকে, বাতি সামনে নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে দেখেছিল ভবেন। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। শ্মশানযাত্রীরা সকলেই সেই কান্নায় অবাক ও বিব্রত বোধ করেছিল। আমি ভবেনকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, ভবেনের বুকে কান্না অনেক জমেছিল, কুসুমের মৃত্যুতে সেই জমাট অশ্রু গলবার অবকাশ হয়েছিল।

তিনদিন পর যেদিন প্রথম গিয়েছিলাম, মাঠের পথ থেকেই দেখেছি, ঝিনুক দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই তিনদিন ঝিনুক ইন্দিরকে দিয়ে ডাকতে পাঠায়নি। ভবেনকে বলে পাঠায়নি। নিজেও যায়নি। এটা ঝিনুকের পক্ষে আশ্চর্যই বলতে হবে। শালঘেরিতে ফিরে আসার পর, সেই বোধহয় প্রথম, বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও ঝিনুক তিনদিন চুপচাপ নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

রবিবার বলেই ভেবেছিলাম, ভবেন নিশ্চয় বাড়িতে আছে। বেলা এগারো-টায় আনিদি রান্নায় ব্যস্ত। আমি দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখেছিলাম, ঝিনুক সিঁড়ির মুখে দরজাতে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি কাছে যেতে ও আমাকে যাবার জন্য পাশ দিয়েছিল। জানি ও আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আমার মুখের প্রতিটি রেখার দর্পণে, ভিতরটাকে দেখতে চাইছিল। কিন্তু অস্বীকার করব না, সেদিন আমার মুখ নিভাঁজ শক্ত হয়েছিল। দরজা খোলা ঘরের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভব বাড়ি নেই?

ঝিনুক, অনেকটা স্তিমিত গলায় বলেছিল, না, কিছুক্ষণ আগে বেরিয়েছে। তোমার ওখানে যায়নি?

—না তো। তবে আমি বেরিয়েছি অনেকক্ষণ, করিকদের পাড়ায় গেছলাম একটু।

ঝিনুক বলেছিল, বসবে চল।

আমি আগে আগে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলাম। পিছনে ঝিনুক। বলেছিল, চা খাবে নাকি?

—দাও।

—একটু বস, আসছি।

ঝিনুকের চলে যাবার অস্পষ্ট শব্দ শুনেছিলাম। আয়নার দিকে ফিরে, নিজেকে আমার চোখে পড়েছিল। কয়েকদিন ক্ষুর পড়েনি গালে। চুলগুলিও অবিন্যস্ত। জামাকাপড়ের অবস্থাও তথৈব চ। আয়নার দিক থেকে ফিরে, খাটের পাশ দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বাইরে রোদ ছিল। কার্তিক মাসে মনে হয়েছিল যেন, শ্রাবণে বর্ষার পরে রোদ উঠেছে। সব কিছুই মাঠ ঘাট গাছপালা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। কিন্তু মেঘের পরে এই রোদের মধ্যে, ঠিক যেন প্রসন্নতার আমেজ ছিল না। একটা বিমর্ষতার ছায়া। হয়তো কার্তিকের অসময়ের বর্ষা বলেই। কিংবা বিমর্ষতা আমার মনেই ছিল।

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠেছিলাম, ঝিনুক আমার কাছেই। আমি ফিরে তাকাইনি। একটু নড়েচড়ে উঠেছিলাম।

ঝিনুকের গলা শোনা গিয়েছিল, তুমি সেদিন যাবার কতক্ষণ পরে মারা গেল?

বললাম, দু'তিন ঘণ্টা হবে বোধহয়।

—অচৈতন্য ছিল?

—না, পুরোপুরি জ্ঞান ছিল মনে হয়। একটা ঘোর অবশ্য ছিল।

ঝিনুক চুপ করেছিল একটু। আমি জানতাম, কিসের কৌতূহলে ও আগ্রহে ঝিনুক মরে যাচ্ছে। কুসুমের মৃত্যু প্রাক সন্ধ্যায়। ঝিনুক আমাকে যা বলেছিল, সে বিষয়ে আমার উপলব্ধির সত্যাসত্য জানতে চাইছিল ও।

আমি আবার বলেছিলাম, মনে হল, একটা ভয় আর উত্তেজনার ধাক্কায় কুসুম হঠাৎ মারা গেল।

ঝিনুক বলেছিল, সেটা কী রকম টোপনদা?

আমি কুসুমের মৃত্যুর হুবহু দৃশ্য বর্ণনা করেছিলাম। বলেছিলাম, কুসুম আমার হাতটা ওর মুখের ওপর টেনে নেবার পর থেকে বারে বারে তোমার নামই করেছে, ঝিনুকদি ঝিনুকদি। একবার বললে, 'আমি মরে যাব টোপনদা, আমি আর থাকতে পাব না।' তারপরে আমার মনে হল, ও শুধু তোমাকেই দেখতে পাচ্ছিল। একবার ভয় পেয়ে হঠাৎ উঠে পড়ল, আর অস্থির চোখে তাকিয়ে বলে উঠল, ঝিনুকদি ঝিনুকদি'। আমি তাড়াতাড়ি ওকে কোলের কাছে নিয়ে বললাম, 'ঝিনুকদি এখানে নেই কুসুম'। কুসুমের গলা নিভে যেতে লাগল, বলল, 'ঝিনুকদি রাগ করবে টোপনদা'।···সেই ওর শেষ কথা।

কথা শেষ হতেই ঝিনুক আমার জামাটা শক্ত মুঠিতে আঁকড়ে ধরেছিল। ঠিক যেমন করে, মরবার পূর্বমুহূর্তে কুসুম ধরেছিল। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখিনি, হয়তো ঝিনুক কাঁদছিল, কাঁপছিল রুদ্ধশ্বাস হয়ে।

আমারও বুকের কাছে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে, যেন একটা ব্যথা ধরে যাচ্ছিল। কিন্তু অস্বীকার করতে পারব না, ঝিনুকের জন্যে কোনো সমবেদনাই আমার জাগছিল না। বরং একটা বিরাগ ও বিতৃষ্ণাই যেন বোধ করছিলাম। এমন কি, আমার মনে হয়েছিল, ঝিনুকের প্রতি একটা ঘৃণা জেগে উঠছে। কুসুমের মৃত্যুর দায় থেকে ঝিনুককে আমি কিছুতেই, মন থেকে একেবারে রেহাই দিতে পারছিলাম না। হয়তো, এটাও জীবনধর্মের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু তার কুটিলতা এত নিষ্ঠুর গভীর কেন? আমার চোখের সামনে, কুসুমের প্রতি ঝিনুকের প্রতিটি ব্যবহার ভেসে উঠছিল! জানিনে, আমার অদেখায় আরো কী ব্যবহার করেছে ঝিনুক। কেন? কে—ন? ঝিনুক যেখানে রাজরাজেশ্বরী, সেখানে কুসুমের মতো একটা সামান্য মেয়ের প্রতি এমন নির্মমতা কেন?

আস্তে আস্তে ঝিনুকের মুঠি শিথিল হয়েছিল। আমার জামা ছেড়ে দিয়েছিল সে। একটা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু ও কেঁদে কিছু বলেনি। নিচু গলায় যেন দূর থেকে বলেছিল, আমি জানি, তুমি কী ভাবছ টোপনদা। কিন্তু কী করব, আমি পারিনি। সব জেনেও, কেন যে ভয় পেয়েছি, আমি জানি না। তুমি যা বল, হিংসা-রাগ-ভয়, এ সবই আমার মধ্যে ছিল।

আমি মুখ না ফিরিয়েই বলেছিলাম, এটা নীচতাও বটে।

এক মুহূর্ত থেমে ঝিনুক বলেছিল, হ্যাঁ, নীচতাও বটে। যে মুহূর্তে

আমি কুসুমকে দেখে বুঝেছি, ও মনে মনে তোমাকে সব কিছু সঁপে দিয়ে বসে আছে, সেই মুহূর্ত থেকে, ভীষণ শত্রুর মতো ওকে দেখেছি। ওকে আর একটুও সহ্য করতে পারিনি। আজ তোমাকে বলি, ওর এক উপোসের দিনে, ওকে আমি শিবের মন্দিরে গিয়ে ধরেছিলাম। আমি জানতাম, উপোসের দিনে, মন্দিরে, ও আমাকে মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। ডেঙা শিবের নিঝুম মন্দিরে, আমাকে দেখেই ওর মুখ শুকিয়ে গেছল। বাঘ দেখলেও মানুষ এত ভয় পায় না। আমি ওর হাত চেপে ধরে, মন্দিরের ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেছিলাম, 'ঠাকুরকে ছুঁয়ে বল, টোপনদাকে তুই কী চোখে দেখিস? মিথ্যে বললে তোর টোপনদার অকল্যাণ হবে'। কুসুম শিউরে কেঁপে উঠে, ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, 'বলব, বলব ঝিনুকদি'। বলে কাঁদতে লাগল। আমি বুঝতে পারছিলাম, তবু ছাড়িনি। বলেছিলাম, 'টোপনদাকে তুই ভালবাসিস্'? কুসুম মাথা নেড়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ', বলেছিলাম, 'কী রকম সেটা? মেয়েমানুষ যেমন স্বামীকে ভালবাসে?' কুসুম উপুড় হয়ে কেঁদে উঠে বলেছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ'। তারপরেই আমার পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'ঝিনুকদি, এ কথা টোপনদাকে বলো না, তোমার পায়ে পড়ি। তা হলে টোপনদা আমাকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। সে কিছুই জানে না। জগতে যে কেউ কোন দিন জানতে পারবে, ভাবিনি। ঝিনুকদি, তুমি কী করে জানলে জানি না। তুমি যা বলবে, তাই শুনব, কিন্তু এ কথা কাক পক্ষীকেও বলো না।'···

আমি আর শুনতে পারছিলাম না। বিস্ময় ব্যথা ও ঘৃণা আমার বুকের মধ্যে উছলে উঠছিল। বলে উঠেছিলাম, চুপ, চুপ কর ঝিনুক। তোমার কাছে এসব আমি শুনব আশা করিনি।

—কেন করনি!

ঝিনুকের স্পষ্ট নিচু গলায় শোনা গিয়েছিল, কেন করনি। নীচ বল, হীন বল, আমার সব এক জায়গা থেকেই ঘটছে। যেখান থেকেই দেখ, যে ভাবেই দেখ, একটা জায়গা থেকেই আমার চলা ফেরার সুতো নাড়ানাড়ি, একখানেই মরিবাঁচি, আমার উপায় নেই। তাতে আমাকে ভাল কি মন্দ দেখায়, নীচ বা উচ্চ বোঝায়, আমি জানি না। আমার সবটা দেখেও তুমি, এটা বোঝ না?

বলতে বলতে ঝিনুকের গলায় কেমন একটা ঝংকার বেজে উঠেছিল। না থেমে ও বলেছিল, তুমি আমাকে বকতে পার, মারতে পার, তোমাকে একটুও দোষ দেব না। কিন্তু এটুকু বিশ্বাস করো, কুসুমের মরণটা তো তবু তোমরা কোনোদিন ভুলবে, আমার চিরদিনই বাজবে। কারণ—কারণ কুসুম আর আমি যে এক পুকুরেই নিজেদের মুখ দেখেছি, আমরা দুজনেই তো নিজেদের সব থেকে বেশী চিনেছি। তাই ওকে আমি ঘৃণা যত করেছি, ও মরে যাওয়ায় কষ্ট আমার তত বেশী।

ঝিনুক চুপ করেছিল। আমি তখনো বাইরে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই দেখছিলাম না। ঝিনুকের কথাগুলিই আমার কানে বাজছিল। আমি

ওর দিকে ফিরে তাকিয়েছিলাম।

ঝিনুক আমার দিকেই তাকিয়েছিল। মুখ ফেরাতেই, ওর সঙ্গে চোখাচোখী হয়েছিল। না, ঝিনুক কাঁদছিল না, তার পরিবর্তে যেন এক গভীর স্বপ্নাবেশ ছিল ওর চোখে। রক্তাভ ঠোঁট দুটি খোলা, তার ফাঁকে ঝকঝকে দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছিল। সেই রৌদ্র যেন দুপুরের আভায় চলকাচ্ছিল। এত কাছে, প্রায় ওর নিঃশ্বাস অনুভব করছিলাম আমার গায়ে। আমি জানতাম, সেই ওর সব থেকে করুণতম রূপ। ঝিনুককে যে চেনে, সেই জানে, ওর ওই ভঙ্গীটিই সব থেকে অসহায়।

ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে সহসা আমারও আবেগের মুখ খুলে গিয়েছিল। ওর শেষের কথাটা আমারই কথা হয়ে উঠেছিল। দেখেছিলাম আমার ঘৃণা, আমারই আসক্তি হয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণার একি লীলা। আমার বিরাগ ও বিতৃষ্ণার উত্তাপ নিভতে পেল না, তার আগেই সমস্ত প্রাণ আবেগের ঢেউয়ে উপছে পড়েছিল। আমি চোখ ফেরাতে পারিনি।

ঝিনুক একটি হাত তুলে দিয়েছিল আমার বুকের ওপরে। আর সেই মুহূর্তেই আর একটা আলোড়ন লেগেছিল আমার বুকে। কী যে বলতে চেয়েছিলাম, জানিনে। একটা অন্যতর যাতনায়, চোখ ফিরিয়ে আবার বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। প্রায় অস্ফুট স্খলিত স্বরে বলেছিলাম, বাড়ি যাই ঝিনুক।

ঝিনুক বলেছিল, না।

ফিরে তাকিয়েছিলাম। ততক্ষণে ঝিনুক আমার সেই নিয়তির আসনে ফিরে এসেছিল। বুকে হাত দিয়ে, ঠেলে খাটের কাছে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। বলেছিল, বস, চা করে নিয়ে আসি। জল এতক্ষণে গরম হয়ে গেছে।

বলে, চলে যেতে যেতে হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। কী যেন বলবে মনে হয়েছিল কারণ ঝিনুকের ঠোঁট নড়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছু না বলে, অত্যন্ত দ্রুত, প্রায় ছুটে অদৃশ্য হয়েছিল। তারপরে ঝিনুক এসেছিল অনেক দেরীতে। অন্তত কয়েক প্রস্থ চা তৈরীর সময় কেটে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ভবেন ফিরে এসেছিল।

কিন্তু বারে বারে আমি যে-মহাকালের কথা বলেছি, প্রতি বাঁকে বাঁকে, যার ভেরী বেজে উঠেছে, নিবিড় অন্ধকারে আলোর ঝলকে জীবন অভিজ্ঞ হয়েছে, তার নিরঙ্কুশতার অনেক মহালগ্নই তখনো বাকী ছিল।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ, দু' মাস প্রায় তামাইয়ের খননের কাজ বন্ধ গেছে। মুনিষ মজুরেরাই যে শুধু ব্যস্ত ছিল, তা নয়। আমাকেও মরাইয়ে শেষ ধান তোলা পর্যন্ত বাড়িতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তারপরে এল, অনেক কাজের

শেষে একটু বিরতি। ধান কাটা তোলা ইত্যাদির পর সবাই একটু বিশ্রাম চায়। এ সময়ে আশে পাশে অনেক মেলা হয়। তবু মাঘ মাসে আর বসে থাকতে পারলাম না। অন্ততঃ নিজে যতক্ষণ না পুরোপুরি নিরাশ হচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নিরস্ত হব না। যদিও গোবিন্দবাবু কথার পরে, আমার সংশয় এখন গভীর। তবু এতগুলি প্রাচীন নিদর্শন যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে কিছুই নেই, এই সিদ্ধান্তে আসতে পারছি নে। ঝিনুকের বাবা উপীন কাকা এই গ্রামেই জন্মেছেন, আজন্ম বাস করেছেন তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতায়, তিনিও বিশ্বাস করতেন, তামাইয়ের মাটির গর্ভের অন্ধকারে একটা সুদূর অতীতের অস্তিত্ব যেন নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে। তাঁকে আমি কথা দিয়েছিলাম, তামাইয়ের নিচে যদি কোনো অতীত থেকে থাকে, তাকে আমি উদ্ধার করব। তা ছাড়া, সংশয়ের নিরসন না হওয়া পর্যন্ত, আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও কিছু স্থির করা যাচ্ছে না।

ভবেন এখনো চায়, আমি ইস্কুলে একটা কাজ নিই। তাতে আমার একেবারেই ইচ্ছে নেই। সব কাজ সকলের জন্যে নয়।

রাজুদি কী ভেবে আমাদের সংসারে এসেছিলেন, জানিনে। সুখী হননি, বোঝা যায়। একদিন বললেন, রাত্রে তো তুমি প্রায়ই ঝিনুকের ওখানে খেয়ে আস। শুধু শুধু রেঁধে কেন কষ্ট করি।

রাজুদিকে কৈফিয়ৎ দিতে পারিনে যে, অনিচ্ছাতেও খেয়ে আসতে হয়। বলি, ভবেনটা ছাড়ে না।

রাজুদি বললেন, আগে বললেই তো পারে। তা হলে আর খাবার দাবার নষ্ট হয় না।

কথাটা ঠিক। আমি চেষ্টা করি যাতে আগের থেকেই রাজুদিকে বলা যায়। কিন্তু সেটা কার্যকরী হয় না। আজকাল বাড়িতে প্রায়ই পাড়ার মহিলাদের দ্বিপ্রহারিক আড্ডা বসে। রাজুদির একাকীত্ব ঘোচাতেই এই আড্ডা। কেন যেন সন্দেহ হয়, এই আড্ডার আলোচনায় আমি ভবেন ঝিনুক, কেউ বাদ যায় না।

ঝিনুক আর আসে না আমাদের বাড়িতে সেটা এক রকম ভালো। রাজুদিকে আমার একটু ভয় করে। যদিও গ্রাম জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তবু আমার বিষয়ে যে সকলের চোখে মুখে একটা কথা থমকে রয়েছে, তা জানি। ঝিনুক এখন এলে, হয়তো আর থমকে থাকবে না।

পিশীর দু'তিনখানা চিঠি এসেছে। সবই ধানের হিসাব, মুনিষদের চরিত্র বর্ণনা, কে কি রকম মানুষ, কে চোর, কে সাধু, কে ফাঁকিবাজ। আমি তো হিমসিম খেয়ে গেছি এ দু' মাস। ধান তোলা পাড়ার ব্যাপারে পিশীই সব কিছু করতেন। কুসুমও সে বিষয়ে অত্যন্ত কর্মঠ সাহায্যকারিণী ছিল। কত ধান এল, কী মাপজোক হল, কতটা ভাগে যাচ্ছে, কতটা নিজেদের, এবং বিক্রী করার জন্যে আলাদা ধানই বা কী পরিমাণ থাকছে, এই শত শতমণ ধানের

হিসেব করা যে কী প্রাণান্তকর। অথচ পিশী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামে নামে হিসেব বলে যেতেন। কুসুম পেন্সিল দিয়ে খাতায় টুকে টুকে রাখত। তার মধ্যেই মাপের ওজন, হিসেবের গরমিল, সবই ধরা পড়ত। এবারে অঘোর জ্যাঠা যদি আমাকে সাহায্য না করতেন, কিছুতেই পারতাম না। তাঁর অবিশ্যি একটু স্বার্থ ছিল। অভাবে পড়লে, যোগান পাবেন। তার জন্যে বেশী ধান ফেরত বা সুদ দিতে হবে না। বাবার আমল থেকেই এটা চলে আসছে।

মাঘ মাসে তামাইয়ের খনন আবার সুরু হল। এবার কেমন একটা সন্দেহ হল, নদীর কাছ থেকে সরে গিয়ে সন্ধানের সীমা নির্ধারণ করলাম। অনেকখানি চাষের জমিও তার মধ্যে সংলগ্ন হল। জায়গাটাও অনুচ্চ ঢিবির মতো। মাঝে মধ্যে ছোটখাটো খানা খন্দ। কিছুটা দক্ষিণে গিয়ে, জমিটা নেমে গেছে। অনেকখানি নেমে আবার উঠেছে।

করিম টুটুকে কাজে লাগিয়ে, ভবেনকে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে, আমি কয়েকদিনের জন্যে আকোন চলে গেলাম। শুধু শালঘেরিতে নয়, আকোনেও আমার সন্দেহ নিরসন করতে চাই। প্রতিদিন যাতায়াতে বাইশ মাইল হাঁটতে পারব না বলে, আকোনে থাকাই স্থির।

যাবার আগে ঝিনুকের চোখে যেন কেমন একটা ভীরু ব্যাকুলতা দেখতে পেলাম। যেটা ওর চোখে নতুন। আমি জেলে যাবার আগে এ রকম দেখেছিলাম। যাবার আগে ও বলল, তুমি চলে যাচ্ছ?

বললাম, দু' তিনদিনের জন্যে তো। সন্দেহজনক জায়গাগুলো কার মালিকানায় আছে, একটু দরাদরি করে কেনা দরকার।

ঝিনুক যেন কী বলতে চাইল, কিন্তু সামলে গেল। কী বলবার থাকতে পারে, ভেবে পাইনে। এ রকম পরিস্থিতি এলেই, নিজেকে বারে বারে প্রশ্ন করি, এভাবেই কি চিরকাল চলবে? তবু, কয়েকদিন ধরে, ঝিনুকের অবস্থাটা খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। জানিনে কী ঘটেছে।

আকোন চলে গেলাম। পরিচয়টা প্রথম বারেই সেরে গিয়েছিলাম। মোটামুটি আমাকে অনেকেই চেনে। বাবাকেই চেনে বেশী লোকে। আমার কাজের ব্যাপারে কেউ কেউ সন্দেহও প্রকাশ করল। তবু জমি বিক্রী করতে রাজী হল।

আকোনের তামাইয়ের ধারে আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম। সেখান থেকে কয়েকটা জিনিস পেয়েছিলাম, সেই জঙ্গলে জায়গাটিকে অনেকে ধর্মঠাকুরের বাঁদাড় বলে। কতকাল থেকে বলে, তার কোনো হিসেব কেউ দিতে পারল না। বৈশাখে ধর্মঠাকুরের উৎসবের সময় বাঁদাড়ে মেলা হয়। তারপর সারা বছর পড়েই থাকে।

ধর্মঠাকুরের এই বাঁদাড়ে খুব বড় গাছ সামান্যই আছে। বাবলা ঝোপই

বেশী। মাঝে মাঝে কিছু ভিন্ন জাতের জঙ্গল। তামাইয়ের ধার থেকে প্রায় একটা খালের মতো শুকনো খাত বাঁদাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে। সেই খাতের কয়েক জায়গায় সুড়ংএর মতো গর্ত ঢুকে গেছে বাঁদাড়ের ঢিবির ঢালুতে। শুনলাম রাখাল ছেলেপিলেরা কখনো কখনো খেলা করে এই গর্তের কাছে। তবে বুনো শুয়োরের আস্তানা ছাড়া ওগুলো আর কিছু নয়।

অসম্ভব নাও হতে পারে, কাছে পিঠে বালি মেশানো মাটিতে শুয়োরের পায়ের দাগ রয়েছে। তবু একটা উদ্দেশ্য আছে বলেই হয়তো আমার আশা ও সন্দেহ, যুগপৎ ঝিলিক হেসে গেল। বারে বারেই মনে হতে লাগল, হয়তো এখানে কিছু আছে। এখানে এই সুড়ংএর মতো গর্তগুলির অন্ধকারে আমাকে যেন কারা হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

প্রশ্ন উঠল ধর্মঠাকুরের বাঁদাড় নিয়ে। ধর্মস্থানের কোনো ক্ষতি করা চলবে না, এ কথা আমাকে আগেই জানানো হল। ধর্মস্থানের পরিধি সামান্যই। বিঘা খানেক তার সীমা। কিন্তু গোটা বাঁদাড়টা তা নয়। আমি যখন কথা দিলাম, ধর্মঠাকুরকে কোনোক্রমেই উদ্বাস্তু করব না, তখন সকলেই আশ্বস্ত হল। কিন্তু কথা উঠল, বাঁদাড় বিক্রী করবে কে? ওটাত কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। অতএব আবির্ভাব হল, আকোনের ইউনিয়নবোর্ডের কর্মকর্তাদের, বারোয়ারি কমিটির মেম্বারদের।

দু'দিন ধরে একটি কথাই শুধু বারে বারে বলতে হল, এ কাজটা আমার ব্যক্তিগত কোনো লাভ লোকসানের ব্যাপার নয়। আকোনের একটা নিজস্ব কর্তব্যও আছে। যদি আবিষ্কার হয়, সেটা দেশের জন-সম্পদ বলেই বিবেচিত হবে। অনেক বিতণ্ডার পর সকলের অনুমতি পাওয়া গেল। আমাকে একটা লিখিত অনুমতিপত্রও সংগ্রহ করতে হল। বৈশাখে ধর্মঠাকুরের পূজা ও মেলা আছে। তার আগেই কাজ সুরু করব, কিংবা পরে সেটা স্থির করতে পারলাম না। শালঘেরিতে ফিরে গিয়েই স্থির করা যাবে। লোকজন সংগ্রহ করার দায়িত্বও আছে।

দিন চারেক পরে আকোন থেকে ফিরে আসার পথে, সহসা যেন আমার সমস্ত উৎসাহ নিভে যেতে লাগল। একটা বিমর্ষতায় মন আবিষ্ট হয়ে গেল। মনের এই ব্যাধিটা ইদানিং আমাকে আক্রমণ করতে সুরু করেছে। আমি আমার নিজের কার্যকারণ স্থির করতে পারি না। জীবনের সকল প্রয়োজনই অকারণ বলে বোধ হতে থাকে। কখনো মনে হয়, সবই ঠিক আছে। আবার কখনো কখনো সবই বেঠিক। জীবনধারণের বর্তমান কারণগুলি যেন অর্থহীন, তাতে আমার কোনো হাত নেই। নিরাশ বোধ করি, অসহায়তায় ভেঙে পড়ি যেন। নিজের কাছেই বিস্ময়ের অন্তঃ থাকে না, এরকম অবস্থায় যখন মনে হয়, আমি যদি শিশুদের মতো একটু প্রাণ-খুলে কাঁদতে পারি, তাহলে হয়তো এ অবুঝ কষ্টের কিছু লাঘব হয়। কিন্তু তাই বা পারি কই। সে আপনা থেকে না ফাটলে, না গলে পড়লে, তার জন্য বুক চাপড়াতে পারি না।

মনের এ অবস্থাটা আমাকে অস্থির করে। আর আমি নিজেকে শান্ত করার জন্যে, নিজেকেই বোঝাতে থাকি। নানান বিচার বিশ্লেষণের কথা কাটাকাটি চলে। তার থেকে একটা সিদ্ধান্তেই বারে বারে এসে পেঁছুই। জীবনের একটা সামগ্রিক ব্যর্থতার ভয় আমাকে নিয়ে খেলা করছে। তার হাত থেকে, তার ডানা মেলা ছায়ার বেষ্টনী থেকে আমি মুক্তি পাচ্ছি না। কিন্তু মুক্তি পেতে হবে, এই একটি কথার ওষুধ আমি আমার ব্যাধিগ্রস্থ শিরা উপশিরায় ঢেলে দিই তারই জোরে সুস্থতা ফিরে পাই।

শালঘেরিতে ফিরে, সন্ধ্যাবেলা ভবেনদের বাড়ি গিয়ে দেখলাম, ঝিনুক শয্যায়। ভবেন আর এক ঘরে চুপচাপ বসে। আবহাওয়াটা থমকানো, অস্বস্থিকর। এরকম আজকাল মাঝে মধ্যে দেখা যায়। জিজ্ঞেস করলে, ভবেন বলে, 'কই কিছু নয় তো'। ঝিনুক অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর বলে, জানি না কিছু।' বলে, ঝিনুক এমন করে তাকিয়ে থাকে, বুঝতে অসুবিধে হয় না, কোথায় কি ঘটেছে একটা। তারপরে আস্তে আস্তে আবার আবহাওয়া সহজ হয়। কিন্তু ঝিনুক ভবেনের সঙ্গে তখন প্রায় কথাই বলে না। ভবেন অনর্গল ঝিনুককে ডেকে ডেকে কথা বলে যায়। ঝিনুক যেন শুনতেই পায় না। দৃষ্টি পর্যন্ত ফেরায় না। ক্কচিৎ এক আধটা ছোট জবাব দেয়।

ওরা দু'জনে যদি আমাকে কিছু না বলতে চায়, আমি জোর করব না। বরং তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে নির্বিকার থাকবারই চেষ্টা করি। এবং এরকম ঘটনা দেখলেই, দু' একদিন আসা বন্ধ রাখি। কিন্তু ঝিনুক আর ভবেন তা রাখতে দেয় না।

আজও ভবেনকেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোরা ঝগড়া করেছিস নাকি?

ভবেন তাড়াতাড়ি উঠে বলল, না তো।

তাকে নিয়ে ঝিনুকের ঘরে এসে বললাম, এ অসময়ে শুয়ে কেন, শরীর খারাপ?

ঝিনুক উঠে বলল, না শরীর ভালই, বস।

বললাম, কী যেন হয়েছে মনে হচ্ছে?

ঝিনুক নিঃশব্দে উঠে গায়ের কাপড় বিন্যস্ত করতে লাগল। ভবেন বলে উঠল, কী আবার হবে, কিছু না।

ঝিনুক চকিতে একবার ভবেনকে তীব্র দৃষ্টিতে দেখে, আমার দিকে ফিরে বলল, চা খাবে?

ভবেন বলল, আমি আনিদিকে বলে আসব ঝিনুক?

হয়তো ঝিনুকই বলতে যেত। ভবেনের কথা শুনেই যেন গুছিয়ে আবার বসল। আমাকে বলল, বস।

ভবেন বেরিয়ে গেল। তারপরে আমার আবার জিজ্ঞেস করতে বাধে, কী হয়েছে? দেখি, ঝিনুকের মুখ শক্ত, কী একটা গভীর চিন্তায় যেন মগ্ন।

আমি বসলাম। আর সেই শব্দেই যেন ঝিনুক হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল।

ইতিমধ্যেই সেই চোখে একটা ভীতি বিহ্বলতা ফুটে উঠেছে যেন।

ভবেন ফিরে এল। আকোনের কথা উঠল। এবং আস্তে আস্তে আবহাওয়া সহজ হয়ে উঠল। কিন্তু আমার ভিতরে একটা অস্বস্তি ও আড়ষ্টতা ক্রমে আরো চেপে আসতে লাগল।

মাঘ মাস শেষ হয়ে এল। শালঘেরির তামাই উপত্যকা প্রায় প্রমাণ করে এনেছে, অতীত স্মৃতি ধারণ বিষয়ে সে বন্ধ্যা। অসহায় পাখীর কাছে যেমন করে আসন্ন সন্ধার অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে, হতাশা তেমনি নেমে আসতে লাগল আমার চোখের সামনে।

ইতিমধ্যে ফাল্গুন এল। কোথাও কোথাও শিমুলের কাঁটা ডালে ফুল ধরে গেছে, পলাশে কুঁড়ি। শুকনো পাতায় আর পথের ধুলোয় লাগল লুটোপুটি। দেখে মনে হয়, গাঢ় গৈরিক শালঘেরির আলখাল্লায় কে যেন রং ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

দু'দিন করিকদের কাজ দেখতে যাইনি। খবর কিছু থাকলে নিশ্চয় দিয়ে যেত সে। ইস্কুলের ছুটির ঘণ্টা শুনে দক্ষিণ পাড়ায় গেলাম। পথেই ভবেনের সঙ্গে দেখা। ও এত অন্যমনস্ক ছিল, আমাকে দেখতেই পায়নি। পিছন থেকে লক্ষ্য করলাম, ওর দৃষ্টি পুবে, তামাইয়ের দিকে, শালবনের মাথায়। কী এত দেখছিল ভবেন? বেলা শেষের রোদে আকাশটা গম্ভীর ও রক্তিম হয়ে উঠেছিল। আর তার বুকে শুক্লা একাদশীর অপূর্ণ চাঁদ। তখনো তার রং ধূসর লোহার মতো দেখাচ্ছিল। অন্ধকার যতোই ঘনাবে, ততোই সে তপ্ত লোহার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আলো ছড়াবে।

আমি খুব কাছে গিয়ে ডেকে বললাম, ভব, এত কি দেখছিস্ ও দিকে?

ভবেন চমকে ফিরে তাকাল। বলে উঠল, তুই?

একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, রাস্কেল।

বললাম, সেটা কোনো জবাব হল না। তুই আমাকে মাঝে মাঝে বলিস, আমি নাকি আজকাল কথা চাপতে শিখেছি। দেখছি, আমি শিখি বা না শিখি, তুই পুরো রপ্ত করেছিস্।

ভবেন আবার বলল, রাস্কেল।

আমার ঘাড়ে হাত রেখে বলল, তোর মতন যদি চাপতে পারতাম, তাহলে তো মানুষ হয়ে যেতাম।

—সেটা আবার কী রে?

—সেটা নিজেকে গোপন করতে পারা।

—কিন্তু গোপন করতে পারার মধ্যে মনুষ্যত্বের সম্পর্কটা কী, বুঝলাম না।

ভবেন আমার দিকে তাকাল। ওর চোখ মুখ চেহারা সহসা বদলে গেল। ও অন্যদিকে চোখ রেখে বলল, সোজা করে বলব?

একটু যেন থতিয়ে গেলাম। তবু বললাম, বাঁকালে বুঝতে পারব না।

ভবেনের ঠোঁটের কোণে চকিতে একটু হাসির ঝিলিক দেখা গেল। বলল,

তোর মতন অতখানি চাপবার সাহস নেই বলেই মনুষ্যত্বের কথা বলেছি।

আমি বলে উঠলাম, মানে?

ভবেন আমার চোখের দিকে তাকাল। বলল, মানে?

আমি কথা বলতে পারলাম না। আমরা দু'জনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। ভবেন যেন রুদ্ধশ্বাস হয়ে বলে উঠল, টোপন, তোর সাধ্য আছে, তোর সাধ্য আছে…।

আমি যেন অনেকটা বোকার মতো জোরে হেসে উঠে বললাম, কী সব বলছিস্, উল্লুক!

ভবেন জোরে হেসে উঠল। বলল, ওদিকে কেন তাকাচ্ছিলাম জানিস? ঝিনুক বলেছিল, আজ চাঁদ উঠলে, তামাইয়ের ধারে বেড়াতে যাবে।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ, এ বেলা তুই গেলেই তোকে বলবে বলে ঠিক করে রেখেছে।

—আর তুই তাই, সন্ধ্যে হতে না হতেই তাকিয়ে দেখছিস?

—ঝিনুকের খেয়াল তো। ভাবলাম, তুই হয়তো এতক্ষণে আমাদের বাড়ি চলে গেছিস, আর ঝিনুক তাগাদা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

আমি হাসলাম। চলতে চলতে, একটু পরে বললাম, যাবি নাকি?

—ভবেন বলল, ঝিনুকের যদি আপত্তি না থাকে।

—ঝিনুক তো বলেছে বলছিস।

—আমার যাওয়ার কথা বলছি।

আমি ভবেনের দিকে তাকালাম। ভবেন নিঃশব্দে হাসল। আমি আবার বললাম, উল্লুক!

আমরা আর একটু এগিয়ে যেতেই ভবেনদের দোতলা চোখে পড়ল। চিনতে ভুল হল না, দোতলার বারান্দায় লাল শাড়ি পরে ঝিনুক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং সে ইতিমধ্যেই আমাদের দেখতেও পেয়েছে। বাড়ির পশ্চিমে রোদ নেমে গেছে। তাই পুবের বারান্দায় ছায়া। সেই ছায়ায়, ঝিনুক যেন ঝকঝক করছিল। আমার আর ভবেনের আপনা থেকেই চোখাচোখী হয়ে গেল।

এত টকটকে শাড়ি বড় একটা পরতে দেখি না ঝিনুককে। কাছে যেতে যেতে মনে হল, চুল বাঁধাও সাঙ্গ। পিছনে, খোঁপার কাছে ভেঙে পড়া ঘোমটা রয়েছে যেন। যতো কাছে গেলাম, টের পেলাম, ঝিনুক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। ইন্দিরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল গেটে। সে বলল, এই যে, বড় বউ মা আপনকার কাছেই পাঠাচ্ছিলেন।

ঝিনুকের গলা ওপর থেকে ভেসে এল, তবু তুমি যাও ইন্দিরদা। রাজুদিকে বলে এস, উনি আজ এখান থেকে খেয়ে ফিরবেন।

ইন্দির মাথা নিচু করে, ঘাড় নেড়ে শুনল। বলল, আচ্ছা মা।

ইন্দির মাথা নিচু করেই চলে গেল। ভবেন আমার দিকে তাকাল। আমি

ভবেনের দিকে। দু'জনেই বাড়ির ভিতরে ঢুকে দোতলায় উঠলাম। ভবেন বলল, তোমার প্ল্যানটা আমি পথেই টোপনকে বলে দিয়েছি।

ঝিনুক ফিরে তাকাল। এমন কিছুই সাজেনি। তবু যেন, ওর রৌদ্র রং এর সঙ্গে রক্তের মতো লাল শাড়ি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ওর ছেলেবেলায় কোনো এক জ্যোতিষি বলেছিল, এ মেয়ে যেন কখনো হীরা ব্যবহার না করে। নীলা তো একেবারেই নয়। পান্না এর আদর্শ।

এখন ঝিনুককে দেখে আমার মনে হল, জ্যোতিষি ঠিকই বলেছিলেন। সবুজ পান্নাই ওর ভালো। সেই সঙ্গে উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে বর্ণের পোষাকও বারণ থাকলে ভাল হত। সবুজ শাড়ি পড়লে ওকে অনেক শান্ত দেখাত। এখন যেন মনে হচ্ছে, রোদে রক্তে, মাখামাখি করে রয়েছে। অথচ, ও তো সত্যি সাজেনি। গায়ের জামাটা তো শালঘেরির তাঁতির হাতের গেরুয়া রং-এর মোটা কাপড়ের। অলঙ্কারের মধ্যে সোনা বাঁধানো শাখা ও নোয়ার ওপরে কয়েক গাছা চুড়ি। গলায় একটি সোনার সরু চেন।

ঝিনুক বলল, যাবে তো?

এ ইচ্ছেটা তো নতুন নয়। তবু যে ঝিনুক দুপুরবেলা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে তামাইয়ে শালবনে যেতে চায়নি, সেটাই যথেষ্ট। এ ভাবে যেতে চাইলে অসুবিধে নেই।

বললাম, হঠাৎ আজ বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হল কেন?

ঝিনুক বলল, অনেক দিন কোথাও বেরুইনি। আজ একটু বেড়াতে ইচ্ছে করছে। ফেরবার পথে মার সঙ্গেও একটু দেখা করে আসব।

কথাটা মিথ্যে নয়। পিশী, কুসুম থাকতে ঝিনুক তবু মাঝে মধ্যেই আমাদের বাড়ি যেত। ইদানিং ওকে অনেকদিন কোথাও বেরুতে দেখিনি।

বললাম তামাইয়ের ধারেই?

ঝিনুক বলল, শালবনে যদি যেতে চাও—।

আমার বুকটা ধ্বক করে উঠল। কিন্তু ভবেনের সামনে না হেসে পারলাম না। বললাম, জান, এ দেশে তাত ফুটে গেছে?

—তাতে কী?

—এখন সাপ বেরোয়। শালবনের তো কথাই নেই, তামাইয়ের ধারেও—।

আমাকে বাধা দিয়ে, ঝিনুক বলে উঠল, কালো নাগেরা সব ফণা মেলে বসে আছে, গেলেই ছুবলে দেবে। আমি বুঝি শালঘেরির মেয়ে নই যে, ফাল্গুন মাস পড়তে না পড়তে সাপের উৎপাতের খবর তোমার কাছে জানতে হবে?

ভবেনের দিকে তাকালাম। সে বলল, বোস্ এবার।

বললাম, যাবি নাকি তা হলে?

ভবেন চোখ বড় বড় করে বলল, আমি?

ঝিনুক ভবেনের দিকে তাকাল। বলল, আপত্তি আছে?

ভবেন হেসে উঠে বলল, আপত্তি কিসের? বললেই যাই।

আমি ভবেনকে উল্লুক বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই আনিদি বৈকালিক জলখাবার ও চা নিয়ে এল।

সূর্য ডুব দিয়েছে, আকাশে তার রক্তাভা লেগে রয়েছে এখনো। পূবের শালবনের আকাশের সীমা সীসার মতো দেখাচ্ছে। অনেকদিনের পুরনো পিতলের পাত্রকে মাজলেও যেমন তার মালিন্য ছাড়ে না, চাঁদকে দেখাচ্ছে সেরকম। পাখীরা শব্দ করছে কম, উড়ে চলেছে বেশী। বাসার কাছে গিয়ে দল বেঁধে সবাই একবার হেঁকে ডেকে বিদায় নেবে।

যেতে যেতে আমি আর ভবেন ছেলেবেলার কথা বলছিলাম। ঝিনুক চুপ করে হয়তো শুনছিল কিন্তু ওর দৃষ্টি ছিল তামাইয়ের ওপারে। ওপারে, শালবনের পাশের রাস্তা দিয়ে সারি বেঁধে কয়েকটা মোষের গাড়ি চলেছে শালের গুঁড়ি বোঝাই করে। মোষের গলায় ঘণ্টা বাজছে টিং টিং শব্দে।

ভবেনকে দেখে আমার মনটা খুশি হয়ে উঠছিল। ও খুব হাসছে। কথা বলছে কিন্তু ঝিনুকের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। ভবেন অনেকদিন এরকম বেড়াতে আসতে চেয়েছে। ঝিনুকের আপত্তিতেই তা হয়ে ওঠেনি।

আমরা সেই বড় পাথরটার কাছে এসে থামলাম। আমি আর ভবেন। ঝিনুক আরো এগিয়ে যেতে লাগল। এগিয়ে একেবারে ঢালুর সীমানায় গিয়ে দাঁড়াল।

এবার ফাল্গুনেও তামাইয়ে বেশ জল। কার্তিকে বাদলা গেল, তাই বসন্তকালেও তামাইয়ের শ্রোতে গড়িমসি। প্রায় হাঁটু ডোবান গভীর। অন্যান্য বছর এ সময়ে পায়ের পাতা ডোবে। জলের কলকল শব্দ বাজছে। যেন তামাই কোন এক অজানাকাল থেকে একটা কাহিনী বলতে সুরু করেছিল, কোনোদিন তার শেষ হয় না।

ভবেন বলল, এখানে এলে তোর কী মনে হয় টোপন।

—ছেলেবেলার কথা ভীষণ মনে হয়।

ভবেন নিচু উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল, আমার সমস্ত জীবনটাই যেন পাক খেয়ে ওঠে। আশ্চর্য, আমি যে কী রকম নিশিপাওয়া হয়ে যাই টোপন। মনে হয়, এখানে কোথায় কী ভাবে যেন ঘোরা ফেরা করেছি, ঠিক মনে করতে পারি না।

আমি বিস্মিত হয়ে ভবেনের দিকে তাকালাম। ভবেন সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। ওর মুখে সেই নিশিঘোরেরই ছায়া যেন। আমি ওকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। কেবল চকিতে একবার সেই কথাগুলি, শালঘেরিতে ফিরে আসার পরের দিনের সকালবেলায় ভবেনের কথাগুলি বিদ্যুতের মতো ঝিলিক খেয়ে গেল। ভবেনের সেই কথা, আমার আর ঝিনুকের সঙ্গে ও তামাইয়ের

ধারে, ওপারে শালবনে অনেকদিন গেছে। সেই কথা, ঝিনুকের প্রতি আমার ভালবাসা দেখে কবে যেন ওরও একদিন ঝিনুককে ভালবাসতে সাধ গেল, আমার মতোই ঝিনুকের হাত ধরতে ইচ্ছে হল, চাইল, ঝিনুকও ওকে অসংকোচে গ্রহণ করুক। সেই সব দিনগুলিই কি আবর্তিত হয়ে উঠছে এখন ভবেনের মনে? সেই একই নিশিঘোর কি ওকে আচ্ছন্ন করে, তামাইয়ের ধারে এলে? তাই কি তিনজনের এক সঙ্গে আসার কথা অনেকদিন, অনেকবার বলেছে ভবেন?

ভবেন যেন আমার কাছে কোনো জবাবের প্রত্যাশা করল না। মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল। আবার বলে উঠল, একদিক থেকে ভাবতে গেলে জীবনটা খুবই সহজ, আর একদিক থেকে এত অসহজ, তার কোনো কুলকিনারা পাই না। আচ্ছা, এ দুয়ের মাঝখানে, মধ্যপন্থা বলে কিছু নেই।

আমি যে কী জবাব দেব ভেবে পেলাম না। কেবল একবার মনে হল, ভবেনের নিশ্চয় কোনো কষ্ট হচ্ছে। তাকে ভিতর থেকে তাড়না করছে। সেই তাড়নাতেই সে কথা বলে চলেছে। আমি শুধু ওর কাঁধে একটা হাত তুলে দিলাম।

ভবেন নিজেই আবার বলল, আমি পাগলের মতন বকছি। আমার বকতে ইচ্ছে করছে টোপন।

আমি বললাম, বেশ তো, বক।

ভবেন হেসে চুপ করল। তারপর হঠাৎ ডেকে উঠল, ঝিনুক!

ঝিনুক ফিরে তাকাল।

ভবেন বলল, এস, আমরা বসি।

ঝিনুক চকিতে একবার আমার দিকে তাকাল। ধীর পায়ে এগিয়ে এল। এসে, পাথরে হেলান দিয়ে, জোড়াসন করে বসল। ভবেন তার পাশে বসে, আমাকে আর এক পাশ দেখিয়ে বলল, বস টোপন।

আমি বসলাম।

ছায়া ঘনিয়ে এল। একটা অস্পষ্টতা ঢাকা পড়ে যেতে লাগল সর্বচরাচর। পশ্চিম আকাশের রক্তাভাও একটু একটু করে কালো হয়ে উঠল। খুব ধীরে ধীরে, শালবনের মাথায়, চাঁদ উজ্জ্বল হতে লাগল। এখনো তার আলো এসে যেন পৃথিবীকে স্পর্শ করেনি। অথচ গাঢ় অন্ধকার নেই।

আমরা তিনজনেই চুপচাপ, তাই হয়তো বেশী স্তব্ধ মনে হচ্ছিল। কেবল ঝিঁ ঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে। তামাইয়ের কলকলানি নৈঃশব্দেরই একটা সুর যেন। ভবেন হঠাৎ একেবারে নীরব হয়ে গেছে। আমি ওর মুখ ঠিক দেখতে পাচ্ছিনে। ঝিনুকের চুলের হালকা গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছে। এবং তা যেন একটা তীব্র কষ্টের মতো আমার বুকে বিঁধছে, নিঃশ্বাস আটকাচ্ছে।

এমন সময় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে, একটা পাখী, পাখার মন্থর ঢেউয়ে ধীরে ধীরে উড়ে গেল। শালবনের দিক থেকে এসে, গ্রামের দিকে গেল। আমি মুখ তুলে, পাখীর কালো অবয়বটা দেখলাম। মুখ নামাতে গিয়ে

দেখলাম, ঝিনুক আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ভবেন সামনে, তামাইয়ের দিকে।

একটা ছায়ামূর্তি সামনের মাঠে ভেসে উঠল। সে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। আমার কাছে সবই যেন কেমন রহস্যময় কুহেলী বলে বোধ হতে লাগল। ছায়ামূর্তি আরো এগিয়ে এল। একেবারে কাছে আসতে চিনতে পারলাম করিক টুডু। জিজ্ঞেস করলাম, করিক নাকি?

—এগেঁ। তুমার ঘরকে গেলাম, মাটো বুইললে, মাস্টেরবাবুর ঘরকে যেঁইছে। তো সিখান থিক্যা।

ওর কথা শেষ হবার আগেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। ভবেনকে বললাম, তোরা একটু বস্, আমি আসছি ওর সঙ্গে কথা বলে।

ভবেন ঘাড় নেড়ে বলল, আচ্ছা।

ঝিনুকের মাথায় একটুও ঘোমটা নেই, সে যেন অপলক চোখে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। ছায়া অস্পষ্টতায়, আমি ঠিক ওর চোখের ভাব বুঝতে পারলাম না। করিকের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম।

করিক চলতে চলতে বলল, তুমার উঠবার দরকার ছিল নাই ঠাকুর। বুলতে আসছিলম কি যে, যতখানি দাগ মেরে দিয়েছিলে, দু'দিনের কাজের জন্যে, সবটা হয়ে যেঁইছে। তার মধ্যে—।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, কাল সকালে আমি গিয়ে বাকীটা দেগে দিয়ে আসব। তোমার এ দু'দিনের রোজটা কি আজ রাত্রেই চাই, নাকি কাল সকালে দিলেই হবে?

করিক বলল, সে কাল বিহানেই হবে, আর একটো কথা কি, তুমি কি একবার সিখানে যাবে? একটা কী যেন বার হয়েছে মনে লেয়।

আমার বুকটা ধক করে উঠল। বের হয়েছে? কিছু জিজ্ঞেস করতে যেন সহসা স্বর ফুটল না। কারণ বিশ্বাস করতেই পারিনে আর। তাই, ও বিষয়টা উল্লেখ না করে বললাম, সেখানে এখন বাতি পাব কোথায়? আমি তো টর্চ নিয়ে বেরুইনি।

করিক বলল, সি আমাদিগের ঘর থিকা একটো কাঠ জ্বালিয়ে লিয়ে গেলেই হবে। উই তুমার গে, নাবালের দিকটোয়—।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল নাবালের দিকটায়?

করিক বলল, হুঁ।

—কী সেটা? কী মনে হয়?

—হবেক গা তুমার একটা পাতর টাতর মতন কিছু।

—পাথর?

সমস্ত উত্তেজনা মুহূর্তে ছড়িয়ে গেল। প্রাকৃতিক কারণেই এখানকার ভূমিস্তরের নিচে কোথাও পাথর পাওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের নয়। বরং খুবই স্বাভাবিক।

করিক বলল, আমি উ চাটাং মতন পাতা পাথরটার গায়ে কারুকে আর কোদাল মারতে দেই নাই। উয়ার গায়ে আর একটো পাতর, তুমি দেখলে পরে বুঝবে।

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আর কোনো উৎসাহ ছিল না যাবার। বললাম, ঠিক আছে, আমি কাল সকালেই যাব, গিয়ে দেখব, কী আছে। টাকাও কালই পাবে।

করিক বলল, টাকা ক্যানে, তুমি ধান দিলেই তো চুকে যায়।

তা হয়তো চোকে। কিন্তু টাকার হিসেবে ধান মাপজোক করা, মরাই খোলা একটা ঝামেলা। বললাম, টাকাই দেব। এখন আর ধানের হাঙ্গামা করতে পারব না।

—আচ্ছা, তবে তাই।

করিক চলে গেল। আমি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চারপাশে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন শাল মহুয়ার গাছ। বেশ খানিকটা চলে এসেছি। তামাইয়ের একটা বাঁকে চলে আসায় ভবেন, ঝিনুক আমার আড়ালে চলে গেছে। যেখানে মাটি খোঁড়া হচ্ছে, তার দূরত্ব প্রায় এক মাইল। করিকদের গ্রামটা তার কাছেই।

কিন্তু আমার মনে সেই দুর্বোধ, কিছু ঠিক করতে না পারা ভাবটা চেপে এসেছে। দুদিন থেকেই এই অস্থিরতার ছায়ায় আমি আবিষ্ট হয়েছিলাম। তিনজনে মিলে এই তামাইয়ের ধারে আসার কথা শোনা থেকে, প্রতিটি মুহূর্তে অসহায়তা, একটা ব্যর্থতার, অর্থহীনতার যাতনা তীব্র হয়ে উঠেছে ভিতরে ভিতরে। একবার ভাবলাম, এখান থেকেই কী বাড়ি ফিরে যাব? এই আসার মধ্যে কোন আনন্দ বোধ করছিনে। বরং একটা আড়ষ্টতার কষ্ট ও এক অজানা উত্তেজনার বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটছে।

ভূতগ্রস্থের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাকে ঘিরে গাছের ছায়াগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল, জ্যোৎস্না উজ্জ্বল হল, তামাইয়ের গলায় একটানা উপকথার কল-কলানি আর ঝিঁ ঝিঁর ঝংকার নিবিড় হয়ে এল। আমি মনে মনে বারবার বলতে লাগলাম, এ অবস্থা ঠিক নয়, একটা গতি চাই, সহজ সচ্ছন্দ গতি, যা আমাকে সব রকম অহৈতুকী থেকে মুক্তি দেবে, অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্টতায়, অস্থিরতা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেবে। আমি যাই, আমি ওদের কাছেই ফিরে যাই। আমি অস্বাভাবিক কিছু করতে পারিনে।

ফিরে চললাম। মোড় ফিরতেই, দূরে যেন আমি একটা ছায়া দেখতে পেলাম। কাছে এগিয়ে আসছে না, দ্রুতগামী ছায়াটা গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছে। পাথরটার বিস্তৃতাকৃতি আমি এখন দেখতে পাচ্ছি, যে-পাথরটার আড়ালে ওরা দুজন বসে আছে। দূরের ছায়াটা দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাথরটার কাছাকাছি এসে আমার পা দুটি আর একবার থমকে গেল। কোনো শব্দ নেই। ফিরে চলে যাব? স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে

পর্যন্ত আমার দ্বিধা হল, কিন্তু স্তব্ধ কেন? ওরা দু'জনেই কি তাহলে অন্য কোথাও চলে গেল? না কি এই নির্জন নিবিরতায় দু'জনে বাঁধা পড়ে গেছে। মনে হতেই একটা তীক্ষ্ন কষ্টে বিদ্ধ করল আমাকে। অন্যদিক থেকে তৎক্ষণাৎ কে যেন আমারই ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের একটি রেখা এঁকে দিল। ঈর্ষা! ঈর্ষা? তবে যে আমি মহতের মতো, অপরের মধ্যেই শুধু জীবধর্মের লক্ষণ আবিষ্কার করি?

আমি তাড়াতাড়ি ডেকে উঠলাম, কই রে, ভব কোনো সাড়া শব্দ পাচ্ছি না যে তোদের?

বলতে বলতে পাথরটাকে প্রদক্ষিণ করে, সামনে গিয়ে দেখলাম, পাথরে হেলান দিয়ে ঝিনুক একলা। ভবেন সেখানে নেই। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেল ও?

আরো এক পা কাছে গেলাম। পাথরটার গায়ে ঝিনুকও যেন পাথরের মতোই নিশ্চল, নিশ্চুপ। তন্মুহূর্তেই লক্ষ্য পড়ল, ঝিনুক একেবারেই অবিন্যস্ত। ওর লাল শাড়ির আঁচল ধুলোয় লুটানো। জামাটা কাঁধের কাছ থেকে ছিঁড়েই, ডানার কাছে নেমে গেছে। কয়েক গুছি চুল কপালে এসে পড়েছে, চুল খুলে গেছে। আলতা পরা পা দুইটি সামনে ছড়ানো। শাড়ি খানিকটা উঠে গিয়ে, শাদা শায়া দেখা যাচ্ছে। পায়ের স্যাণ্ডেল দুটো, দু' দিকে ছিটকে গেছে। ঝিনুকের মুখ ঈষৎ পাশ ফেরানো, পাথরে কপাল ঠেকানো বলেই ওর ভেঙে পড়া খোঁপাটা আমি দেখতে পেলাম, এবং ও যে দ্রুত নিঃশ্বাসে প্রায় কাঁপছে, তা টের পেলাম। চাঁদের আলোতেও আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ঝিনুকের হাতে এবং গালের কাছে ধুলো লেগে রয়েছে। একটা বিধ্বস্ত অবস্থা। যেন একটা ভয়ংকর কিছু এইমাত্র ঘটে গেছে।

আমি তৎক্ষণাৎ জানু পেতে বসে উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে ঝিনুক? ভব কোথায়?

ঝিনুক কোনো কথা বলল না। একইভাবে রইল। কিন্তু আমি স্থির হয়ে উঠলাম। প্রায় চীৎকার করে ডেকে উঠলাম। প্রায় চীৎকার করে ডেকে উঠলাম, ঝিনুক, ঝিনুক কী হয়েছে?

ঝিনুকের রুদ্ধ চুপিচুপি গলা শোনা গেল, আস্তে! আস্তে।

বলতে বলতে ওর একটা হাত মাটি ঘষটে ঘষটে আমার দিকে এগিয়ে আসতে চাইল। অবুঝ ভয়ে ও উত্তেজনায়, আমার নিজেকে স্থির রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। আমি ওর হাতটা চেপে ধরলাম। ঝিনুকের হাত ঠাণ্ডা, কিন্তু মূর্ছা রুগীর মতো শক্তিতে আমার হাতটাও ধরল ও। কয়েক মুহূর্ত এমনি ভাবেই কাটল। আমি চারপাশে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখলাম। আবার ঝিনুকের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলাম, ঝিনুক।

ঝিনুক ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, বলছি, বলছি। চুপ করে একটু বস।

কী আশ্চর্য। এ অবস্থায় মানুষ কেমন করে শান্ত থাকবে বুঝতে পারিনে

তবু ঝিনুকের সমস্ত ভঙ্গি ও কথার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে আমার শান্ত না হয়ে উপায় ছিল না। এবং এটাও অনুভব করলাম, কোনো বাইরের বিপদ এসে এখানে হানা দেয়নি। তার থেকেও ভয়াবহ, ভিতরের কোনো বিপদ, একটা কিছু সর্বনাশ ঘটিয়াছে, কিন্তু সেটা কী? কী হতে পারে? ভবেন নিশ্চয় ঝিনুককে প্রহারে আঘাতে নির্জীব করে ফেলে রেখে যায়নি?

ঝিনুকের অস্ফুট গলা শোনা গেল, ও যে এরকম করবে, আমি বুঝতে পারিনি। লোকটা যেন কেমন হয়ে গেল! কেমন হয়ে গেল!…

বলতে বলতে ঝিনুকের গলা ডুবে গেল। ভাবলাম ঝিনুক কাঁদছে।

কিন্তু না, ওর দু' চোখ অপলক, বিস্ময়ে, ভয়ে, উত্তেজনায় স্থির।

আমি বললাম, কী হয়েছে, কী হয়েছে?

ঝিনুক যেন আপন মনেই কিছু অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, কিছুদিন ধরে ও যেন কী রকম করছিল, সময় পেলে সুযোগ পেলেই…। কিন্তু…এতটা …এতটা।

কথা শেষ করতে পারল না। আমার বুকের ভিতরে সেই গুরু গুরু ধ্বনি বেজে উঠল। ভীষণ বেগে কী একটা ভয়ংকর সংবাদ যেন সে বয়ে নিয়ে আসছে। আমি সমস্ত দেহ মন শক্ত করে, উৎকর্ণ হয়ে রইলাম।

ঝিনুক বলল, তুমি কারিকের সঙ্গে চলে গেলে। ভবেনদা (বিয়ের আগে এই নামেই ডাকত) হঠাৎ আমার একটা হাত ধরল, ধরে কাছে টানল। আমার কেমন রাগ হয়ে গেল, আমি হাত টেনে নিতে গেলাম। কিছুদিন ধরেই, বাড়িতেও সে আমার সঙ্গে এ রকম করছিল। এই জোর করার প্রবৃত্তি তার আগে কখনো দেখিনি। হঠাৎ যেন কী হয়েছে, এত বছর বাদে সে যেন জোর করেই সব আদায় করতে চাইছে।… হাত টেনে নিতে গেলাম, ছাড়ল না। জোরে টেনে, গায়ের কাছে নিয়ে, আমাকে খ্যাপা পাগলের মতন আদর করতে লাগল। আমার গায়ের মধ্যে কী রকম করে উঠল। আমি হাত পা ছুঁড়ে, উঠতে চেষ্টা করলাম। রাগে আর ঘেন্নায় আমি অন্ধ হয়ে বললাম। যা তা বলতে গেলাম। কিন্তু ও কী রকম ভয়ংকর হয়ে গেল। আমার জামা টেনে, শাড়ি টেনে, মাটিতে ফেলে দিয়ে…উ!…

ঝিনুকের গলা যেন কেউ চেপে ধরল। বলতে বলতে ও আবার হাঁপাচ্ছে। আর আমি ভয়ে, বিস্ময়ে, উত্তেজনায়, উদ্বেল আবেগে মনে মনে বলতে লাগলাম, শালঘেরির মহাকাল! একি আশ্চর্য ঘটনা তুমি ঘটালে! একি ভয়ংকর অন্ধকারকে তুমি এক লহমায় আলোর বৃত্তে ছুঁড়ে দিলে।

ঝিনুক আবার বলল, আর ও বারে বারে কী সব বলছিল। সে সব কথা আমার কানে যাচ্ছিল না। আমি তখন এত মরিয়া হয়ে উঠেছি, যেন ওকে ছিঁড়ে ফেলব। ওর জামাটা এত জোরে টানলাম, ফ্যাঁস করে সেটা ছিঁড়ে গেল। তারপরে, হঠাৎ ও উঠে দাঁড়াল। কী যেন বিড়বিড় করে বলল।

আবার ঝুপ্ করে বসে আমার পায়ে হাত দিল, বলে উঠল, ঝিনুক কী করে ফেললাম। কী করে ফেললাম। টোপন এসে পড়বে, আমি পালাই, হে ভগবান, পালাই।…বলে দৌড়ে চলে গেল।

আমি যেন ঝিনুকের গলা আর ঠিক শুনতে পাচ্ছিলাম না। মনে মনে তেমনি বলতে লাগলাম, সত্যকে কী নিষ্ঠুর রূপে দেখালে। তোমার মহালগ্নের ভেরী কী আচমকা বাজিয়ে দিলে। কী মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তুমি দান করলে। অথচ ওরা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী। তোমার অনিত্যের খেলায়, নিত্যকালের নির্দেশ কি এমনি করেই দেখা দেয়।

পরমুহূর্তেই ভবেনের জন্যে আমার মন শঙ্কায় ভরে উঠল। কিন্তু ঝিনুক আর একটা হাত তখুনি আমার হাতের ওপর তুলে দিল। বলল, এ আমি মানতে পারব না টোপনদা। জোর করা সইব না। তুমি আমাকে মায়ের কাছে পৌঁছে দাও।…

ঝিনুক ওর মাথাটা প্রায় আমার বুকের কাছে ঘনিয়ে নিয়ে এল। আমি ঝিনুকের কাঁধে হাত দিয়ে ওকে সোজা করলাম। আমি নয়, কে যেন আমার ভিতর থেকে দৃঢ় স্বরে বলল, ঝিনুক, ঠিক হয়ে নাও, তাড়াতাড়ি ওঠ।

ঝিনুক আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে, উঠে দাঁড়াল। আঁচল তুলে, মুখ মুছে, বিন্যস্ত করল। আমার ভিতরে তখন একটা ভয়ংকর কাঁপন লেগেছে যেন। বললাম, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমার সঙ্গে চল, আর কথা বলবার সময় নেই।

ঝিনুক বলল, কোথায় যাব ?

—তোমাদের বাড়িতে।

—কোন্ বাড়িতে ?

—তোমার শ্বশুরবাড়িতে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, আর একটুও সময় নেই। তোমাকে পৌঁছিয়ে আমাকে যেতে হবে।

ঝিনুকের যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল। বলল কোথায় যাবে ?

ভবকে খুঁজতে। এস তাড়াতাড়ি।

ঝিনুক বলল মার কাছে—?

ওর কথা শেষ করতে দিলাম না। হাত ধরে টেনে বললাম, কোনো কথা নয়, তাড়াতাড়ি বাড়ি চল, নইলে আমাকে একলাই চলে যেতে হবে।

ঝিনুক যেন আশাহত যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে বলে উঠল, কেন, কেন টোপনদা, আমাকে আবার কেন তুমি ও বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছো টোপনদা!

ঝিনুক জলভরা চোখ নিয়ে আমার দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাল। আমি মুখ ফিরিয়ে ওর হাত ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। বললাম, পথটা চুপ করে চলে এস।

জানি ঝিনুকের কষ্ট হচ্ছে। আমি প্রায় ওকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছি। বাড়িতে ঢোকবার আগে ওর হাত ছেড়ে দিলাম। ইন্দির কোথায় কে জানে।

আনিদি নিশ্চয় রান্নাঘরে। ওপরে চলে গেলাম আমরা। ঘরের মধ্যে আলোর সামনে ঝিনুককে যখন দাঁড় করিয়ে দিলাম, তখন জলের দাগ ওর চোখে। কিন্তু বিস্ময় ও উৎকণ্ঠার শেষ নেই। আলোর সামনে এসে আমি স্পষ্ট দেখলাম, পথে আসতে আসতেই মূঢ় বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এবার বললাম আমি, আর কখনো এত অবাক হয়েছ?

ঝিনুক আমার প্রশ্নে কেঁপে উঠে বলল, না।

বললাম, অথচ ভবেনের কোনো দোষ নেই।

আচ্ছন্নতার মধ্যেই ঝিনুকের ভ্রূ কেঁপে গেল। বলল, দোষ নেই?

—না। কেন, কিসের দোষ ঝিনুক? ভবেন তোমার বিবাহিত স্বামী, তোমাকে ভালবাসে, এত ভালবাসে যে সব দাবী বিসর্জন দিয়ে বছরের পর বছর তোমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, এটা কি দোষ? ছেলেখেলায় তুমিই মেতেছ। তারই ফল এটা।

—ছেলেখেলা?

—নয়? সুস্থ সবল স্বাভাবিক একটা লোককে কোথায় টেনে নামিয়েছ, বুঝতে পারছ না?

আমি উত্তেজনায় শুধু নয়, একটা কান্নার আবেগেও যেন কাঁপছিলাম। কান্নাটা যে কিসের, তা বুঝতে পারছিলাম না।

ঝিনুক বলল, আমি টেনে নামিয়েছি?

আমি নিচু রুদ্ধস্বরে বললাম হ্যাঁ, তুমি। তুমি তুমি তুমি! কেন ভবকে মানবে না, কেন সইবে না? কিসের যুক্তি তোমার?

ঝিনুক ঠোঁট নাড়তে লাগল। আমার কথাগুলিই পুনরাবৃত্তি করল ও। তারপর হঠাৎ মূর্ছারুগীর মতো ঘাড় দুলিয়ে বলে উঠল, না না আমি আর পারব না, পারব না টোপনদা। তুমি তো—।

—পারতে হবে!

আমি চীৎকার করে উঠলাম। ঝিনুক চমকে, চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। এও বোধহয় ওর নতুন অভিজ্ঞতা। আমাকে কখনো এত জোরে তীব্র চীৎকার করে উঠতে শোনেনি।

আমি গলার স্বর নামিয়ে বললাম, এই আমার শেষ কথা তোমাকে। এর পরেও যার চোখ খোলে না, তাকে আমি ব্যাধিগ্রস্থ মনে করি। এ তোমার এক আত্মসুখের ব্যাধি। কী অধিকার, কোন্ অধিকারে বলতে পার, এ অসম্ভবকে তুমি জীইয়ে রেখে যাবে? তা হবে না।

আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ঝিনুক। উচ্চারণ করল, আত্মসুখ? ব্যাধি? কিসের আত্মসুখ?

—নিজের মনকে জিজ্ঞেস কর ঝিনুক। নিজেকে স্বামীর কাছে সঁপে না দেওয়াতেই, তোমার মনের সুখ ও শান্তি, এটাকেই তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ কাজ, অপবিত্রতার বাধা বলে মনে করছ। কিন্তু এটা ভুল, মস্তবড় ভুল। ওটা

সুখশান্তি কর্তব্য পবিত্রতা, কিছুই নয়। ওটা এক ধরনের পরপীড়ন, আত্মপীড়ন, আর...আর সকলের বিশ্বাসের মর্যাদা হানিকর।

শেষের কথাটা বলতে গিয়ে, আমার গলার স্বর যেন ভেঙে বিকৃত হয়ে উঠল প্রায়।

ঝিনুক উচ্চারণ করল, মর্যাদা হানিকর?

আমার গলার তেজ গেল। আমি প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ স্বরে বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ ঝিনুক। ভব তোমাকে ভালবাসে বলে, কতদূর নেমেছ। ঝিনুক, আমি... আমিও কত নীচে নেমে গেছি। আজকের ঘটনায়, আমার নিজেকে সব থেকে হীন মনে হচ্ছে।

ঝিনুক এক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। কেবল ওর চোখ বেয়ে জল পড়ল। একটু পরে রুদ্ধস্বরে বলল, কিন্তু টোপনদা। টোপনদা, আমার কি তবে মর্যাদা বলে কিছু নেই? আমি কি তবে একটা—?

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, চুপ! চুপ ঝিনুক, তুমি যে মেয়েদের কথা বলতে যাচ্ছ, তাদের সমস্যা সামাজিক, তাদের দেহ বিক্রীর কষ্টের সঙ্গে তোমার কোনো মিল নেই। তোমার সমস্যা একান্ত মানসিক। তার জন্যে যে সমাধান বেছে নিয়েছ, সেটা সতীধর্মও নয়, ভালবাসার মর্যাদাও তাতে বাড়ে না। মনের কষ্টের সঙ্গে সামঞ্জস্য ছাড়া আর কিছু করার নেই।—কিন্তু আর দেরী করব না, আমি চললাম।

আমি ফিরে দাঁড়াতেই ঝিনুক ছিটকে এগিয়ে এসে, আর্তস্বরে ডাকল। দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও।

—আর সময় নেই ঝিনুক। ভবকে আমার এখুনি খুঁজে দেখতে হবে।

ঝিনুক দু'হাত দিয়ে শক্ত করে আমার জামা চেপে ধরল। বলল, একটু, একটুখানি টোপনদা, যা সব বললে এই কি তোমার মনের কথা?

—হ্যাঁ এই আমার মন বল, প্রাণ বল, বিশ্বাস বল, সবকিছুরই কথা।

ঝিনুক আমারই জামা দিয়ে ওর মুখ চেপেধরে কয়েক মুহূর্ত কান্নার বেগে নিঃশব্দে কাঁপতে লাগল। তারপরে মুখ তুলে, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তবে তোমার জন্যে কী রাখব আমি? তোমাকে কী দেব?

চোখের জলে ভেসে যাওয়া, চিরকালের একটি মেয়ে, আমার ভিতরের সকল দুর্বল দরজাগুলিকে আঘাত করে উঠল। বললাম, কী রাখনি আমার জন্যে? আর কী দেবে? যা তোমার দেবার, সেই তো দিয়েছ।

—পেয়েছ?

—পেয়েছি বৈ কি।

—তবে আর একটা কথা বল। ভবেনদাকে খুঁজে পাবার পর কী হবে? তুমি চলে যাবে শালঘেরি থেকে?

হেসে উঠে আমি ঝিনুকের দিকে তাকালাম। এবার আমি ওর মাথায় একটা হাত রাখলাম। কিন্তু আমার গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল। অস্ফুট

স্বরেই বললাম, কোথায় যাব ঝিনুক ? আমার সীমানার দাগ অনেকদিন পড়ে গেছে। তার বাইরে যাবার কোনো পথ আমার নেই।

ঝিনুক জানু পেতে বসে, আমাকে দু'হাত দিয়ে ধরে, আমার হাঁটুর উপরে মুখ চেপে রইল। তারপরে মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ল। হাত দুটি এলিয়ে পড়ল সামনে।

আমি ঝাপসা চোখে ঝিনুককে একবার দেখে, পেছন ফিরে বেরিয়ে এলাম।

একাদশীর চাঁদ তখন আকাশের অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। কিন্তু কোথায় খুঁজব ভবেনকে ? আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, ভবেনকে আমি জীবিত দেখতে পাব তো ? মনে হতেই, শিউরে উঠেছিলাম। ওর মনে যতখানি শক্তি ছিল, তার শেষ সীমায় যে ও পৌঁছেছে আজ। এতক্ষণ ও নিজের সঙ্গে কী ভাবে যুঝে চলেছে।

যে সব ইস্কুল মাস্টার বন্ধুর বাড়িতে ভবেনের যাতায়াত আছে, সব বাড়িতেই গেলাম। পেলাম না। তাতে প্রায় শালঘেরির সব পাড়াগুলিই ঘোরা হয়ে গেল। বাজারের দিকে দোকানপাটেও দেখলাম। শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়িও খোঁজ করলাম। কোথাও নেই। আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার ভবেনদের পাড়ার দিকেই পা বাড়িয়েছিলাম। সামনেই পড়ে গেল তারক। তাকেও জিজ্ঞেস করলাম, ভবেনকে সে দেখেছে কি না।

তারক খুব সুস্থ ছিল না। রুগ্ন শরীরে তার মদের মাত্রা হয়তো বেশীই হয়েছিল। কোনো রকমে মাথা তুলে বলল, টোয়োনদা ? ভয়েনদার কথা...? হুঁ, তা হ্যাঁ দেখেছি বৈ কি! পাকা রাস্তার ধারেই তো বসেছিলাম। ভয়েনদাকে যেন ইস্টিশানের দিকে যেতে দেখলাম।

আমি আর্তস্বরে উচ্চারণ করলাম, ইস্টিশান ?

—হ্যাঁ, তাই। খুব যেন পা চালিয়ে গেল।

—ও।

পরমুহূর্তেই সময়ের হিসেব করলাম। না কোনো গাড়ি তো এর মধ্যে যায় নি ? একমাত্র মালগাড়ি যদি অতিক্রম করে! ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল এক মুহূর্ত যেন চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে গেলাম।

তারক বলে উঠল, বুইলেন টোয়োনদা, আমার মনে হয়, কুসির আত্মাটা বোধহয়—।

আমি চমকে বলে উঠলাম, কে ?

তারক বলল, কুসুম, কুসুম।

সহসা যেন আমার সংবিত ফিরল। আমি একবার উচ্চারণ করলাম, কুসুম। কিন্তু আমি অন্য কথা চিন্তা করছিলাম। ছুটে অঘোর জ্যাঠার বাড়ির দিকে গেলাম। কারণ, তাঁর বাড়িতেই, লাইটসহ সাইকেল আছে। গিয়ে দেখলাম, অঘোর জ্যাঠা নেই। সাইকেলটা চেয়ে নিয়ে ছুট দিলাম।

কী ভাবছি কিছু জানিনে। শুধু উৎকর্ণ হয়ে আছি একটা শব্দের আশংকায়। আর কেবলি মনে হচ্ছে, যথেষ্ট দ্রুত যেতে পারছিনে। সাইকেল নিয়ে যখন স্টেশনে পা দিলাম, তখন সমস্ত স্টেশনটা যেন শ্মশানের মতো স্তব্ধ। বাইরে কোথাও কোনো বাতি নেই। কিন্তু চাঁদের আলোয় সবই দেখা যাচ্ছে। মানুষের চিহ্নও নেই। স্টেশনের ঘরে একটু আলোর ইশারা মাত্র। কাছে গিয়ে দেখলাম, ঘর বন্ধ। জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম। ভিতরে কমানো আলো। বচন শুয়ে আছে, কিন্তু ঘুমোয়নি। আমার সাড়া পেতেই, জিজ্ঞেস করল কে? এখন কুন গাড়ি নাই।

আমি বললাম, বচন, আমি টোপন, শালঘেরির টোপন।

বচন তাড়াতাড়ি উঠে বসল। বলল, অ, টোপনঠাকুর।

বলে হেসে উঠল। উঠে দরজা খুলে দিয়ে বলল, তাই তো বলি, জোড়ের পায়রা, একলা ক্যানে গ। ভবঠাকুর এই তো একটু আগে এল।

—এসেছে? কোথায়?

—ক্যানে, আমাদিগের পাগলা মাস্টারের ঘরকে গেল যে। তুমিও যাও।

স্টেশনমাস্টার বিজনবাবুর কোয়ার্টারে গেছে ভবেন? সাইকেলটা হাত থেকে প্রায় খুলে পড়ছিল। বললাম, সাইকেলটা ধর বচন, ঘুরে আসি।

বচন সাইকেল ধরে হেসে বলল, যাও যাও। পাগলা টাট্টুরা অখুন কবিতার বই পড় যেয়ে। আই বাপ্। অত ছুটো নাই, পড়ে হাত পা ভাঙবে যে।

স্টেশন থেকেই হাত কুড়ি দূরেই বিজনবাবুর কোয়ার্টার। আমি দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘর থেকে উঠানে আলো এসে পড়েছে। বিজনবাবুকে দেখতে পেলাম, উপুড় হয়ে, পিছন ফিরে কী ঘাঁটছেন, আর বলছেন, বচনের জন্যে আমার কিছুই ঠিক থাকে না। বসুন, না হয় শুয়েই পড়ুন। বইটা আমি ঠিক খুঁজে বার করব।

আমি এগিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিলাম। বিজনবাবুর খাটিয়ায় ভবেন দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। আমার গলা প্রায় বুজে আসছিল। ডেকে উঠলাম ভব।

ভবেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো, মুখ থেকে হাত নামিয়ে, চমকে তাকাল। বিজনবাবুও ফিরলেন। বললেন, আপনিও এসে পড়েছেন, ভাল হয়েছে। ভবেনবাবু আজ দেহাভিসারের কবিতা শুনতে চাইছেন। তাই ভাবছি ডাউসেনের কবিতা শোনাই।

ভবেন স্খলিত গলায় কোনোরকমে বলল, তুই?

আমি কোনো জবাব না দিয়ে ভবেনের হাত ধরে টানলাম। ভবেনও আমার হাতটা আঁকড়ে ধরল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কী করলাম, আমি টোপন।

বললাম, চুপ কর, বাইরে চল।

সহসা আমার মনে হল, ভবেনের একটা নৈতিক সমর্থনের প্রয়োজন এখন।

আবার বললাম, কোনো অন্যায় করিস্‌নি বাড়ি চল্‌।

—না না টোপন।

—শোন ভব, রাস্তায় যেতে যেতে কথা বলব।

বিজনবাবুর দিকে ফিরে বললাম, আজ যাচ্ছি বিজনবাবু। ডাউসনের কবিতা আর একদিন এসে শুনব। স্টেশনে সাইকেলটা রইল। দু'জনে যেতে পারব না। কাল একটু বচনকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।

বিজনবাবু অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তা দেব। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক—?

বললাম, এমন কিছু নয়। পরে আসব, আজ যাচ্ছি।

শালঘেরির পথে পড়া পর্যন্ত কেউ আমরা একটা কথাও বলিনি। অনেকখানি চলে আসার পর ভবেন বলে উঠল, টোপন, তুই কি সব জানিস?

ভবেনের কাঁধে আমার হাত। বললাম, জানি।

ভবেন দ্রুত চাপা গলায় বলে উঠল, কেন এমন হল টোপন, কেন? আমি তো কখনো ভাবি নাই।

বললাম, সেটাই স্বাভাবিক ভব। এর থেকেও ভয়ংকর কিছু ঘটেনি, সেটাই আমাদের সৌভাগ্য।

—এর থেকে ভয়ংকর আর কী ঘটতে পারত?

—অনেক কিছু। এ সংসারে অহরহই তো তা ঘটছে। মানুষ মানুষকে বিষ দিয়ে, গলা কেটে খুন পর্যন্ত করছে।

ভবেন সহসা কেঁপে উঠে আমার একটা হাত জোরে চেপে ধরল। কিন্তু কোনো কথা বলল না। হয়তো ভবেনেরই মনের কথা এটা। হয়তো আত্মহত্যার চিন্তা ওর মাথায় এসেছিল। কিংবা ঝিনুকের প্রাণসংহার।

আমি আবার বললাম, ভব, তুই আর আমি, দুজনকে ঘৃণা করে, বিবাদ করতে পারতাম, শত্রুর মতো লড়তে পারতাম।

ভবেন বলে উঠল, তা আমি পারতাম না টোপন। আমার বরাবর মনে হয়েছে, তোর কাছ থেকে যেন চুরি করেছি, তোর কাছে অপরাধ করেছি। তবু তোকে হারাইনি।

বলতে বলতে ওর গলার স্বর ডুবে যেতে লাগল। ডুবন্ত নিচু স্বরে বলল, টোপন, দুটো বছর ধরে দেখলাম, তুই টলস না, ভাঙিস না।

মনে মনে বললাম, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনেক ফেটেছে, চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। তবু মাত্র এই একটা বিশ্বাস, অতি দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক এই একটি বিশ্বাসের মর্যাদায়ই তো বেঁচে আছি।

বললাম, চুপ কর। এসব কথা আমরা অনেকবার বলাবলি করেছি।

ভবেন বলল, কিন্তু কেমন করে আমি ঝিনুকের কাছে ফিরে যাব?

বললাম, সংসারের আর দশজনের মতোই। হয়তো এর প্রয়োজন ছিল ভব। দ্যাখ্‌, তুইও জানিস, আমিও জানি, শালঘেরিতে দু' দণ্ডের জন্যে

উপভোগ করার মতো মেয়ে আছে। তুই কোনোদিন সেখানে যাসনি। অথচ ক্ষুধা ছিল না, তা নয়। কিন্তু ক্ষুধা যখন প্রাণের শিকড়ে পাক দিয়ে রয়েছে, তখন তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায় না। বোধহয় এই একটা কারণে, মানুষ একেবারে পশু হয়ে যেতে পারে না। তবু ভব, ঝিনুকের কাছে গিয়ে তোকে করজোড়ে ক্ষমা চাইতে হবে।

—ক্ষমা সে করবে কেন টোপন?

—ক্ষমা কথাটা হয়তো ভুল বলছি। আসলে ওর ক্ষোভকে শান্ত করা। আর কেন ক্ষমা করবে? ভব, ঝিনুক যদি সংসারকে বিন্দুমাত্র চিনে থাকে, তা হলে ক্ষমা সে করবে। আর, আমি জানি, ঝিনুকের চোখের সামনে একটা কালো পর্দা ছিল, সেটা আজ এক ধাক্কাতেই সরে গেছে। অনেক অন্ধকার এমনি করেই আচমকা কেটে যায়।

ভবেন চুপ করে রইল। দুজনেই আমরা চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম। একাদশীর চাঁদ আমাদের মাথা ডিঙিয়ে যাবার উপক্রম করছে। দু'পাশের মাঠই এখন প্রায় শূন্য। আগামী বর্ষার মুখ চেয়ে সে এখনো অপেক্ষা করবে, ফাটবে, চৌচির হবে, ধুলো ওড়াবে। মাঝে মাঝে মাঠের বুকে বিচিত্র খস্‌খস্‌ শব্দ করে উঠছে। বন্য বরাহ বা খরগোস হতে পারে। ইঁদুরের দল এখনো হয়তো বিচরণ করছে। দূরে শালঘেরি গ্রামের চিহ্ন অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ভবেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল, না, না টোপন, ঝিনুকের সামনে আমি যেতে পারব না।

ভবেন এক ভাবনাতেই নিমগ্ন ছিল। ওর হাত টেনে বললাম, সেটা আরো সাংঘাতিক ভুল হবে ভব।

ভবেন বলল, ঝিনুকের মুখখানি মনে পড়লেই আমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠছে।

আমি বললাম, তবে সেই কাঁপুনি নিয়েই যেতে হবে। কিন্তু যেতে হবে ভব, আজ রাত্রে এখুনি যেতে হবে।

কথাগুলি জোরের সঙ্গে বলছি এই কারণে, আমার কেবলি মনে হচ্ছে, সহসা একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে। তাতে ভাঙনের থেকে একটা চির খাওয়া ফাটলের রহস্যই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এবার ঘর সাজিয়ে নেওয়াই ভাল। যদি কিছু হারিয়ে থাকে, ক্ষতি হয়ে থাকে, তাকে মেনে নিতেই হবে।

ভবেন আবার বলে উঠল, আমি কী নীচ্‌।

বললাম, এটা নীচতা নয়। এটা একটা যন্ত্রণার বিস্ফোরণ।

ভবেন যেন আমার কথা শুনতে পেল না। এক ভাবেই বলল, কিন্তু কী করব। আমার মান সম্মান বিদ্যা বুদ্ধি সব যে তুচ্ছ হয়ে যায়। ঝিনুক ছাড়া আমি আর কিছুই ভাবতে পারি না।

আমি হাসতে চাইলাম। কিন্তু যা আমার মুখে আঁকা পড়ল, সেটা হাসি

কি না জানিনে। কেবল চলতে চলতে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্ধ তীর যেন বুকের মধ্যে নড়েচড়ে উঠতে লাগল। বললাম, এই কথাটাই সহজ করে বলে, ঝিনুকের কাছে গিয়ে দাঁড়া।

বলে ভবেনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওর গালে জলের দাগ চিক্‌চিক্‌ করছে। তাই তো স্বাভাবিক। ভবেনই তো এ সংসারের সব থেকে সহজ সচ্ছন্দগামী স্বাভাবিক মানুষ।

গ্রাম যতো এগিয়ে এল, ভবেনের গতি ততো মন্থর হয়ে এল। কিন্তু আমি ওকে থামতে দিলাম না। বাড়ির কাছে এসে ও শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরল। দেখলাম বাড়িটার সামনে অন্ধকার। চাঁদের আলো পশ্চিমে চলে গেছে। দোতলার বারান্দায় ঝিনুক দাঁড়িয়ে আছে কি না, কে জানে।

আমি বললাম, হাত ছাড়, এবার তোকে একলাই যেতে হবে।

ভবেন শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলল, পারছি না টোপন।

—এটুকু পারতেই হবে ভব।

আমি আমার হাত ছাড়িয়ে নিলাম। ভবেন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। গেটের ভিতর দিয়ে, সামনের বড় মাঠ উঠোনে ঢুকতেই ও অদৃশ্য হল আমার চোখে। আর ইন্দিরের গলাও সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে শোনা গেল, কে, বড়দা নাকি?

ভবেনের স্তিমিত গলা, হ্যাঁ।

ইন্দিরের গলা, দ্যাখ দিকিনি, এত বড়...।

আমি তাড়াতাড়ি হাঁটা ধরলাম। বাড়িতে ফিরব মনে করেও, তামাইয়ের দিকেই এগিয়ে গেলাম। ওই তো পুবপাড়া। একটু যদি দাঁড়িয়ে তাকিয়ে খুঁজি দূর থেকে, তবে হয়তো হেঁতাল গাছটি দেখতে পাই। হেঁতালের গন্ধ, বিষধর নাগের বিষ। কিন্তু আমাকে সে কেন তার তলায় জীবনের প্রথম স্বপ্নের আশ্রয় দিয়েছিল। আজ কি জীবনের এ অধ্যায়টিও হেঁতাল তার বিষনাশ চোখ দিয়ে দেখেছে।

সেই পাথরটার কাছেই এসে দাঁড়ালাম। ওপারে ঝিঁঝিঁর ঝংকার। তামাইয়ের উপকথা উচ্চারিত হয়ে চলেছে। শালবন পূর্ব দিগন্তে, তাই জ্যোৎস্নায় এখন বন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমি পাথরের গায়ে হাত দিলাম। একবার নিচের দিকে তাকালাম। ব্যথা করে উঠলেও, একটা গভীর নিঃশ্বাস পড়ল আমার। ওই বন, নদী, এই পাথর, কাঁকুরে বাবলা ঝোপ মাঠ, এই আকাশ, এরা সকলেই আমার আজন্ম সঙ্গী, মনে হয়, এখন সকলেই আমার দিকে চেয়ে রয়েছে, সকলেই হাত বাড়িয়ে আমাকে স্পর্শ করছে। তাদেরও যেন আমার মতোই গভীর নিঃশ্বাস পড়ল। আমি জানি, তাদেরই অদৃশ্য মুখে, মহাকালের বিষাণ। অনেকদিন আমার বুকে গুরু গুরু শব্দে বেজেছে। আজ শালঘেরি এই জ্যোৎস্নায় যেন একটি করুণ ব্যথা বিধুর শান্ত প্রসন্নতায় সমাহিত।

আমি আমার তপ্ত মুখ দিয়ে, ঠোঁট দিয়ে, ঠাণ্ডা কঠিন পাথরটির বুকে স্পর্শ করলাম। এই কঠিন শিলায় কী স্নেহানুভূতি কী শান্তির স্পর্শ।

পরদিন ঘুম ভেঙে আগে অঘোর জ্যাঠার বাড়ি গেলাম সাইকেলের সংবাদ দিতে। তারপর কিছু খেয়ে নিয়ে, করিকদের টাকাসহ বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখলাম, জনা সাতেক মেয়ে পুরুষ কাজ করছে। তার মধ্যে করিক টুডু সর্দারি। সে ঘুরে ঘুরে দেখছে। হাতে একটা কোদাল অবিশ্যি আছে। আমাকে দেখে সে এগিয়ে এল। অন্যান্যরাও কাজ বন্ধ করে আমার দিকেই তাকিয়েছিল। আমার কোনো উদ্যম ছিল না, উৎসাহও না।

করিকের হাতে হিসেব করে টাকা দিয়ে বললাম, এবার চল, আকোনে একবার খুঁড়ে দেখে আসি। এখানে তো মোটামুটি দেখলাম। তুমি লোক-জনের সঙ্গে কথা বলে রাখ, দু' একদিনের মধ্যেই যাব।

করিক বলল, যেমন বুলবে ঠাকুর। নাবালের দিকটা একবার দেখবে নাকি?

—চল।

জমিখণ্ডটা ক্রমে যেদিকে ঢালুতে নেমে গেছে, সেই দিকে গেলাম। তার আশে পাশেই খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। পরিখার মতো একটা সুড়ং-এর মধ্যে নামিয়ে নিয়ে গেল করিক। অবাক হয়ে বললাম, এতটা নিচে পথ কেটেছ নাকি?

করিক বলল, তা ক্যানে? এখানে মাটি খানিকটা কাটতেই, এই গত্তখানি বার হয়ে পড়ল। আপনা থিকেই ঝুরঝুর করে মাটি ঝরে—গেল।

আমার বুকের মধ্যে ধকধকিয়ে উঠল! গর্ত আপনা থেকে বের হয়ে পড়েছে! লক্ষ্য পড়ল, পরিখার মতো সরু ফালিগর্ত ডাইনে বেঁকেছে। করিক সেদিকেই গেল, উই দেখ, সি চ্যাটাং পাতর, আর উয়ার গায়ে—।

করিক কথা শেষ করতে পেল না। আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ চাপা সুরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম। আর্তনাদ নয়, আসলে সেটা হর্ষনাদ! অবিশ্বাস বিস্ময় আনন্দ সব মিলিয়ে, এক বিচিত্র শব্দ করে, হাত বাড়িয়ে আমি করিকের জামাটাই চেপে ধরলাম। বলে উঠলাম, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে!

করিকের পাশ দিয়ে, তাকে ঠেলে আমি ছুটে গেলাম সেই, চ্যাটাং পাথরের দিকে। সেটা মাকড়া পাথরের মতো একটা শিলাখণ্ডই বটে। কিন্তু তার ওপরে আর একটা পাথর যেটা বলেছিল, সেটা আসলে বৃত্তাকার ইঁদারার অংশের মতো। মাটিতে বন্ধ হয়ে গেছে তার মুখ, কিন্তু ছাঁচে ফেলা মাটির

পাড় ছাড়া তা আর কিছু নয়। তার গায়ে বিচিত্র ধরনের, যেন অনেকটা শিশুর হাতে কাঠি দিয়ে আঁকা, লতাপাতার চিত্রাঙ্কন রয়েছে। নিচের শিলাখণ্ড যে স্নানঘরের চাতাল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ শিলাখণ্ডের এক পাশে, প্রায় ছ' ইঞ্চি গভীর এবং চার ইঞ্চি চওড়া, উত্তর দক্ষিণে লম্বা নালি রয়েছে। চাতাল এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি, মাটিতে ঢাকা পড়ে রয়েছে। এবং পশ্চিম দিকের মাটির গায়ে খানিকটা গোল মতো ওটা কী বেরিয়ে আছে? যেন অনেকটা বর্তমান যুগের মাটির জালার পেটের মতো দেখাচ্ছে! বাকী অধিকাংশটাই মাটির গায়ে প্রোথিত।

সহসা আমার সমস্ত গায়ে শিহরণ খেলে গেল। আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি! কোথায়! কোন্ যুগে? প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক যুগে। এ কাদের ব্যবহৃত গৃহ প্রাঙ্গণে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর, বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমি দাঁড়িয়ে আছি!

করিক বলল, তা লে ঠাকুর, যা খুঁজে ফিরছিলে, তা পেয়েছ?

তখনো আমার মুখে কথা সরছিল না। মনে মনে বলছিলাম, হ্যাঁ পেয়েছি, আমার অতীতকে আমার বহু বহু দূরান্তে ফেলে আশা জীবনকে খুঁজে পেয়েছি। তামাইয়ের কল্‌কলানি উপকথা ব্যর্থ যায় নি। আমাকে সে ছেলেবেলা থেকে যে দুর্বোধ ভাষায় এক পাতালপুরীর কাহিনী শুনিয়ে আসছিল, আজ তার সন্ধান মিলেছে।···আজ নয়, গতকাল সন্ধ্যাবেলাতেই প্রথম করিক টুডু বলেছিল। গতকালের সঙ্গে আজকের, আমার জীবনের এই দুই অধ্যায়ের সঙ্গে কি কোনো অদৃশ্য যোগসূত্র আছে?

এই মুহূর্তেই উপীনকাকার কথা আমার মনে পড়ে গেল। উপীনকাকার মনেই মাটির তলায় অস্তিত্বের উদয় হয়েছিল। তিনিই প্রথম সন্দেহ করেছিলেন। তাঁর অনুমান ব্যর্থ যায় নি।

বললাম, করিক, আমরা যা খুঁজছিলাম, এই বোধহয় তাই। কিন্তু তুমি যদি একটু ভুল করতে, তবে সব ভেঙ্গে চুরে নষ্ট হয়ে যেত।

করিক বলল, আমাকে কলাকেতার বাবু যেমনটি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনটি করেছি।

কিন্তু আমি আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। কাকীমাকে খবর দিয়ে, তাড়াতাড়ি ডাকঘরে যেতে হবে। গোবিন্দবাবুকে এখুনি টেলিগ্রাম করে সংবাদ দিতে হবে। আমি চাতাল থেকে নেমে এলাম। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, পুবের মাটির মধ্যে কী যেন চক্‌চক্ করছে। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিলাম। ছোট একটি সোনার থালা। মাটির দাগ আছে, কিন্তু কোথাও তার একটু মালিন্য নেই। যেন এই সেদিন কেউ ফেলে রেখে গেছে।

করিক চোখ বড় বড় করে বলল, সোনার নাকি ঠাকুর?

কোন্ যুগের স্বর্ণপাত? কার ব্যবহৃত? সে কে, কেমন দেখতে? কী তার সামাজিক পরিচয় ছিল? আমার সমস্ত গায়ের মধ্যে যেন বারে বারে

কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। আমি চলে যেতে ভরসা পেলাম না। করিবদের আমি ছোট করে দেখছিনে? মানুষের মধ্যে লোভ থাকেই। আমার অবর্তমানে, সোনার সন্ধানে হয়তো ওরা যেখানে সেখানে কোদাল চালাতে আরম্ভ করবে। তাতে ওরা কী পাবে জানিনে। কিন্তু অনেক বড় সর্বনাশ তাতে হয়ে যাবে।

বললাম, করিক, তুমি তাড়াতাড়ি ভবেনবাবুর বাড়িতে যাও। বল, আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি। খবর পাওয়া মাত্রই যেন চলে আসেন।

করিক কোদাল রেখে পরিখা থেকে উঠে চলে গেল। আমি সোনার পাত্রটি ঘুড়িয়ে ফিরিয়ে, দেখলাম। পাত্রের বুকে, কয়েকটি অক্ষরে যেন কিছু লেখা রয়েছে। অপরিচিত অক্ষর। বিচিত্র ধরনের লিপি। কী কথা লেখা আছে, কী কথা! এত যুগ পরে, এবার কি বাংলা দেশও প্রমাণ করবে, সে অপ্রাচীন নয়। ভারতের প্রাগৈতিহাসিক ধারার সঙ্গে একাত্মতা কি এবার ঘোষিত হবে। এই অপরিচিত তামাই লিপি যেন তারই ইঙ্গিত করছে। আমি দু' চোখ মেলে, পরিখার ভিতরে এক অনির্ণীত, অপরিচিত যুগের প্রতিটি রন্ধ্র দেখতে লাগলাম।...

ঝিনুকের দুটি রৌদ্র রং পায়ে, গাঢ় আলতার প্রলেপ। হাঁটু মুড়ে, বা হাতে শরীরের ভার রেখে, একটু এলিয়ে বসেছে ও। মাঝখানে দাবার ছক। তার দু'পাশে আমি আর ভবেন। ভবেনের দোতলার শোবার ঘরেই আমরা বসেছি। ঝকঝকে লাল মেঝেয়, কিছু না পেতেই আমরা বসেছি। গ্রীষ্মকালে, ঠাণ্ডা মেঝেয় বসতেই ভাল লাগে। চকচকে মেঝেতে আমাদের অস্পষ্ট প্রতি-বিম্ব পড়েছে।

ঝিনুকের ডান কাঁধের ওপর দিয়ে পিঙ্গল চুলের গোছা বুকের ওপরে টেনে রাখা হয়েছে। দুপুরে পান খেয়েছিল ও। ঠোঁটে তারই দাগ। ওর দৃষ্টি দাবার ছকের দিকেই, কিন্তু সেদিকেই দেখছে কি না, কে জানে। ওর চোখে যেন এক গভীর রহস্য। টিপে রাখা ঠোঁটে ঈষৎ হাসির মধ্যেও সেই রহস্যের ছায়া যেন। লাল পাড় হলুদ রং শাড়ি ওর পরনে। ওর এই কাপড়টা দেখলে আমার কুসুমের কথা মনে পড়ে যায়। শেষ দিন কুসুমের গায়ে এমনি একটি কাপড় ছিল। ঠিক এই রং। মৃত্যুর আগের দিন পিশী কাপড় বদলার সময়, সেই কাপড়টি কুসুমকে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

বুঝতে পারিনে, কুসুম কি আরো সুন্দর হয়েছে? একটু কি পুষ্ট হয়েছে? না কি, আরো উজ্জ্বল হয়েছে? চোখের পল্লব নিশ্চয় মানুষের নতুন করে আর বড় হয় না, রং এরও কম বেশী হয় না। ঝিনুকের তাই হয়েছে। দীর্ঘপল্লব, কৃষ্ণকালো লাগছে। কাজল পরতে দেখেছি বলে তো কখনো মনে হয় না।

মাথায় ওর ঘোমটা নেই। পায়ের গোড়ালির গোছার কয়েক ইঞ্চি ছাড়িয়ে উঠেছে ওর লাল পাড়। পায়ের কাছেই ভবেন বসেছে। ভবেনেরও বাঁ হাতেই

শরীরের ভার। বাঁ হাতটি ওর, ঝিনুকের প্রায় হাঁটু স্পর্শ করে আছে। ওর কালো রংটা যেন উজ্জ্বল হয়েছে। আগের থেকে একটু মোটা হয়েছে। তাতে ওকে দেখতে সুন্দর হয়েছে। তা ছাড়া ভবেন এখন শালঘেরির ইস্কুলের হেড-মাস্টারের পদ পেয়েছে।

তা প্রায় তিন বছর তো অতিক্রম করে গেল। যে দিন প্রথম তামাইয়ের মাটির তলায় অতীতের সন্ধান মিলল, তার পরে তিন বছর চলে গেছে। সেটা ফাল্গুন মাসের প্রথম ছিল। এখন চৈত্রের মাঝামাঝি।

তামাই সারা ভারতবর্ষেই একটা প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়েছে। আকোন এবং শালঘেরি, এ দু'জায়গাতেই, প্রায় ছোটখাটো প্রাগৈতিহাসিক নগর আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদারোর মতো, তামাই উপত্যকার সেই প্রাচীন লিপিও উদ্ধার করা যায় নি। পৃথিবীর সকল লিপিবিশারদেরা এখন তামাইয়ের বাণী উদ্ধারের চেষ্টায় আছেন। তামাইয়ে প্রাপ্ত সোনা রূপা, তামা ও মাটির সকল জিনিষই কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু অবশিষ্ট আমার বাড়িতেই আছে। আমার বাড়িটাই এখন তামাই যাদুঘরের শালঘেরির সংস্করণ। প্রতি দিনই দেশ দেশান্তরের লোকেরা আসেন দেখতে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শালঘেরিতে একটি তামাইভবন তৈরী করছেন। গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে, উপীনকাকার স্ত্রী, কাকীমাকেই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কাকীমা এক গলা ঘোমটা টেনে, সেই কাজ সমাধা করেছিলেন। জানতাম, অতবড় ঘোমটা আর কিছু নয়, শুধু চোখের জলকে আড়াল করবার জন্য।

গোবিন্দবাবু প্রায় এক বছর কাটিয়ে গেছেন শালঘেরিতে। টেলিগ্রাম পেয়েই তিনি ছুটে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিলেন সংবাদপত্রের রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারেরা। তামাই শুধু ভারতবর্ষেই আলোড়ন তুলেছে, একথা ভুল। সারা পৃথিবীকেই বিস্মিত ও চকিত করেছে। গত দু' তিন বছরের মধ্যে যতো বিদেশী পর্যটকেরা ভারতে এসেছে, তাঁদের অনেকেই শাল-ঘেরি ঘুরে গেছেন। শালঘেরি এখন একটি অতি পরিচিত নাম।

তামাইয়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সার্বসাকুল্যে আটটি কংকাল পাওয়া গেছে। প্রথম শালঘেরিতেই, একটি ঘরের মধ্যে দুটি কংকাল আবিষ্কৃত হয়েছিল। আর ঘরের বাইরে, সম্ভবত দরজার কাছেই, আর একটি কংকালও পাওয়া গেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঘরের দুইজন পুরুষ, বাইরেরটি মেয়ে। মেয়েদের পোষাক হয়তো হাঁটু পর্যন্ত নামতো। কারণ, হাঁটুর নিচে থেকে গোড়ালি পর্যন্ত অন্ততঃ চারটি করে অলংকার প্রতি পায়ে ছিল। পুরুষদের একজনের পাঁজরে গভীর আঘাতের চিহ্নও আবিষ্কৃত হয়েছে। আর একজনের কোনো আঘাতের চিহ্নই পাওয়া যায় নি। তামার একটি বর্শাও ঘরের মধ্যে পাওয়া গেছে।

ওরা কি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করেছিল? কিন্তু, যখন সমস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই এই

কংকাল পাওয়া গেছে, তখন কি দুজন মানুষের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের সময় বা সুযোগ ছিল ? এ তো যেন একটা বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধের সময় থেকেই সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে কি একজন দিগ্বিজয়ী সৈনিক কোনো গৃহে এসে, দম্পতীর উপরে হানা দিয়েছিল ?

সেই পুরুষেরা কেমন দেখতে ছিল ? আর মেয়েটি ? তার রূপ, তার বর্ণ ? মানুষের জীবন কি সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই সর্পিল আবর্তনে জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল ?

সে সিদ্ধান্তে আমি আসতে পারিনি। গোবিন্দবাবুর অনুরোধে ও নির্দেশে, 'তামাই সভ্যতা' নাম দিয়ে একটি বই আমি লিখেছি। ভারতীয় প্রত্ন বিভাগ তার প্রকাশক, ইংরেজী অনুবাদও সেখান থেকেই করা হয়েছে। যদিও সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের কথাই আমাকে বলতে হয়েছে, তবু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক ও চিন্তার জটিলতা বেড়ে উঠার কথাই আমি বলেছি। এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদ্ মর্গান-কেই আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। ভবিষ্যতে একটা উৎপাদনের শক্তি, বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আধুনিক জটিলতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হবে।

তবু এই যে ঝিনুকের সামনে আজ বসে আছি, এখানে বসে বারে বারেই মনে হচ্ছে, হয়তো ভারতে একদিন মাইথলজির যুগও আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হবে। মানুষের ভিতরের গভীর গাঢ়তা, তার অতলতা কি কোনোদিন মাপা যাবে ?

ঝিনুক বলল, খেলছ না যে ? চাল দাও।

ভবেন বলল, দাঁড়াও। গভর্নমেণ্ট ওকে এখন পৃথিবী ভ্রমণে পাঠাচ্ছে, সেই চিন্তাতেই বোধহয় মসগুল।

আমি হাসলাম। আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঝিনুক আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। ওদের দু'জনের মাঝখানে আমাকে সত্যি যেন বড় শ্রীহীন দেখাচ্ছে। একটা দাঁত অবশ্য আমি তামাইয়ের কাজে আছাড় খেয়ে ভেঙেছি। বৎসরাধিক সময়ের অসম্ভব পরিশ্রমে হয়তো শরীরটা একেবারেই ভেঙে গেছে। কালো হয়ে গেছি। কিন্তু মুখে এত অজস্র রেখা কে এঁকে দিল। চুলেই বা এমন পাক ধরল কেন ? ইতিমধ্যেই ধূসর হয়ে গেছে মাথা। শীঘ্রই যে শাদা হয়ে উঠবে। তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথম প্রথম ঝিনুক শাদা চুল তুলে দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিত। বলতাম, বৃথা চেষ্টা, ওর যখন রং ফেরাবার ইচ্ছে হয়েছে, ফেরাতে দাও।

ঝিনুক বলত, তা বলে এ অসময়ে ?

বলতাম, ঠিক সময়ের কথা কে বলতে পারে। হয়তো সময় হয়েছে।

তা ছাড়া, রক্তপাত রোগও দেখা দিয়েছে আমার। চাঁদসীর চিকিৎসাতেও

বিশেষ ফল দেখা যাচ্ছে না। নগেন ডাক্তারের অভিমত, সেই জন্যেই আমার চোখের কোলগুলি এমন গভীর কালো পরিখায় ডুবে যাচ্ছে। সেই জন্যেই দেহে এত অবসন্নতা।

আমি হেসে বাউল গানের কথা বললাম, কী দেখব ভূমণ্ডলে, দেখি মনমণ্ডলে। ঝিনুক চোখ তোলে। ও গম্ভীর হলে আমি ভয় পাই। ওর চোখ দুটি এমন সন্ধ্যাতারার মতো সহসা স্থির কিন্তু করুণ হয়ে উঠলে, এখনো, এখনো কোনো এক ধ্বংসাবশেষে যেন সেই গুরু গুরু ধ্বনি স্তিমিত হয়ে বেজে ওঠে।

আমি আবার হেসে উঠলাম, এদিকে রণাঙ্গন যে স্তব্ধ। আমি তো দিয়েছি, তুই দে ভব।

ভবেন বলল, আমি ত কিস্তি দিয়েছি। কিন্তু তোর বহাল তবিয়ৎ কিসের ভেবে পাচ্ছি না। ভয় পাস না?

বলে আবার কিস্তি দিল। আমি মন্ত্রী, গজ, নৌকা, ঘোড়া, সব নিয়ে সরে আসছি। ভবেন বুঝতে পারছে না, ওর সময় ঘনিয়ে এসেছে। এবার আমি মারব। ভাবতে না ভাবতেই, গজ তুলে নিয়ে বললাম, মাত্।

ভবেন বলে উঠল, আজ্ঞে না, রাস্তা আমি রেখেছি, এই দেখ।

দেখলাম, সত্যি তাই। চোখ তুলতেই ঝিনুকের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল। ঝিনুকের হাঁটুর কাছে, ভবেন আঙুল দিয়ে আস্তে একটু খোঁচা দিল। ঝিনুক ভবেনের দিকে তাকাল। দুজনেই হাসল। ভবেন বলল, খুব ধরেছি আজ ব্যাটাকে।

বললাম, দাঁড়া ধরাচ্ছি।

বলে, তিনবার ভবেনের রাজাকে আক্রমণ করলাম তিনবারই রাজা পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

আমি যেন অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগলাম। রক্তপাত হচ্ছে টের পাচ্ছি।

ভবেন চাল দিতে যাচ্ছিল। ঝিনুক ভবেনের হাত চেপে ধরল, ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর ভবেনের মন্ত্রী তুলে নিয়ে একটু ইতস্তত করল। করে, তিন ঘরে সরে, মন্ত্রীকে বসাল। রাজা কিন্তু একা। অথচ সরিয়ে দিল গজ, নৌকা। তারপরে মন্ত্রী আবার উঠল ওর হাতে।

আবার বুকটা ধ্বক করে উঠল। আমি ঝিনুকের দিকে তাকালাম। ঝিনুক হাসল। বলল, কোথায় যাবে, মহারাজ, তোমাকে যে আমি ধরে ফেলেছি।

ঝিনুকের হাতটিকে যেন আমার যুগপত সুন্দর আর নিষ্ঠুর মনে হল। আমার রাজার মুখোমুখী সে মন্ত্রীকে বসিয়ে দিল। বলল, এবার মহারাজ?

বললাম, মরেছি।

ভবেন হো হো করে হেসে উঠল। আবেগে ঝিনুকের কোলের ওপর ওর একটি হাত ন্যস্ত হল। আমি ঝিনুকের দিকে তাকালাম।

ঝিনুক হঠাৎ ঠোঁটে ঠোঁট টিপল, মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। চকিতে মুখ

ফিরিয়ে উঠে চলে গেল। দরজার কাছ থেকে নীচু স্বর ভেসে এল, উঠো না তোমরা, চায়ের কথা বলে আসি।

পিশী আজও আসেননি। কিন্তু আশ্চর্য, আমারই ঘরে একটি পুরনো তোরঙ্গের মধ্যে কুসুমের ব্যবহৃত সব জিনিষই তিনি রেখে গেছেন। সেটাও একদিন আমার হাতেই আবিষ্কৃত হয়েছে। তামাইয়ের আবিষ্কৃত বস্তু রাখবার জন্যে, নাড়াচাড়া করতে গিয়েই পেয়েছি। ঝিনুক সেসব নিয়ে গেছে। বলেছে, ওগুলো আমারই প্রাপ্য। ওগুলো আমারই।

সামনেই, পৃথিবীর দুরান্তে আমার আহ্বান এসেছে। তাই তামাইয়ের ধারে সেই পাথরটার কাছ ছাড়া হতে ইচ্ছে করে না। সেখান থেকে আমি হেঁতালের দিকে মাঝে মাঝে তাকাই। পৃথিবীর পথে যাব, শালঘেরির এই প্রকৃতি কি আমার সঙ্গে যাবে না? এই শরীর নিয়ে ফিরতে পারব কিনা জানিনে, কিন্তু শালঘেরির সীমানা কখনো ছাড়তে পারব না বোধহয়। সে আমাকে আমরণ ঘিরে রইল।

———